ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

জি ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং
কলিকাতা-৯

Recomended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book far Class IX, Vide Notification No. TB/74/IX/H/10 and also Board's letter No. 10367/G dated 24.11.75

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
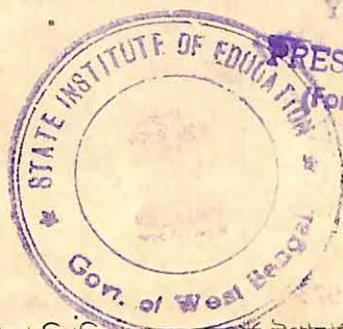
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ, পি-এইচ. ডি.

প্রণীত

জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

২২/এ, কলেজ রো,

কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

9692

প্রথম অধ্যায়

১। ভৌগোলিক পরিবেশ ও ইহার প্রভাব

সূচনা :—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও পূজ্যতর। ভৌগোলিক পরিবেশে ও প্রকৃতির প্রভাবে আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ স্বর্গের ন্যায় সুন্দর ও সমৃদ্ধ। বিশাল পাহাড়-পর্বত ও সাগর-উপসাগরে বেষ্টিত আমাদের জন্মভূমি, বিশেষভাবে সুরক্ষিত। আমাদের দেশে অসংখ্য নদ-নদী, বিস্তীর্ণ উর্বর সমতলভূমি, জল-উদ্ভিদশূন্য মরুভূমি, নানা জাতীয় পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা ও ফুলে-ফলে ভরা বন-জঙ্গল, বহু খনিতে রক্ষিত নানা প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান দ্রব্য—কোন কিছুরই অভাব নাই।

ইতিহাসের মূলসূত্র—মানুষ ও ভৌগোলিক পরিবেশ : ইতিহাসের প্রধান নায়ক মানুষ। মানুষের সমবায়েই জাতি ও দেশ গঠিত হয়। সুদূর প্রাচীনকাল হইতে যে প্রকার ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ জীবন কাটাইয়াছে, তাহার প্রাকৃতিক বিশেষত্বগুলি মানুষের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যখনই মানুষ দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের সুযোগ-সুবিধাগুলিকে কাজে লাগাইতে পারে, তখনই সে তাহার দেশকে উন্নত করিয়া তোলে; যতদিন তাহা পারে না, ততদিন জাতি ও দেশ পশ্চাৎপদ হইয়া থাকে।

উপমহাদেশ : ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—পাঁচটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চল : ভারতবর্ষ এক প্রকাণ্ড দেশ। রাশিয়া দেশটি বাদ দিলে ইউরোপ মহাদেশের যতখানি অবশিষ্ট থাকে, ভারতবর্ষ প্রায় তাহার সমান। এজন্যই ইহাকে দেশ না বলিয়া উপমহাদেশ বলা চলে। ইহা এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত, অথচ উত্তরে, উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর-পূর্বে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালা এশিয়া হইতে এই দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আবার দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিন-পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণে ভারত-মহাসাগর ভারতকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

এই দেশের অভ্যন্তরভাগও প্রাকৃতিক পরিবেশের ফলে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত বিন্ধ্যাচল বা বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতমালা ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অংশকে পৃথক করিয়াছে। এই পর্বতশ্রেণীর উত্তরাংশ উত্তরাপথ বা আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণাংশ দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য নামে পরিচিত। এই দুইটি মূল অংশের প্রথমটি আবার প্রাকৃতিক

বিশেষত্বে পাঁচটি এবং দ্বিতীয়টি দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। উত্তরাপথের পাঁচটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চল হইল—(১) **হিমালয়ের অধিত্যকা অঞ্চল**—এই অঞ্চলে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কাশ্মীর, কাংড়া, তেহরি, কুমায়ুন, নেপাল, ভূটান, সিকিম প্রভৃতি কতকগুলি স্থান রহিয়াছে। (২-৪) ইহার দক্ষিণে **উত্তরাপথের বিস্তৃত সমতলভূমি** তিনটি ভাগে বিভক্ত: (ক) সিন্ধুনদীর উপত্যকা—সিন্ধু ও তাহার পাঁচটি শাখা নদী—যথাক্রমে পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে শতদ্রু (সাটলেজ), বিপাশা (বিয়াস), ইরাবতী, চিনাব ও ঝিলাম নদী দ্বারা বিধৌত পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ; (খ) রাজপুতানার মরুভূমি ও (গ) গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকা। এই সকল নদী ও ইহাদের শাখানদীর দ্বারা বিধৌত এই বিশাল উর্বর ভূখণ্ড উত্তরাপথের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরাপথের এই বিশাল ভূখণ্ডের দক্ষিণে (৫) **মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চল**—উত্তরাপথের বিস্তৃত সমতল ভূমির দক্ষিণে এবং বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের উত্তরে এই মালভূমি অঞ্চল অবস্থিত। (৬) **দক্ষিণাপথ অঞ্চল**—বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রার উত্তরে অবস্থিত এই অঞ্চলটি দক্ষিণাপথের বিস্তৃত মালভূমি। (৭) **সুদূর দক্ষিণ অঞ্চল**—কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ হইতে ভারতমহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ও কাবেরী নদী বিধৌত এই সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলটি দক্ষিণাপথেরই অংশ, কিন্তু কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা দ্বারা ইহা উত্তর দিক হইতে বিচ্ছিন্ন ও সুরক্ষিত।

হিমালয়ের গুরুত্ব: মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, উত্তরে পর্বতরাজ হিমালয় পূর্ব ও পশ্চিম দিকে সমুদ্রে স্নান করিয়া পৃথিবীর মানদণ্ডের মতো দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হিমালয় পর্বতমালা ভারতকে শুধু নিরাপদই রাখে নাই, ইহা হইতে নৌ-যাত্রার উপযোগী বহু নদ-নদীর উৎপত্তি হইয়া একদিকে ভারতের অভ্যন্তরভাগে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, অপরদিকে ভারতভূমিকে শস্যশ্যামল করিয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে বৃষ্টিপাত হিমালয়ই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। বিশাল হিমালয় ভারতের রক্ষা-প্রাচীর রূপে দণ্ডায়মান থাকিলেও বহির্জগতের সহিত ভারতকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় নাই। উত্তর-পশ্চিমে খাইবার, বোলান, কোহাট, গোমাল প্রভৃতি গিরিপথ এবং উত্তর-পূর্বের গিরিপথ ও পূর্বদিকে অবস্থিত আরাকান অঞ্চলের পার্শ্ব দিয়া বহির্জগতে যাতায়াতের পথ রহিয়াছে। প্রাচীন যুগে এই সকল গিরিপথ দিয়াই বণিক, ধর্মপ্রচারক, তীর্থযাত্রী ও পর্যটকেরা যাতায়াত করিত; আবার

সমৃদ্ধিশালী ভারত লুণ্ঠন ও অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে বহু বৈদেশিক জাতি উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়া ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

বিন্ধ্যাচলের প্রভাবঃ ভারতের মধ্যভাগে অবস্থিত বিন্ধ্যাচল ভারতকে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার জন্যই বহুকাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতে জাতীয় ঐক্য স্থাপন সম্ভবপর হয় নাই। প্রাচীন যুগে দাক্ষিণাত্য রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতি দক্ষিণে প্রচারিত ও প্রচলিত হইলেও সেখানে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

ভারত মহাসাগরের গুরুত্বঃ ভারত-মহাসাগর এবং তাহারই শাখা-স্বরূপ আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর প্রাচীনতম কাল হইতেই ভারতবাসীদের সমুদ্রযাত্রায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা সমুদ্রোপকূলে সুবিধাজনক স্থানে বন্দর স্থাপন করিয়া নানা দেশের সহিত ব্যবসাবাণিজ্য করিত। কোন কোন সময়ে নৌবাহিনীর সাহায্যে ভারতীয় নৃপতিরা ভারত-মহাসাগরের দ্বীপাঞ্চলে আধিপত্যও স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন কি, ভারতবাসীরা বহু দ্বীপাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল।

ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবঃ ভারতের অধিকাংশ স্থানেই জমি উর্বর হওয়ায় এই দেশ চিরকালই শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা—বঙ্গভূমির এই বিশ্লেষণ কেবল কবিত্বের উচ্ছ্বাস নহে, এখানে খাদ্যশস্য, ফলমূল প্রভৃতি বিশেষ আয়াস ব্যতীত প্রকৃতির প্রভাবেই প্রচুর জন্মে এবং ভারতের অনেকাংশেই ইহা মোটামুটিভাবে লভ্য। সুতরাং মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায়ই সহজসাধ্য। কেবল তাহাই নহে, ভারতভূমি নানাবিধ খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। স্বর্ণ, লৌহ, বহুবিধ মণিমুক্তা ও প্রয়োজনীয় অনেক ধাতু এ দেশে প্রচুর পাওয়া যায়। সমুদ্রতটে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট বন্দর থাকায় এই সকল ও নানাবিধ শ্রমজাত শিল্পদ্রব্য, দূর দেশে বিক্রয় করিয়া ভারতীয় বণিকৃগণ খুব প্রাচীনকাল হইতেই বহু ধনসম্পদ আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে বহুকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু ভারতের এই ঐশ্বর্য-সম্পদের খ্যাতি সবদিক দিয়া শুভ হয় নাই। অন্যান্য অনেক জাতি ঐশ্বর্যের লোভে ভারত আক্রমণ করিয়া বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছে এবং কোন কোন জাতি স্থায়িভাবে এদেশে রাজত্ব করিয়াছে।

সুতরাং ভারতের সৌভাগ্য একদিক দিয়া দুর্ভাগ্যের কারণও হইয়াছে। বিশেষতঃ অনেকের বিশ্বাস যে, ভারতের জীবনযাত্রা ও জলবায়ুর প্রভাবে ভারতবাসীরা পার্বত্য ও শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীর তুলনায় দৈহিক শক্তি ও সাহসে অনেকাংশে হীন হওয়ায় এই সমুদয় বিদেশী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই সুতরাং প্রকৃতির প্রভাব ভারতবাসীর পক্ষে একদিকে যেমন সুখ ও সৌভাগ্যের, অন্যদিকে তেমনি দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কারণস্বরূপ হইয়াছে। ভৌগোলিক পরিবেশ ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা ভারতবাসীর দৈহিক শক্তি ও সাহসের অনুকূল না হইলেও মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিবৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক ছিল। এইজন্যই এ-দেশে খুব প্রাচীন কাল হইতেই জ্ঞানের নানা বিভাগে, বিশেষতঃ সাহিত্য ও শিল্পে যেরূপ উন্নতি এবং দার্শনিক ও ধর্মচিন্তা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির যেরূপ বিকাশ হইয়াছিল, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহা দেখা যায় না। অন্যদিকে, জীবনযাত্রার জন্য প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজন না হওয়ায় পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতি খুব বেশী হয় নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষ একটি খুব বড় দেশ হওয়ায় ইহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাজনীতিক ঐক্য স্থাপন খুব দুরূহ ছিল। ফলে নানা প্রদেশের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায় সর্বদাই হইত এবং ইহাও ভারতে বিদেশীয় আক্রমণকারীদের সফলতার একটি কারণ।

২। ভারতের অধিবাসী ও সংস্কৃতি

ভারতের নানা শ্রেণীর লোকঃ ভারতের বিভিন্ন স্থানে একেবারে সাদাসিধা ধরনের কতকগুলি পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। যতদূর মনে হয়, এই সকল অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারাই প্রাচীন যুগের মানুষরা আত্মরক্ষা করিত এবং পশুপক্ষী শীকার করিয়া সেগুলির কাঁচা মাংস খাইয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত। এইজন্য তাহাদিগকে প্রাচীন প্রস্তরযুগের অধিবাসী (Palæolithic) বলা হয়। তাহারা আগুনের ব্যবহার, চাষবাস কিছুই জানিত না; গাছপালার উপরে বা কোটরের মধ্যে এবং পাহাড়ের গুহায় তাহারা বাস করিত।

প্রাচীন প্রস্তর-যুগের লোক

পরবর্তী যুগের অধিবাসীরা তাহাদের প্রস্তর-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র বেশ ধারালো ও পালিশ করিয়া তুলিতে শিখিল। তাহারা জমি চাষ করিয়া শস্যাদি উৎপাদন করিতে পারিত; পশুপালন করিত; বাঁশ বা কাঠের টুকরা ঘসিয়া আগুন

জ্বালাইত, হাঁড়ি-পাতিল গড়িত, কাপড় তৈয়ার করিয়া পরিত। এই যুগের অধিবাসীদের বলা হয় নব্য প্রস্তর-যুগের (Neo-lithic) মানুষ। এই যুগের বহু নিদর্শন ভারতের নানা অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমান কালের নাগা, কুকি, খাসিয়া, ভুটিয়া, লেপচা, সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি পার্বত্য ও বন্যজাতি ইহাদেরই বংশধর।

নব্য প্রস্তর-যুগের লোক

শারীরিক গঠনাদির দিক দিয়া বিচার করিয়া ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদিগকে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে: (১) **নেগ্রিটো** **(Negrito)**—প্রাচীনতম যুগে আফ্রিকা হইতে আগত এই শ্রেণীর লোকেরা ভারতে এখন প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের গড়ন বেঁটে, রঙ্ মিশমিশে কালো, থাঁদা নাক। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জড়োয়া এবং আসামের আংগামী নাগা প্রভৃতি কয়েকটি উপজাতির মধ্যে এই শ্রেণীর লক্ষণ আছে; ইহারা সম্ভবতঃ প্রাচীন প্রস্তরযুগের লোকদের বংশধর।

ছয় শ্রেণী

(২) **প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড (Proto-Austroloid)**—অস্ট্রেলিয়ার আদিম-অধিবাসীদের মতো এই শ্রেণীর লোক আসাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি নানা অঞ্চলে, কোল বা মুণ্ডা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর উপজাতীয় লোকের উদ্ভব করিয়াছে। ইহাদের অষ্ট্রিক ভাষা কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থানে অল্প-বিস্তর ছড়াইয়া আছে। ইহারা নব্য প্রস্তর-যুগের বংশধর বলিয়া মনে হয়। (৩) **মোঙ্গলয়েড (Mongoloid)**—মোঙ্গলজাতীয় এই জনশ্রেণীর দাড়িগোঁফ নাই, রঙ হল্‌দে, নাক থাঁদা, মুখ চেপ্‌টা, গালের হাড় বেশ উঁচু। এই শ্রেণীর লোকদের দেখা যায় আসামে, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে এবং ভারত-ব্রহ্মদেশের সীমান্তে। ইহাদের একটি শাখা তিব্বতে থাকিত এবং সম্ভবতঃ পরবর্তী সময়ে তিব্বত হইতে ব্রহ্মদেশ এবং সিকিম ও ভুটানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। (৪) **মেডিটারেনিয়ান (Mediterranean)**—ভূমধ্য সাগরের উপকূল অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের মতো একশ্রেণীর লোকদের ভাষা দ্রাবিড়। ইহারা প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। (৫) **ওয়েস্টার্ন ব্রাকিফেলাস (Western Brachycephallous)**—সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর লোকদের পূর্বপুরুষ মধ্যএশিয়া হইতে আসিয়াছিল। ইহাদের শারীরিক গঠনের বিশেষত্ব বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, গুজরাট এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। (৬) **নর্ডিক (Nordic)**—ইহারা আর্য-ভাষাভাষী আর্যজাতি। ইহাদের বংশধরগণ এখন ভারতের বহু অঞ্চলে বসবাস করে।

পরবর্তীকালে, যুগের পর যুগে, ভারতবর্ষে গ্রীক, শক, হূণ, তুর্কি, পাঠান, মুঘল,

ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতি বহু জাতি আসিয়াছে, এবং নানা জাতি ভারতীয়দের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও রীতিনীতিঃ ভারতে বহু জাতির সংমিশ্রণে স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন ভাষার প্রচলন হইয়াছে। বর্তমানে সরকারী হিসাবে জানা যায়, ভারতে দুইশতেরও অধিক ভাষা প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে মূল ভাষা অর্থাৎ যাহা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়—তাহার সংখ্যা মাত্র পনেরোটি। প্রাচীন যুগ হইতে সংস্কৃতই ছিল ভারতের প্রধান ভাষা। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত ভাষা ছিল সাধারণ জনগণের কথ্যভাষা। হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া, অসমিয়া, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, সিন্ধী, মারাঠী, কাশ্মিরী প্রভৃতি বর্তমানে প্রচলিত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃত-জাত প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। মুসলমান আমলে হিন্দী ও পারস্য ভাষা মিশিয়া উর্দু ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মলয়ালাম্—এই চারিটি প্রধান দ্রাবিড়ী ভাষা ও আদিম অধিবাসীদের বংশধরগণের বিভিন্ন রকমের ভাষার প্রচলন এখনও ব্যাহত হয় নাই। ইংরেজ আমল হইতে ইংরেজি ভাষা একটি প্রধান ভাষারূপে সারাভারতে গণ্য হইতেছে।

ভাষা

নানা ভাষার ন্যায় নানা ধর্মও ভারতে প্রচলিত আছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক কম হইলেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা হইতে বেশি। খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। রাজপুতানা ও গুজরাট অঞ্চলে এখনও জৈনধর্ম প্রচলিত আছে। শিখধর্ম পঞ্জাব অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। ভারতে যে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হইয়া পৃথিবীর বহু অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছিল, সেই বৌদ্ধদের সংখ্যা ভারতে এখন খুবই কম, কয়েক হাজার মাত্র। বোম্বাই অঞ্চলের পার্শী সম্প্রদায় ইরানের জরথুস্ত্র প্রবর্তিত ধর্ম অনুসরণ করে।

ধর্ম

ভাষা ও ধর্মের বিভিন্নতা ছাড়াও ভারতের নানা স্থানে নানা রকমের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি দেখা যায়। প্রাচীন যুগ হইতে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন রকমের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে; তাহাদের মধ্যে সামাজিক নিয়ম-পদ্ধতি, আচার-আচরণ, ধর্মকর্মের ক্রিয়াকলাপ, খাদ্যাখাদ্য গ্রহণ-বর্জন, কলাকৌশল প্রভৃতি বহু বিষয়েও নানা বিভিন্নতা রহিয়াছে।

রীতিনীতি

ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণঃ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের ফলে সমগ্র ভারতে ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐক্যসাধনের চেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছিল।

বিশেষভাবে প্রকৃতির প্রভাব ভারতবাসীর স্বভাব, কর্ম ও ইতিহাস অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে নানাপ্রকার শস্য এবং বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য অতি সহজে উৎপন্ন হয়। সুতরাং কৃষিকার্যই প্রাচীনতম কাল হইতে সমগ্র ভারতবাসীর সর্বপ্রধান কর্ম হইয়া রহিয়াছে। লৌহ, স্বর্ণ, কয়লা প্রভৃতি খনিজ সম্পদ আহরণের চেষ্টায়ও ভারতবাসীরা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। বহু নদ-নদী এবং সাগর-মহাসাগর ভারতবাসীকে নৌপথে দূর-দূরান্তে বাণিজ্য করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বিশেষভাবে ভারতবাসী প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিভোর হইয়া ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতি-র্বিদ্যা প্রভৃতি নানা চর্চায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এই সব কারণেই ভারতের মূল সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার অনেকটা একই রকমের হইয়াছে।

বিভেদের মধ্যে ঐক্য: ভৌগোলিক পরিবেশে সুরক্ষিত আসমুদ্র-হিমাচল ভারত উপমহাদেশের অভ্যন্তর নানা অঞ্চলে বিভক্ত হইলেও উহাদের মধ্যে যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হয় নাই। বৈদিক সাহিত্য ও ধর্ম সমগ্র ভারতে প্রচারিত হওয়ায় ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে যে ঐক্যবোধ জন্মিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং ভারতের যে-কোন অঞ্চলের লোক প্রধানভাবে আপনাকে ভারতবাসী বলিয়াই পরিচিত করে। বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক ঐক্যকেই মৌলিক বা প্রকৃত ঐক্য বলিয়া গণ্য করা যায় না, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐক্য, চিন্তাধারা ও ভাবধারার ঐক্যই হইল মৌলিক ঐক্য। এই ঐক্য বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ দূর করিয়া শান্তি, প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সৃষ্টি করে। প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই মৌলিক ঐক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়-চীন, শক হূণদল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন।" বিশ্বকবি-বর্ণিত এই ঐক্যই হইল ভারত-ইতিহাসের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে জাতি, ধর্ম, ভাষা, আচার-আচরণ, রাষ্ট্রগত বিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্নতা সত্ত্বেও সমগ্র ভারতবর্ষে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৌলিক ঐক্য অবিচ্ছেদ্যভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশেষভাবে ভারতবাসীদের সহিত বিদেশ হইতে আগত নানা জাতির বহুকাল একসঙ্গে বসবাসের ফলে এই ঐক্য আরও উন্নত ও সুদৃঢ় হইয়াছে। এই জাতীয় একতাই হইল ভারতের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র দেশে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া ভারতকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারত ইতিহাসের উপকরণ

তিন যুগের বিভিন্ন উপকরণঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের হিন্দুগণ বেদ, বেদান্ত, দর্শন, কাব্য, নাটক প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায়, সেইরূপ কোন গ্রন্থ তাঁহারা রচনা করেন নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কহ্লণ পণ্ডিত 'রাজতরঙ্গিণী' নামে কাশ্মীরের একখানি ঐতিহাসিক কাহিনী লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহাও হিন্দুযুগের শেষভাগে রচিত ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের ইতিহাসমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের কোন তথ্যপূর্ণ ইতিহাস নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য প্রায় দেড়শত বৎসর যাবৎ পণ্ডিতগণ বহু আয়াসে নানা অঞ্চল হইতে প্রাচীন যুগের ভারত-ইতিহাসের বহু উপকরণ আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিয়াছেন। মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপকরণের কোন অভাব নাই। আধুনিক যুগের বিবরণ অতি স্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত রহিয়াছে।

প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক উপকরণঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনায় উপাদান হইল নিম্নলিখিত ছয়টি ঃ

(১) **প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ**—প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ভারতের নানা স্থানে মাটি খুঁড়িয়া প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। সিন্ধুনদের উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি নানা স্থান খনন করিয়া ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এবং ভারতবর্ষ যে মিশর, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশের ন্যায় পৃথিবীর আদিম সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সাঁচী, নালন্দা, সারনাথ, তক্ষশীলা প্রভৃতি নানা স্থানে খননকার্যের ফলে প্রাচীন ভারতের বহু ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে।

(২) **প্রাচীন লিপি**—প্রাচীন যুগের রাজারা পাহাড়ে, পাথরের স্তম্ভের উপর, গৃহে, মন্দিরে, মূর্তি প্রভৃতিতে এবং তামার পাতে খোদাই করিয়া তাঁহাদের

বিবরণ, আদেশ-উপদেশাদি লিখিতেন। প্রাচীন কালের এই সকল লেখা হইতে হিন্দুযুগের ইতিহাসের অনেক তথ্য জানা যায়। বিখ্যাত মৌর্যসম্রাট অশোক সারা ভারতবর্ষের পাহাড়ে ও পাথরের স্তম্ভে তাঁহার বহু অনুশাসন অর্থাৎ আদেশ ও উপদেশ তৎকালীন প্রচলিত ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে ও কথ্যভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অশোকের অনেকগুলি শিলালিপি ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি আফগানিস্থানেও বর্তমান রহিয়াছে। এই সকল লিপি হইতে অশোকের জীবনী ও রাজত্ব-কাহিনী, তাঁহার ধর্মমত, রাজ্য শাসন-পালনের নীতি ও আদর্শ এবং তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা-প্রাণালীর অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। দুই হাজার দুই শত বৎসর পূর্বে এই দেশের কথ্যভাষা ও লিখিবার অক্ষরগুলি কিরূপ ছিল, এই সকল লিপি হইতে তাহাও জানা যায়। এলাহাবাদের প্রস্তর-স্তম্ভে খোদিত কবি হরিষেণ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত লিপিতে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পড়িয়া অনেকে এই সম্রাটকে বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই লিপি না থাকিলে এই বিখ্যাত মহাবীরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যাইত না, কারণ তৎকালীন কোন গ্রন্থেই তাঁহার নামোল্লেখ নাই।

শিলালিপি

হিন্দুযুগের রাজারা যখন কাহাকেও কোন ভূমিদান করিতেন, তখন সেই দানপত্র তামার পাতে খোদাই করা হইত। ইহাকে বলা হয় তাম্রশাসন। এইরূপ শত শত তাম্রশাসন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশ তাম্রশাসনে ভূদানকারী রাজার এবং তাঁহার পূর্ববর্তী রাজাদের নাম ও বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল তাম্রশাসন হইতে বহু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

তাম্রশাসন

(৩) **প্রাচীন মুদ্রা**—হিন্দুযুগের বহু মুদ্রার উপর রাজার নাম এবং কোন কোন স্থলে তারিখ খোদাই করা আছে। এইরূপ বহু প্রাচীন মুদ্রা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেও অনেক নূতন নূতন রাজার নাম জানা যায়, এবং তাঁহাদের কে কোন্ সময় কোন্ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, সে সম্বন্ধেও মোটামুটি ধারণা করা চলে। বাক্ট্রিয়া ও উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে আগত অনেক গ্রীক, শক, পারদ বা পহ্লব জাতীয় রাজার নাম একমাত্র মুদ্রা হইতেই পাওয়া যায়; সুতরাং মুদ্রাও প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি বিশেষ উপাদান। প্রাচীন মুদ্রা হইতে এমন বহু রাজার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, যাঁহাদের অস্তিত্বের আর কোন প্রমাণ নাই।

(৪) **প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভাদি**—প্রাচীন যুগে নির্মিত যে সমস্ত গৃহ, মন্দির, নানাশ্রেণীর অট্টালিকা, প্রস্তর নির্মিত নানা দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতি এখনও পাওয়া যায়, সেগুলিও ইতিহাসের খুব প্রয়োজনীয় উপকরণ। ইহাদের উপর খোদাই করা লিপি হইতে অনেক রাজার নাম, তারিখ এবং অন্যান্য নানা বিবরণ জানা যায়। ইহাদের গঠন-প্রণালী দেখিয়া প্রাচীন যুগের শিল্প যে কতদূর উন্নত ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এলোরায় একটা গোটা পাহাড় কাটিয়া যে বিশাল মন্দির নির্মিত হইয়াছে, সাঁচীস্তূপ এবং উহার তোরণ-দ্বার, রেলিং প্রভৃতি যে বিস্ময়কর প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে, অজন্তার গুহা-গাত্রে যেসমস্ত সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা হইতে প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র-শিল্প কতদূর উন্নত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। সারনাথে অশোকের স্তম্ভোপরি নির্মিত সিংহগুলি এবং নানা স্থানে বুদ্ধমূর্তি প্রভৃতি দেখিয়াও প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়। ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যাদি শিল্পের বহু নিদর্শন ভারতের বাহিরেও দেখা যায়। অনেকস্থলে এগুলি মাটি খনন করিয়া ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। প্রাচীন যুগের শিল্প ও সভ্যতা এবং সাধারণ ঐতিহাসিক আলোচনায়ও এগুলির অনেক গুরুত্ব আছে।

শিল্পাদির নিদর্শন

(৫) **প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদি**—বৈদিক যুগের ইতিহাস রচনায় বৈদিক গ্রন্থই একমাত্র অবলম্বন, কারণ সে যুগের শিলালিপি ও তাম্রলিপি প্রভৃতি কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় নাই। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি হইতেই সে যুগের ঐতিহাসিক তথ্যাদি যতদুর সম্ভব সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছে। পুরাণ নামক ধর্মগ্রন্থাদি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ হইতে সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনেক প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্য জানা গিয়াছে। কয়েকখানি পুরাণের মধ্যে প্রাচীন যুগের রাজবংশাদির তালিকা এবং রাজাদের নানা কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি হইতেও প্রাচীন ইতিহাসের বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের রচিত 'হর্ষচরিত', বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্ক-চরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', প্রাকৃত ভাষায় লিখিত বাকৃপতির 'গৌড়বহো' প্রভৃতি রাজগণের জীবন-চরিত এবং পূর্বে উল্লিখিত কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী' ও কয়েকখানি প্রাচীন রাজবংশাবলী প্রাচীন ইতিহাসের মূল উপাদানরূপে গ্রহণ করা চলে।

(৬) **বৈদেশিক পর্যটকগণের লিখিত বিবরণ**—অনেক বৈদেশিক ভ্রমণকারী ভারতে আসিয়া এদেশের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে গ্রীসদেশীয় মেগাস্থিনিস, চীন দেশীয় ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ ও ইৎসিং, মুসলমান আল্‌বেরুণী ও ইটালীর মার্কো পোলোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বীরবর আলেকজাণ্ডারের অভিযানে তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজন ভারতের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইগুলির সাহায্যে আরও অনেক প্রাচীন বৈদেশিক লেখক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। একজন অজ্ঞাতনামা গ্রীক ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবরণ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে রোমের তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত প্লিনি মতামত দিয়াছেন। ইনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক।

মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপকরণঃ মুসলমানদের রাজত্বকাল ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ। এই যুগের ঐতিহাসিক উপকরণের কোন অভাব নাই। হিন্দু যুগের ন্যায় এই যুগের বহু সৌধ, মুদ্রা, লিপি, চিত্র, সাহিত্যাদি হইতে বহু প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। এই যুগের কিছু কিছু সরকারী দলিল, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্রাদি হইতেও কতক তথ্য সংগৃহীত হয়। কয়েকজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক এই যুগের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। কয়েকজন মুসলমান সম্রাট আত্মজীবনী অথবা কার্যাবলী নিজেরাই লিখিয়া গিয়াছেন।

পর্যটকদের বিবরণ

হিন্দুযুগের ন্যায় এযুগেও অনেক বৈদেশিক ভ্রমণকারী এদেশের বিবরণ লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইবন্-বতুতা, নিকোলো কণ্টি, সার টমাস রো, রাল্‌ফ ফিচ, বার্নিয়ার, টেভারনিয়ার ও মেনুসীর লিখিত বৃত্তান্ত এই যুগের ইতিহাসের উৎকৃষ্ট উপকরণ। মুসলমান শাসনকালে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর সম্বন্ধে পারসিক পর্যটক আবদুর রজাক, পর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ প্রভৃতির বিবরণও ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক উপকরণঃ ব্রিটিশ আমল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত হইল আধুনিক যুগ। এই যুগের যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপকরণ রহিয়াছে। ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত বহু সরকারী দলিল-পত্র এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইংরেজ আমলের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়াছেন। বহু বিদেশী ভ্রমণকারীও এই যুগের

ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষভাবে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে ব্রিটিশ যুগের মুদ্রিত অসংখ্য ইতিহাস ও সংবাদ-পত্র সর্বত্রই পাওয়া যায়। সুতরাং ব্রিটিশ যুগের নানাবিধ ঐতিহাসিক উপকরণের একটুও অভাব নাই। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের উপকরণেরও কোনই অভাব নাই, অভাব হইবেও না। কারণ এ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এবং সংবাদপত্রে ও সরকারী দলিল-পত্রেও যথেষ্ট উপকরণ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশঃ পূর্বে সকলের ধারণা ছিল যে, মিশর, সুমের, ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া প্রভৃতি দেশগুলিই মানব-সভ্যতার জন্মস্থান, কারণ এ সকল অঞ্চলেই পৃথিবীর প্রাচীনতম বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে এবং
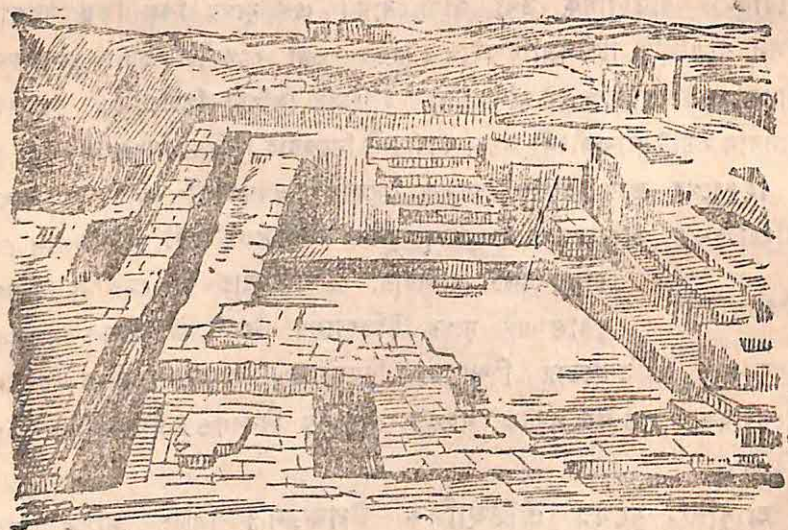
মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার

ইহার অনেক পরে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে পঞ্জাবে রাভি নদীর তীরে হরপ্পায় এবং সিন্ধুনদের উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো, চান্‌হুদারো ও অন্যান্য নানাস্থানে খননকার্য করিয়া সে সকল নিদর্শন পাওয়া

গিয়াছে, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতীয় সভ্যতাও পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার প্রায় সমকালীন।

সিন্ধু-সভ্যতা সিন্ধুনদের উপত্যকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না, বহু দূর-দূরান্তে প্রসারিত হইয়াছিল। সিন্ধু উপত্যকার এই বিশিষ্ট সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে।

নগরীর গড়ন ঃ মহেঞ্জোদারো হইতে হরপ্পা কয়েক শত মাইল দূরে অবস্থিত, অথচ দুইটি নগরীর রাস্তাঘাট, দালানকোঠা ইত্যাদি প্রায় একই প্রণালীতে গঠিত। সাধারণতঃ নদীপথে এই দুইটি নগরীর অধিবাসীরা পরস্পরের সহিত যোগাযোগ রাখিত। মহেঞ্জোদারোতে বহু সংখ্যক বাসভবন ছিল। দুই কোঠার ছোট ছোট দালানও ছিল, আবার খুব বড় বড় দোতলা, তেতলা দালানেরও অভাব ছিল না। এই সকল দালানকোঠা খুব ভাল পোড়া ইট দিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল।

প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই কূপ, নর্দমা ও স্নানাগার ছিল। সর্বসাধারণের
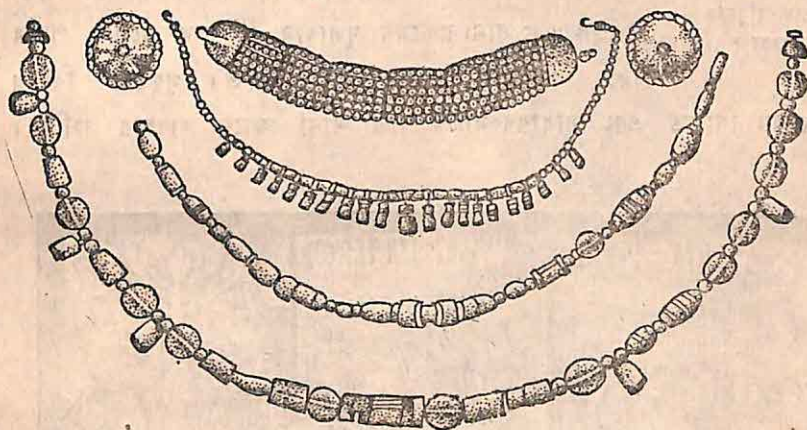
মহেঞ্জোদারোর অলঙ্কার

জন্য বিশাল স্নানাগারও নির্মিত হইয়াছিল। ইহার একটির ধ্বংসাবশেষ এখনও মহেঞ্জোদারোতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্নানাগারটি ১৮০ ফুট লম্বা, ১০৮ ফুট চওড়া এবং ইহার বাহিরের দেওয়াল ৮ ফুট পুরু। ইহার ভিতরে একটি প্রশস্ত আঙ্গিনা, এবং ঠিক তাহার মধ্যস্থলে ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া ও ৮ ফুট গভীর একটি জলাধার স্নান ও সন্তরণের জন্য নির্মিত হইয়াছিল।

হরপ্পায় প্রাচীন সুদৃঢ় দুর্গের নিদর্শন আছে। হরপ্পায় একটি প্রকাণ্ড শস্যভাণ্ডার ছিল। তাহারই কাছাকাছি কতকগুলি ছোট ছোট দালানের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া অনেকে মনে করেন, এগুলি শ্রমিকদের বসবাসের জন্য নির্মিত হইয়াছিল।

নাগরিক জীবন ঃ সেই আদিমতম যুগে নাগরিকদের প্রধান খাদ্য ছিল গম। ইহাছাড়া তাহারা বার্লি, খেজুর ও নানা ফলমূলও খাইত। মেষমাংস, শূকরের মাংস, মাছ, ডিম, দুধও তাহাদের সাধারণ খাদ্য ছিল। সুতী ও পশমী—এই দুই রকমের কাপড়ই নাগরিকগণ ব্যবহার করিত। তাহারা কাপড় পরিত, চাদর গায়ে দিত। সকল শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষই হার, চুড়ি, বালা প্রভৃতি নানা অলঙ্কার ব্যবহার করিত ; কোমরের মেখলা, নাকের নথ, কানের দুল, পায়ের মল—এই অলঙ্কার-গুলি একমাত্র স্ত্রীলোকদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। অলঙ্কারগুলির কারিগরি অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সোনা, রূপা, তামা, হাতীর দাঁত, ঝিনুক এবং নানা রকমের মূল্যবান ও কম মূল্যের পাথর দিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করা হইত। গৃহস্থরা বিভিন্ন প্রকারের চিত্রিত এবং সাধারণ মাটির পাত্র নানা কাজে ব্যবহার করিত।

খাদ্য

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি

মহেঞ্জোদারোর গৃহপালিত পশু

রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ ও চীনামাটির তৈয়ারী বাসনপত্রও ছিল, কিন্তু তাহা খুব কমই ব্যবহৃত হইত। নাগরিকরা খাট, চেয়ার, ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি ব্যবহার করিত।

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল জীবজন্তুর কঙ্কাল ও অঙ্কিত মূর্তি পাওয়া

গিয়াছে, তাহা দেখিয়া বুঝা যায় যে, নাগরিকরা গরু, ষাঁড়, মহিষ, ভেড়া, উট ও হাতী পালন করিত। কিন্তু ঘোড়ার ছবি, মূর্তি বা কঙ্কাল কোথাও দেখা যায় নাই। শিশুদের খেলনায় কুকুরের মূর্তি দেখিয়া বুঝা যায় তাহারা কুকুরও পালন করিত। যুদ্ধের জন্য কুঠার, বর্শা, ছোরা, গদা ও ফিঙ্গা (পাথর ইত্যাদি ছুঁড়িবার জন্য দড়ির যন্ত্র) ব্যবহৃত হইত। কয়েকটি তীর-ধনুর নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু তরোয়ালের কোন নিদর্শন অথবা যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার জন্য ঢাল বা অন্য কোন জিনিসই পাওয়া যায় নাই। অস্ত্রগুলি তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়া নির্মিত; পাথরের তৈয়ারী অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু লৌহনির্মিত কোন জিনিসই পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ এই যুগে লৌহের ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই।

গৃহপালিত পশু

অস্ত্রশস্ত্র

মহেঞ্জোদারোতে পাঁচ শতেরও বেশী মৃৎলিপি পাওয়া গিয়াছে। এগুলি খুব শক্ত এঁটেল মাটিতে প্রস্তুত, কিন্তু আকারে ছোট। কতকগুলির মধ্যে প্রকৃত ও কাল্পনিক পশুর মূর্তি এবং কিছু কিছু চিত্রলিপিও সুন্দরভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। বর্তমান কালের অক্ষরের ন্যায় ব্যবহৃত এই চিত্রলিপিগুলির পাঠোদ্ধার এখন পর্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই। এই সকল মৃৎলিপিতে অঙ্কিত চিত্রগুলি এমন সুন্দর যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশসমূহে শিল্পের ঐরূপ নিদর্শন দেখা যায় নাই। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার শিল্পীরা শিল্পকলায় ও ভাস্কর্যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে।

মহেঞ্জোদারোর ভাস্কর্য

মৃৎলিপি, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য

হরপ্পায় এমন কয়েকটি প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে যাহা তৎকালীন ভাস্কর্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ-নির্মিত একটি নর্তকীর মূর্তির কমনীয়তা বর্তমানকালের শিল্পীদেরও মুগ্ধ করে। তখন অনেক মাটির হাঁড়ি-পাতিল ও পালিশ করা চীনামাটির বাসনের

উপর নানা চিত্র অঙ্কিত হইত। তাহাও অতি সুন্দর। নানা নিদর্শন হইতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তৎকালীন লোকেরা স্থলপথে ও জলপথে শুধু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেই ব্যবসা-বাণিজ্য করিত না, এশিয়ার বহু দেশের সহিতও বাণিজ্য চালাইত।

সিন্ধু উপত্যকার ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত কতকগুলি মূর্তি হইতে তৎকালীন ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভবপর হইয়াছে। নানা ধরণের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবীমূর্তি দেখিয়া মনে হয় যে, মাতৃকা পূজা তখন প্রচলিত ছিল। পশ্চিম-এশিয়াও মাতৃকা অর্চনার প্রচলন ছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, সিন্ধু উপত্যকার সহিত পশ্চিম এশিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দেবীমূর্তি ছাড়া দেবমূর্তির নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে একটিকে প্রাচীন শিবমূর্তি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। একটি মৃৎলিপিতে তিনি যোগমগ্ন অবস্থায় অঙ্কিত হইয়াছেন; চতুর্দিকে পশুগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে; তাঁহার তিনটি মুখ এবং লম্বা শিরোভূষণের দুইদিকে দুইটি শৃঙ্গ খোদিত রহিয়াছে। পরবর্তী যুগের হিন্দুগণ ত্রিনেত্র, মহাযোগী, মহেশ্বর, পশুপতি, ত্রিশূল-ধারীরূপে কল্পনা করিয়াছে। মনে হয়, শিবের সম্বন্ধে সিন্ধু উপত্যকায় প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসই হিন্দুদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ইহা ছাড়া বর্তমান শিবলিঙ্গের মতো প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গও সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে। শিব ও শক্তির অর্চনা ছাড়া প্রস্তর, অশ্বত্থাদি বৃক্ষ, বৃষাদি পশুও উপাস্য দেবতারূপে পূজিত হইত।

ধর্ম

সিন্ধু সভ্যতা, দ্রাবিড় সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা ঃ প্রস্তর যুগের পরে সম্ভবতঃ দক্ষিণাপথের দ্রাবিড় জাতি ভূমধ্য সাগর তীর হইতে ভারতে আসিয়াছিল এবং তাহাদের সভ্যতাও খুব উন্নত ছিল। বর্তমানকালে দক্ষিণ ভারতে যাহারা তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মলয়ালম প্রভৃতি ভাষায় কথা বলে, তাহারা এই দ্রাবিড় জাতির বংশধর। প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির সভ্যতা খুব উন্নত ছিল। তাহারা বড় বড় দুর্গ নির্মাণ করিত এবং সমুদ্র-পথে দূর দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। তাহাদের ভাষা, সাহিত্য ও ধর্মমত উচ্চ সভ্যতার পরিচায়ক। অনেকে মনে করেন এই দ্রাবিড় জাতি অতি প্রাচীনকালে সিন্ধুনদের উপত্যকায়, বেলুচিস্থানে এবং আর্যাবর্তের কোন কোন স্থানে বাস করিত; পরে তাহারা দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যায়। তাঁহাদের বিশ্বাস, সিন্ধুনদের উপত্যকায় ও অন্যান্য স্থানে পূর্বোক্ত যে সকল প্রাচীন ধ্বংসা-বশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এই দ্রাবিড় সভ্যতারই প্রাচীনতম নিদর্শন।

সিন্ধু-সভ্যতা ও দ্রাবিড় সভ্যতা

বেলুচিস্থানের ব্রাহুই নামে উপজাতীয় লোকেরা এখনও দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করে; ইহা দ্বারা এই মত কতকটা সমর্থিত হয়। কিন্তু সকলে এই মত গ্রহণ করেন না।

বৈদিক যুগের সভ্যতা ও সিন্ধু-সভ্যতা সমসাময়িক কিনা, ইহাই একটি প্রশ্ন। কেহ কেহ বলেন, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার সিন্ধু-সভ্যতার পূর্বে ঋগ্‌বেদীয় যুগের প্রাচীনতম আর্য-সভ্যতা প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেকের মতে বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতার অনেক পরবর্তী। বৈদিক যুগের আর্যদের সহিত সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীদের কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য ছিল। বৈদিক আর্যগণ সিন্ধুবাসীদের মতো নগরে বাস করিত না। প্রধানতঃ তাহারা গ্রাম্য জীবনই যাপন করিত। বৈদিক আর্যগণ লৌহের ব্যবহার জানিত; তাহারা লৌহনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র, তরবারি ও আত্মরক্ষার জন্য ঢাল ব্যবহার করিত। সিন্ধুবাসীদের এসকল জানা ছিল না। বৈদিক আর্যগণ অশ্বারোহণ করিত, কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতায় তাহার নিদর্শন নাই। বৈদিক যুগে মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল না, সিন্ধু-সভ্যতায় মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই দুই সভ্যতা অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। কাল-ক্রমে এই উভয়বিধ সভ্যতা ও ধর্মানুষ্ঠানই সমগ্র ভারতে হিন্দুদের মধ্যে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সিন্ধু-সভ্যতা ও আর্য সভ্যতা

আর্যগণের ভারতে আগমনঃ আর্যগণ বর্তমান হিন্দু জাতির পূর্ব-পুরুষ। তাহারা কোথা হইতে কখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন, আর্য ভাষাভাষী অতি প্রাচীন এক মানব-গোষ্ঠীর একটি শাখা তাহাদের পূর্বতন বাসভূমি হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া উত্তর-পশ্চিম গিরিপথের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এই শাখাই ভারতের আর্যজাতি নামে পরিচিত। ভারতের সর্ব অঞ্চলেই তখন আদিম অধিবাসীরা বসবাস করিত। আর্যগণের সহিত প্রভেদ সূচিত করিবার জন্য তাহাদের বলা হয় অনার্য। আর্যগণ ভারতে আসিয়াই ঘোরতর যুদ্ধে অনার্যদিগকে পরাজিত করিয়া পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করে। ইহার পর ক্রমে ক্রমে তাহারা উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের অধিকৃত এই বিস্তৃত অঞ্চলের নাম হয় আর্যাবর্ত অর্থাৎ আর্যগণের বাসভূমি। পরাজিত আদিম অধিবাসীদের অনেকে দাসরূপে আর্যসমাজে গৃহীত হয়। কিন্তু ইহাদের কতকাংশ বনে-জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে। ইহাদের বংশধরগণ এখনও বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়-পর্বতে বসবাস করিতেছে।

আর্যগণের সহিত আদিবাসীদের যুদ্ধ

আর্যগণের পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানা মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, ভারতবর্ষই আর্যগণের জন্মভূমি ছিল ; অনেকেই বলেন যে, অতি প্রাচীন আর্য ভাষাভাষী মানবজাতি বহুদিন পর্যন্ত কোন এক সুদূর অঞ্চলে গ্রীক, রোমান, জার্মান, ফরাসি, ইংরেজ, রাশিয়ান ইত্যাদি নানা জাতির পূর্ব-পুরুষদের সহিত একত্র বসবাস করিত। তারপর কোন এক সময়ে এই সমুদয় জাতি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসতি স্থাপন করে। আদিম যুগে ইহাদের বাসভূমি সম্বন্ধে সাধারণ মত এই যে, ইহারা মধ্য-এশিয়ার কোন অঞ্চলে, অথবা রাশিয়ার দক্ষিণ-ভাগের কোন স্থানে বসবাস করিত। আবার কাহারও কাহারও মতে উত্তর-মেরু প্রদেশ, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী অথবা বোহেমিয়া অঞ্চলেই ইহাদের আদি বাসস্থান ছিল। তবে ইহারা যে যাযাবর অর্থাৎ নিয়ত ভ্রমণকারী ছিল, ইহা অনেকেই স্বীকার করেন।

অনার্যদিগকে পরাভূত করিয়া আর্যগণ সপ্তসিন্ধু* অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। যখন ঋগ্‌বেদ গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন পর্যন্ত আর্যগণের বসতি আফগানিস্থানের নদ-বিধৌত অঞ্চল, পঞ্চনদ বা পঞ্জাব প্রদেশ এবং বর্তমান উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে অন্যান্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণ রচিত হইবার সময়, আর্যগণ পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং কুরু (দিল্লীর চারিদিকে অবস্থিত অঞ্চল), পঞ্চাল (কুরুর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত গঙ্গার উপত্যকা ভূমি); মৎস্য (জয়পুরের নিকটস্থ বিরাট নামক রাজ্য), কৌশাম্বী (এলাহাবাদ জেলা), কাশী, কোশল (অযোধ্যা), বিদেহ (উত্তর বিহার), চেদী (বুন্দেলখণ্ড), বিদর্ভ (বেরার) ইত্যাদি নানা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল।

ভারতে আর্যগণের বসতি

আর্যগণের সামাজিক জীবন ঃ যাযাবর আর্যগণ ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। সপ্তসিন্ধু অধিকৃত হইলে তাহারা ঘরবাড়ি নির্মাণ করিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিল। গৃহস্বামী ও তাহার সন্তানসন্ততি-

---

* মূল সিন্ধুনদ সহ তাহার সাতটি প্রশাখা 'সপ্তসিন্ধু' নামে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সাতটির নাম—বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রু, সরস্বতী ও দৃশদ্বতী। ইহাদের প্রথম পাঁচটি নদী-বিধৌত অঞ্চলের নাম দেওয়া হইয়াছে পঞ্চনদ বা পঞ্জাব (পঞ্চ+অপ্ অর্থাৎ জল)। আর্যদের নিকট আর্ত পবিত্র বলিয়া গৃহীত সরস্বতী নদী এবং তাহার শাখা দৃশদ্বতী এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আফগানিস্থানের কুভা (কাবুল নদ), সুবাস্তু (সোয়াট নদ), ক্রুমু (কুররাম নদ), গোমতি (গোমাল নদ)—এইগুলি সিন্ধুনদেরই শাখা-প্রশাখা। কুভা প্রভৃতি প্রাচীন যুগের নাম।

সহ এক একটি স্বতন্ত্র পরিবার তাহার প্রতিবেশীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে দিন যাপন করিতে লাগিল।

শাস্ত্রীয় পবিত্র প্রণালীতে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী ছিল আর্য পরিবারের মূল ভিত্তি। সহধর্মিণীরূপে স্ত্রী স্বামীর সহিত একযোগে বৈদিক ধর্মকর্মাদি সম্পাদন করিত। নারীজাতি ঐ যুগে উচ্চ শিক্ষালাভ করিত। বিশ্ববারা, অপালা, ঘোষা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিতা মহর্ষি-স্থানীয়া মহিলাগণ বৈদিক মন্ত্রও রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকালে আর্যসমাজে যে ভাবে সুন্দর পরিবার গড়িয়া উঠিত, তাহাই হিন্দু সমাজ আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া পরবর্তী-কালে শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন যাপন করিতে উৎসাহী হইয়াছে।

নারীজাতির অবস্থা

প্রাচীনকালে আর্যগণ আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ খাদ্যই খাইত। ধান, যব, গম, বরবটি, তিল প্রভৃতি ছিল সে যুগের প্রধান খাদ্যশস্য। সোমলতার রস (সুরা) তাহারা যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সময় পানীয় রূপে ব্যবহার করিত। দুগ্ধের সহিত মধু বা ইক্ষুরসে প্রস্তুত পিষ্টকাদিও তাহাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। তাহারা অতি সাধারণ একখানা পরিধেয় বস্ত্র ও একখানা উত্তরীয় পরিত। পরবর্তী কালে পরিধেয় বস্ত্রের নীচে একখানা নীবি ও অন্তর্বাস পরা হইত, তাহার উপরের বস্ত্রখানিকে বলিত বহির্বাস। স্ত্রীলোকেরাও একখানা কাপড় পরিত, অপর একখণ্ড কাপড় দিয়া বুক ঢাকিয়া রাখিত। পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণত নানা রঙে রঞ্জিত তুলা, পশম ও চর্মদ্বারা প্রস্তুত করা হইত। স্বর্ণ ও নানা প্রকার মূল্যবান্ মণিমুক্তার অলঙ্কার স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করিত।

খাদ্য ও পরিচ্ছদ

আর্যগণের প্রধানতম বৃত্তি বা জীবিকার্জনের উপায় ছিল কৃষিকার্য। আনুমানিক চারি হাজার বৎসর পূর্বে প্রাচীন আর্যযুগে জোয়ালে বাঁধা একজোড়া গরু বা ষাঁড়ের সাহায্যে যে ভাবে জমি চাষ করা হইত, বর্তমান ভারতেও সেই ভাবেই কৃষিকার্য করা হয়। চাষের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা তখনও ছিল। গাভীই ছিল তাহাদের প্রধান সম্পদ। তাহারা পরম যত্নে গাভীর সেবা করিত। নিত্য-প্রয়োজনীয় তুলা ও পশমের কাপড় বোনাও তাহাদের অন্য একটি প্রধান বৃত্তি ছিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ইহা করিত। সূত্রধর অর্থাৎ ছুতার বা কাঠের মিস্ত্রীর কাজ ছিল বাড়ি-ঘর, আসবাব-পত্র ও নানা প্রকার কাঠের জিনিস প্রস্তুত করা। কর্মকার সীবনী বা ছুঁচ, কেশমুণ্ডনাস্ত্র বা ক্ষুর হইতে আরম্ভ করিয়া দাত্র বা দা, কাস্তে, লাঙ্গলের ফলক, বর্শা, খড়্গ, তরবারি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করিত। স্বর্ণকার

কৃষিকর্ম ও গো-পালন

অন্যান্য বৃত্তি

সোনা ও মুক্তার নানা অলঙ্কার, চর্মকার জ্যা বা ধনুর্গুণ ও আসনাদি তৈয়ার করিত। এ সকল বৃত্তি ছাড়া যজ্ঞানুষ্ঠাতা পুরোহিত, বৈদ্য বা চিকিৎসক, সমাজ ও রাষ্ট্ররক্ষাকারী যোদ্ধা প্রভৃতির বৃত্তিও বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। বৈদিক যুগে নানা দেশ-বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। এই যুগে বর্তমান কালের ন্যায় মুদ্রার প্রচলন ছিল না। সাধারণত এক জিনিসের বিনিময়ে অপর জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করাই ছিল ব্যবসা পরিচালনার প্রণালী। তবে ধাতুখণ্ডও মূল্যরূপে ব্যবহৃত হইত। যতদূর মনে হয়, প্রাচীন বৈদিক যুগে প্রত্যেক আর্যই প্রয়োজনমতো যে কোন কার্য করিত। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমাজ ও জাতি যাহাতে ক্রিয়াশীল ও সুগঠিত হয়, সেইজন্যই পরবর্তীকালে গুণানুসারে এক এক শ্রেণীর আর্য এক এক প্রকার কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য

আর্যগণের ধর্ম ও সমাজের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা : ধর্মসাহিত্য—প্রাচীন আর্যগণের সামাজিক ভিত্তিই ছিল ধর্ম। তাঁহাদের সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান ধর্মসাহিত্যের নাম বেদ। বেদ চারিভাগে বিভক্ত, এজন্য ইহা চতুর্বেদ নামেও পরিচিত। সেই চারিভাগ হইল—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। ঋগ্‌বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সামবেদের অধিকাংশ স্তুতি ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত। যজুর্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—শুক্লযজুঃ ও কৃষ্ণযজুঃ। ইহাতে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অথর্ববেদে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ও সংস্কার, নানা উপদেবতা ও অপদেবতার প্রভাব, চিকিৎসাবিদ্যার ইঙ্গিত প্রভৃতি নানা বিষয় মন্ত্র-স্তোত্রাদি দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

চতুর্বেদ

প্রত্যেক বেদের আবার তিনটি করিয়া ভাগ আছে—সংহিতা, ব্রাহ্মণ (আরণ্যক ও উপনিষদ্ সহ) এবং বেদাঙ্গ বা সূত্র। সাধারণত স্তবস্তুতি ও যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্রাদি লইয়া বেদের সংহিতাভাগ পদ্যে রচিত হইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণ অংশ গদ্যে রচিত। ইহাতে যজ্ঞের বিবিধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা ও মন্তব্য আছে। হিন্দুগণের বিশ্বাস ভগবানের বাণী বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশে মহাযোগী মহর্ষিদের মাধ্যমে ব্যক্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অভ্রান্ত ও বিচার-বিতর্কের অতীত। মহর্ষিগণ কর্তৃক শ্রুত ভগবদ্বাণী বলিয়া বেদের অপর নাম শ্রুতি। গুরুগণের মুখে বেদমন্ত্র শুনিয়াই শিষ্যদের তাহা সম্পূর্ণরূপে অধিগত হইত। এজন্যও বেদকে শ্রুতি বলা হয়। অরণ্যবাসী ঋষি ও ব্রহ্মচারীদের দার্শনিক চিন্তার ধারা আরণ্যক ও উপনিষদে স্থান লাভ

বেদের তিন ভাগ

করিয়াছে। ভগবানের স্বরূপ, মানুষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ প্রভৃতি ইহার আলোচ্য বিষয়। উপনিষদ হিন্দুদের উচ্চ অধ্যাত্ম জ্ঞানের পরিচায়ক।

বেদের অবশিষ্ট অংশ বেদাঙ্গ বা সূত্র মানুষের রচনা। বেদাঙ্গের সংখ্যা ছয়টি, কিন্তু এই ছয়টি সংখ্যা দ্বারা ছয়খানি বিভিন্ন গ্রন্থ বুঝায় না, ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন আলোচ্য বিষয়ই হইল ছয় বেদাঙ্গ। এই বিষয়গুলি হইল শিক্ষা (মন্ত্রের প্রকৃত উচ্চারণ-পদ্ধতি), ছন্দ (বৈদিক পদ্যের সুসঙ্গত পাঠ-প্রণালী), ব্যাকরণ (বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তি, প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়), নিরুক্ত (বৈদিক শব্দের মূল অর্থাদি ব্যাখ্যা), জ্যোতিষ (গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিষয়ক আলোচনা) এবং কল্প (যাগযজ্ঞের বিধি-বিধান)। বেদ শুদ্ধভাবে পাঠ করিবার জন্য প্রথম দুইটি, তৃতীয় ও চতুর্থটি বেদের অর্থাদি সম্যক্‌রূপে বুঝিবার জন্য, এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠটি যাগযজ্ঞে বেদবিধি প্রয়োগের জন্য আবশ্যক। বেদাঙ্গের কল্পাংশ হইতেই জ্যামিতির উদ্ভব হইয়াছিল।

বেদাঙ্গ

উপনিষদের অনুকরণে লিখিত পরবর্তী যুগের ষড়্‌দর্শন অর্থাৎ ছয়টি দর্শনশাস্ত্রও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই ষড়্‌দর্শন হইল—কপিলের সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলির যোগদর্শন, গৌতমের ন্যায়দর্শন, কণাদের বৈশেষিক দর্শন, জৈমিনির পূর্বমীমাংসা দর্শন এবং ব্যাসের উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন। এই ষড়্‌দর্শন উপনিষদের ন্যায় আর্যগণের গভীর চিন্তাধারা এবং অসীম মনীষার পরিচয় দেয়। ইহা ছাড়া আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ধনুর্বেদ বা সামরিক বিজ্ঞান, গন্ধর্ববেদ বা সঙ্গীতকলা,—এই সকল উপবেদ অর্থাৎ সহকারী বেদ এবং স্থাপত্য ও অন্যান্য নানা প্রকার মৌলিক সাহিত্যেও আর্যগণ যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল।

ষড়্‌দর্শন উপবেদ ও সাহিত্যাদি

বৈদিক সাহিত্যের সংহিতাভাগই সর্বপ্রাচীন, আবার ঋক্‌সংহিতা অন্যান্য সংহিতাভাগ হইতে বহু প্রাচীন। মহামান্য তিলক বহু গবেষণা করিয়া খ্রীষ্টজন্মের ৬০০০ বৎসর পূর্বে ঋক্‌সংহিতা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে অনেকের মতে ঋক্‌সংহিতা আনুমানিক ২০০০ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, অন্যান্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি ১২০০ হইতে ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, আরণ্যক ও সর্ব প্রাচীন পাঁচ-ছয়খানি উপনিষদ ৮০০ হইতে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং বেদাঙ্গ বা সূত্রগুলি ৬০০ হইতে ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

ধর্মানুষ্ঠান : বৈদিক যুগে আর্যগণের ধর্মে বিশেষ কোন জটিলতা ছিল না।

প্রকৃতির যে সকল দৃশ্য তাহাদিগকে মুগ্ধ, বিস্মিত বা ভীত করিত, তাহাদের প্রত্যেকটিকেই তাহারা দেবদেবীরূপে গ্রহণ করিত। এইরূপে ইন্দ্র হইলেন ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা, বরুণ হইলেন জলের দেবতা, বায়ুর দেবতা হইলেন মরুৎ। প্রদীপ্ত সূর্য ও প্রজ্বলিত অগ্নি দেবতারূপে পূজিত হইতে লাগিলেন। প্রত্যুষকালের অপরূপ সৌন্দর্য ঊষাদেবীরূপে অর্চিতা হইলেন এবং আকাশের অনন্ত বিস্তার দ্যৌস্ (দ্যৌঃ) রূপে পূজা পাইলেন। কিন্তু এই সকল প্রাকৃতিক দেবদেবী যে একই ভগবানের বিভিন্ন বিকাশ, ইহাও আর্যগণ উপলব্ধি করিয়াছিল। বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে দেবদেবীর পূজানুষ্ঠান অত্যন্ত সরল ছিল। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অভিনব স্বরে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে ঘৃত, দুগ্ধ, যব প্রভৃতি আহুতি দেওয়া হইত।

বৈদিক যুগের ধর্মকর্ম

বর্ণবিভাগ—গুণ ও কর্মানুসারে আর্যগণ এক সময়ে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। এই শ্রেণী-বিভাগকেই বলা হয় বর্ণ-বিভাগ। বর্তমান হিন্দুসমাজ প্রধানতঃ এই বিভাগের উপরই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রাচীনতম বৈদিক যুগে আর্যসমাজে মাত্র দুইটি ভাগ ছিল—আর্য ও দাস। গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় বিজেতা, আর্য, আর কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায় আর্যগণের বিজিত ও আশ্রিত অনার্য, দাস। কালক্রমে আর্যসমাজের লোকসংখ্যা যখন অনেক বাড়িয়া গেল, তখন তাহাদের মধ্যে চারিটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিল। অনেকের কাছেই তখন বেদ দুর্বোধ্য হইয়াছিল, যাগযজ্ঞ ধর্মকর্ম বিধিমতো পালন করাও তখন অনেকের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং বেদাদি অধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞ প্রভৃতি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করা এক শ্রেণীর নিষ্ঠাবান লোকের একমাত্র কর্তব্য হইল। এই বিশেষ শ্রেণীই হইল ব্রাহ্মণ। আর্যগণের রাজ্য-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অপর এক শ্রেণী সুদক্ষ যোদ্ধার কর্তব্য হইল রাজ্যশাসন ও পালন করিয়া স্বজাতিকে রক্ষা করা। এই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর আর্য হইল ক্ষত্রিয় বা রাজন্য। বিশ অর্থাৎ অবশিষ্ট আর্যগণের কৃষিকার্য, শিল্পকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য করাই প্রধান করণীয় হইল। এই শ্রেণীর আর্য বৈশ্য নামে খ্যাত হইল। আর্যসমাজে যে সকল অনার্য দাসরূপে গৃহীত হইয়াছিল, ভৃত্যের যাবতীয় কর্ম তাহারাই করিত। ইহারা শূদ্র নামে পরিচিত হইল। এইরূপে চারিবর্ণের উৎপত্তি হইল।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র

আর্যগণের রাজনীতি ঃ বৈদিক যুগে গৃহস্বামী কর্তৃক পরিচালিত পরিবারই

ছিল রাজ্যের-মূল ভিত্তি। কয়েকটি পরিবার লইয়া গ্রাম গড়িয়া উঠিত। গ্রামের পরিচালককে বলা হইত গ্রামণী। একত্রে কতকগুলি গ্রামই ছিল বিশ বা জন অর্থাৎ জাতির রাজ্য। প্রাচীন বৈদিক যুগের জাতিসমূহের মধ্যে ভরত, তৃৎস্থ, যদু ও পুরু জাতি বিখ্যাত ছিল। পরবর্তী যুগে উত্তর ভারতের পূর্বদিকে বিস্তৃত আর্য রাজ্যগুলিতে কুরু, পাঞ্চাল, কাশী, কোশল ও বিদেহগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছিল। আর্যযুগের রাজা সাধারণত স্বেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজাগণ রাজা নির্বাচন করিত। ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত সভা ও সমিতি নামে দুইটি প্রতিষ্ঠানের মতামত অনুসারে রাজাকে চলিতে হইত। পরবর্তীকালে রাজার অবাধ প্রভুত্ব ও ক্ষমতার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। তবে ধর্মগ্রন্থে রাজার যে কর্তব্য লিপিবদ্ধ ছিল, কোন ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু রাজাই তাহা লঙ্ঘন করিতেন না। প্রাচীন ভারতের অনেক রাজাই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার ও সুশাসন করিয়া প্রজাগণের মঙ্গল সাধন ও মনোরঞ্জন করিতে সর্বদা যত্নবান থাকিতেন। তখনকার দিনের রাজকর্মচারীদের মধ্যে পুরোহিত, সেনানী বা সেনাপতি ও গ্রামণীই ছিল প্রধান। দূত ও চর অর্থাৎ গোয়েন্দার উল্লেখও পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগে পদাতিক, রথারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সেনা-বাহিনী গঠিত হইত। হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়াও যুদ্ধ হইত। সৈন্যদের প্রধান অস্ত্র ছিল ধনুর্বাণ, বর্শা, শূল, তরবারি, খড়্গ ও কুঠার। আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যগণ ঢাল, শিরস্ত্রাণ ও বর্ম ব্যবহার করিত।

গৃহপতি ও গ্রামণী

সভা ও সমিতি

সেনাবাহিনী

প্রাচীন বৈদিক যুগের রাজ্যগুলি সাধারণত সামান্য ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকিত। পরবর্তীকালে বহু রাজার উপর একজন রাজার আধিপত্য স্থাপনের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। যে রাজা অন্য সমস্ত রাজাকে পরাজিত করিতে পারিতেন, তিনি রাজচক্রবর্তী উপাধি ধারণ করিতেন। অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানই ছিল রাজচক্রবর্তীরূপে গণ্য হইবার উপায়। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা রাজা বহু সৈন্য-সামন্ত সহ এক যজ্ঞীয় অশ্বকে স্বাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণের জন্য ছাড়িয়া দিতেন। অশ্বটি বিভিন্ন রাজ্যে উপস্থিত হইলে ঐ সকল রাজ্যের রাজাকে হয় অশ্বাধিকারী রাজার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত, নচেৎ অশ্ব ধরিয়া রাখিয়া অশ্বরক্ষক সেনাদলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। অশ্বরক্ষক সেনাদল যদি সমস্ত বিরোধী রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া অশ্বসহ রাজধানীতে ফিরিতে পারিত, তবে অশ্বটিকে বলি দিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইত, এবং যজ্ঞানুষ্ঠাতা রাজা রাজচক্রবর্তী বলিয়া ঘোষিত ও স্বীকৃত হইতেন। রাজসূয় যজ্ঞে যজ্ঞকারী রাজার যজ্ঞস্থলে সমস্ত রাজ্যের রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইত; তাঁহারা আসিয়া যজ্ঞকারী রাজার অধীনতা স্বীকার করিতেন এবং ভৃত্যের ন্যায় কর্ম করিতেন। কেহ আসিতে অস্বীকার করিলে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আনা হইত।

———

চতুর্থ অধ্যায়
বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম

গৌতম বুদ্ধ ঃ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতমের পিতা শুদ্ধোদন শাক্যজাতির গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নায়ক বা রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কপিলবস্তু নগরে* শাক্যগণের রাজধানী ছিল। শাক্যরাজ্যের একটি ক্ষুদ্র নগর দেবদহ-নিবাসিনী মায়াদেবী ছিলেন গৌতমের মাতা। সম্ভবতঃ গর্ভাবস্থায় পিতৃগৃহে যাইবার সময় কপিলবস্তুর নিকটবর্তী লুম্বিনী বনে আনুমানিক

জন্ম

গৌতম বুদ্ধ

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৬ (মতান্তরে ৫৪৩) অব্দে গৌতমের জন্ম হয়। জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। তখন তাঁহাকে লালন পালন করেন গৌতমী নামে তাঁহার এক আত্মীয়া। গৌতমের অপর নাম সিদ্ধার্থ। বাল্যকাল হইতেই গৌতম চিন্তাশীল ও সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। অবশ্য কিশোর বয়সে তিনি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধবিদ্যা ও অন্যান্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার আকর্ষণ না দেখিয়া শুদ্ধোদন চিন্তিত হইলেন। পুত্রের মন সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য পিতা তাঁহাকে এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। কন্যাটির নাম ছিল গোপা বা যশোধরা। কিন্তু জগতের দুঃখময় পরিণাম গৌতমের মনকে বিচলিত করিতে লাগিল। নানা বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, নগর ভ্রমণকালে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ও ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের বিকার ও দুঃখ এবং মৃতের শবদেহ দেখিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে

বিবাহ

* উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বর্তমান বস্তি জেলার উত্তরে নেপাল তরাই অঞ্চলে রুম্মিনদেই নামক স্থানের নিকট কপিলবস্তু নগর অবস্থিত ছিল। সম্রাট অশোকের নির্মিত বিখ্যাত রুম্মিনদেই স্তম্ভ বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনীর নাম স্মরণ করাইয়া দেয়।

এক সন্ন্যাসীর শান্ত সংযত মুখখানি দেখিয়া সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় কোন্ পথে খুঁজিতে হইবে, তাহা তিনি বুঝিয়া লইলেন।

উনত্রিশ বৎসর বয়সে গৌতমের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই গৌতম বুঝিলেন, সংসারের মায়ামোহ তাঁহাকে এমনভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে যে, তাঁহার আর মুক্তি লাভের উপায় থাকিবে না। তাই তিনি অকস্মাৎ এক রাত্রিতে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। গৌতমের এই গৃহ-ত্যাগকে বৌদ্ধশাস্ত্রে মহাভিনিষ্ক্রমণ্ বলা হইয়াছে। ছয় বৎসর কাল তিনি পাটনা জেলার রাজগৃহে ও অন্যান্য স্থানে ঘুরিলেন এবং দুইজন বিখ্যাত শিক্ষকের নিকট শাস্ত্রপাঠ করিলেন। অবশেষে বোধগয়া বা বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষ নামে সুবিখ্যাত একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে বসিয়া গভীর ধ্যানের পর তিনি দুঃখময় জীবনের সমস্যা সমাধান করিয়া নির্বাণ বা মুক্তিলাভের প্রকৃত পথের সন্ধান পাইলেন। তখন হইতেই তিনি বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি তথাগত (অর্থাৎ সত্যের প্রকৃত সন্ধানী) নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর। ইহার পর গৌতমবুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল উত্তর-ভারতের নানা স্থানে সাধারণ কথ্যভাষায় ধর্মপ্রচার করিলেন। আশী বৎসর বয়সে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দে কুশীনগরে* তাঁহার মহাপরিনির্বাণ (অর্থাৎ মৃত্যু) হয়। বৌদ্ধদের মতে গৌতমবুদ্ধের পূর্বে আরও কয়েকজন বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু গৌতমবুদ্ধই বৌদ্ধ-ধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

সন্ন্যাস-গ্রহণ

বুদ্ধ বা জ্ঞানী

বুদ্ধের ধর্মমত ঃ উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের উপর এই ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত। কপিলমুনির সাংখ্য দর্শনের সহিত বুদ্ধের মতবাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বেদ যে কোন মনুষ্যের রচিত নহে ও অভ্রান্ত এবং ব্রাহ্মণই যে মনুষ্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা বুদ্ধ মানিতেন না। বৈদিক যাগযজ্ঞে মানুষের নির্বাণ বা মুক্তি লাভ হইতে পারে, ইহাও তিনি স্বীকার করিতেন না। বুদ্ধের মতে মানুষ স্বীয় কর্মের দ্বারা নিজের ভাগ্য নিজেই গড়িয়া তোলে, কোন দেব-দেবীর ইহাতে হাত নাই। ধর্ম-কর্মের প্রধান পথই হইল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখা। এজন্মে যদি কেহ ভাল কাজ করে, তবে পরজন্মে সে উন্নততর জীবন লাভ করিবে। এইরূপ ভাল কাজ করিতে থাকিলে মানুষ জন্মের পর জন্মে, উন্নতিলাভ করিতে করিতে অবশেষে নির্বাণ লাভ করিবে। কিন্তু মানুষ যদি মন্দ কর্মে রত থাকে, তবে

* উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত কাশিয়া নামক স্থানে প্রাচীন কুশীনগর অবস্থিত ছিল।

তাহাকে জন্ম-জন্মান্তরে নিম্ন হইতে নিম্নতর জীবনে পড়িতে হইবে। কেবল ভোগবিলাসে রত থাকিলে মানুষ নীচ স্তরে নামিয়া যায়, আবার কঠোর সাধনায় রত হইলেই দুঃখকষ্টের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং এই দুইটিই অহিতকর ও অকল্যাণকর পথ। এই দুই পথ ত্যাগ করিয়া মধ্যপন্থা অবলম্বন করিলে শান্তি ও জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয় এবং তাহাই মানুষকে নির্বাণের দিকে লইয়া যায়। সত্যকথন, জীবে দয়া, আত্মসংযম, কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা ইত্যাদি সাধারণ ধর্মনীতি পালনই নির্বাণলাভের একান্ত প্রয়োজনীয় পন্থা।

এই সকল ধর্মমত ছাড়াও 'অহিংসা পরম ধর্ম'—এই নীতি তাঁহার ধর্মের একটি মূল সূত্র। বুদ্ধ জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন। তিনি তাঁহার প্রচারিত ধর্মে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ স্বীকার করেন নাই।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ঃ বুদ্ধদেব নিজে তাঁহার ধর্মমত লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁহার শিষ্যগণ মগধের রাজধানী রাজগৃহে এক বৌদ্ধ সঙ্গীতি বা সম্মেলনে মিলিত হইয়া তাঁহার ধর্মোপদেশ সুনির্দিষ্ট-ভাবে সংকলিত করেন। পরে সেই সংকলিত ধর্মোপদেশ ত্রিপিটক (তিন পেটিকা বা পেটরা অর্থাৎ ভাগ) নামে লিপিবদ্ধ হয়। এই ত্রিপিটক হইল—(১) বিনয়পিটক—ইহাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু-(সন্ন্যাসী) গণের আচার-ব্যবহার ও বৌদ্ধ সংঘের নিয়মাবলী আলোচিত হইয়াছে। (২) সুত্ত বা সূত্রপিটক—ইহাতে বুদ্ধদেব কি ভাবে স্বীয় ধর্মমত বুঝাইয়া অবিশ্বাসীদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা, শিষ্যদের সহিত ধর্মকর্মানুষ্ঠানের আলোচনা, জন্মজন্মান্তরের প্রভাব, নির্বাণলাভের উপায় ইত্যাদি বহু বহু বিষয় গদ্যে, পদ্যে ও কথোপকথনে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। (৩) অভিধমন বা অভিধর্মপিটক—ইহাতে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক মতবাদ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ত্রিপিটক

বর্ধমান মহাবীর ঃ বর্ধমান মহাবীরের জিন (অর্থাৎ রিপু-বিজয়ী) নাম অনুসারে যে ধর্মসম্প্রদায়ের জৈন নাম হইয়াছে, সেই জৈন ধর্মাবলম্বীদের মতে বর্ধমান মহাবীর জৈনধর্মের প্রথম প্রবর্তক ছিলেন না। তাঁহার পূর্বে তেইশ জন তীর্থঙ্কর (মুক্তিপথ-প্রদর্শক সিদ্ধপুরুষ) জৈনধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাহারা বলে, প্রথম তীর্থঙ্কর ছিলেন ঋষভ্ এবং শেষ তীর্থঙ্কর হইলেন বর্ধমান মহাবীর। কিন্তু প্রথম বাইশ জন তীর্থঙ্কর ইতিহাসে অপরিচিত। ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তিনিই জৈন ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম

তীর্থঙ্কর

শতাব্দীতে পার্শ্বনাথের দেহত্যাগের প্রায় ২৫০ বৎসর পরে জৈনধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও গৌতম বুদ্ধ সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি বর্তমান বিহারের প্রাচীন বৈশালী* নগরীর শহরতলী কুণ্ডগ্রামে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম ছিল বর্ধমান। তাঁহার পিতা সিদ্ধার্থ একজন ধনী ক্ষত্রিয় বংশের লোক এবং একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। বর্ধমানের মাতা ত্রিশলা ছিলেন বৈশালী নগরীর লিচ্ছবিগণের অধিনায়ক চেতকের ভগ্নী। যথাকালে বর্ধমানের বিবাহ হয় এবং পত্নী যশোদার গর্ভে তাহার এক কন্যা জন্মে। পিতামাতার মৃত্যুর পর ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যার পর তিনি পরেশনাথ পাহাড়ের নিকটবর্তী প্রাচীন জৃম্ভিক গ্রামে সংসারের সুখদুঃখ জয় করিয়া মুক্তিলাভের পথ নির্ধারণ করেন। এইরূপে কৈবল্য (অর্থাৎ প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্তির পূর্ণ জ্ঞান) লাভ করিয়া তিনি মহাবীর ও জিন (রিপুজয়ী) নামে বিখ্যাত হন। এই জিন নাম হইতেই তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম জৈন নামে পরিচিত হয়। এই ধর্ম-সম্প্রদায় পূর্বে নিগ্রন্থ (অর্থাৎ যাহাদের পরিধেয় বস্ত্রের গ্রন্থি নাই, অথবা সংসারে বন্ধন নাই) নামেও পরিচিত ছিল। মহাবীর তাঁহার জীবনের পরবর্তী ত্রিশ বৎসর কাল ধর্ম প্রচার করিয়া কাটাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে ৭২ বৎসর বয়সে পাটনা জেলার অন্তর্গত পাবা নামক স্থানে খ্রীষ্টজন্মের আনুমানিক ৪৬৮ বৎসর পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বর্ধমানের জন্ম

বিবাহ

সন্ন্যাস

জিন

বর্ধমান মহাবীর

* উত্তর বিহার বর্তমানে মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বসার নামক গ্রাম।

জৈন ধর্মমত ঃ যতদূর জানা যায়, পার্শ্বনাথের প্রবর্তিত ধর্মনীতিই বর্ধমান মহাবীর মূলত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথের ধর্মমতে চতুর্যাম বা জীবনযাত্রার চারিটি মূলনীতির প্রাধান্য ছিল--(১) সত্যকথা বলিবে, কিছুতেই মিথ্যার আশ্রয় লইবে না ; (২) জীবহত্যা করিবে না, জীবহিংসা ত্যাগ করিবে ; (৩) কোন ধন-সম্পত্তির অধিকারী থাকিবে না ; (৪) কেহ স্বেচ্ছায় দান না করিলে অন্যের কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। মহাবীর এই চারিটি নীতির সহিত ব্রহ্মচর্য পালনের ও জিতেন্দ্রিয় হইবার নীতি যোগ দেন। পার্শ্বনাথের ন্যায় মহাবীরও সংযম ও কঠোর তপস্যার উপর বিশেষ জোর দিতেন। তবে পার্শ্বনাথের সময়ে জৈন ভিক্ষুগণ সর্বদা সাদা কাপড় পরিত, কিন্তু মহাবীর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া উলঙ্গ থাকিতেন এবং জৈন ভিক্ষুদের বস্ত্র পরিধান একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। জৈনগণ অহিংসা নীতি পালনে খুব বেশী জোর দিত। পাছে কোনা পোকা পুড়িয়া মরে, এইজন্য তাহারা রাত্রে আগুন জ্বালাইত না, কোন পোকা যাহাতে মুখের মধ্যে না যায়, এজন্য অনেকে মুখে কাপড় বাঁধিয়া রাখিত। জৈনগণ ভিক্ষুজীবনই ধর্মপালনের পক্ষে উপযোগী বলিয়া মনে করিত।

অহিংসা নীতি

জৈন ধর্মগ্রন্থ ঃ মহাবীরের ধর্মমত সম্বলিত সর্বপ্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু জানিবার উপায় নাই। তবে জৈনদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শেষ পর্যন্ত কেবল স্থূলভদ্র নামক জৈন ভিক্ষু মহাবীরের ধর্মবাণী সম্পূর্ণরূপে স্মরণ রাখিয়াছিলেন। স্থূলভদ্র পাটলিপুত্র নগরে এক জৈন সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে ইহার কতক অংশ অবলম্বন করিয়া দ্বাদশটি 'অঙ্গ' রচিত হয়। ইহাই ছিল তৎকালীন জৈন ধর্মের শিক্ষণীয় গ্রন্থ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুজরাটের প্রাচীন বলভী নগরে জৈনদের একটি সাধারণ ধর্মসভায় প্রথম এগারোটি 'অঙ্গ' অবলম্বন করিয়া বর্তমান জৈন ধর্মগ্রন্থ নূতন ভাবে রচিত হয় ; 'দ্বাদশ অঙ্গ'টি তখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ কথ্য বা প্রাকৃত ভাষায় রচিত। পরবর্তীকালে জৈন পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

মহাবীরের ধর্মবাণী

দ্বাদশ 'অঙ্গ'

কালক্রমে জৈনগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। যাহারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিত তাহারা হইল 'শ্বেতাম্বর' এবং অন্যরা হইল 'দিগম্বর' (অর্থাৎ উলঙ্গ)। ধর্মমত ও ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায়ের রীতি বর্তমানে নাই বলিলেই চলে

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর

এখন উভয় সম্প্রদায় মিলিতভাবেই ধর্মনীতি পালন করিতেছে। ভিক্ষুর সংখ্যা এখন খুবই কম, গৃহীর সংখ্যাই অধিক।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মূল সূত্রসমূহ উপনিষদ্‌ হইতে গৃহীত। উভয় ধর্মই সন্ন্যাস, অহিংসা প্রভৃতি ধর্মনীতি এবং কর্মফল, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি ধর্মমত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসমূহ হইতেই গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই উভয় ধর্মই বেদকে অভ্রান্ত অর্থাৎ বিচার-বিতর্কের অতীত বলিয়া স্বীকার করিত না, এবং যাগযজ্ঞের বিরোধী ছিল। উভয় ধর্মই ঈশ্বর সম্বন্ধে একেবারে নির্বাক্‌। উভয়েই জাতিভেদ মানিত না, মানুষকে মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিত। জগৎ যে দুঃখময়, মানুষ যে কর্মফলেই জন্ম জন্মান্তরে দুঃখ ভোগ করে, সর্বজীবের প্রতি হিংসা-দ্বেষ বর্জন করিয়া ইন্দ্রিয়দমন ও বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন পালনই যে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় এ সম্বন্ধে উভয় ধর্মই একমত। উভয় ধর্মেই গৃহীকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুগণের ধর্মকার্যে যে পশুবলির প্রথা আছে, তাহা উভয় ধর্মেই অতি নিন্দনীয়। দুই ধর্মেই ভিক্ষুগণের সংঘ গঠিত হইত এবং সংঘের নির্দিষ্ট কর্তব্যও ছিল।

সাদৃশ্য

উভয় ধর্মের মধ্যে এই সকল সাদৃশ্য থাকিলেও দার্শনিক মতবাদে ও ধর্মপ্রণালীতে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতাও রহিয়াছে। জৈন ধর্ম কঠোর তপস্যার পক্ষপাতী। কিন্তু বুদ্ধদেব ভোগবিলাস ও কঠোর তপস্যা—এই দুইটি পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। অহিংসা উভয় ধর্মের প্রধান মতবাদ হইলেও জৈন ধর্মে ইহা যত কঠোরতার সহিত প্রতিপালিত হয়, বৌদ্ধধর্মে ততদূর কঠোরতা ছিল না। জৈনগণের দিগম্বর সম্প্রদায় বস্ত্র পরিধানের বিরোধী, কিন্তু বৌদ্ধগণ উলঙ্গ থাকা অত্যন্ত হীনকর্ম বলিয়া মনে করিত। বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম হইতে একেবারে দূরে সরিয়া রহিয়াছিল, কিন্তু জৈনগণ ব্রাহ্মণ্য সমাজের সহিত কতকটা মিলিত ছিল; এমন কি, হিন্দুদের ন্যায় তাহারা কোন কোন দেবদেবীর পূজারও সমর্থক। বৌদ্ধদের ন্যায় জৈনগণের ধর্ম-সাহিত্য বিশদ ও বিস্তৃতভাবে রচিত হয় নাই। এককালে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। বর্তমানে কেবল চট্টগ্রামে খুব অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ আছেন। জৈনধর্ম এখনও গুজরাট ও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে প্রচলিত আছে। বৌদ্ধধর্ম এককালে সমগ্র এশিয়ায় এবং এমন কি আফ্রিকা ও ইউরোপে প্রচলিত ছিল, জৈনধর্ম কখনও ভারতের বাহিরে বিস্তৃত হয় নাই।

বৈসাদৃশ্য

———

পঞ্চম অধ্যায়

১। বৈদেশিক আক্রমণ ও তাহার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া :

প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে পর্বত ও সমুদ্র দ্বারা সুরক্ষিত হইলেও উত্তর-পশ্চিমে কয়েকটি গিরিপথের মধ্য দিয়া ভারতে যাতায়াতের পথ আছে এবং ভারতের ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অনেক জাতি ঐ পথে ভারত আক্রমণ করিয়াছে। আর্যগণও এই পথে ভারতে আসেন। তারপর প্রায় দেড়হাজার বছরের মধ্যে আর কোন বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল এরূপ প্রমাণ নাই। ইহার পরে ক্রমে বহু বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ করে।

পারশীকদের ভারত আক্রমণ : খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পারস্য সম্রাট কাইরাস্ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কাম্বোজ ও গান্ধার এই দুইটি শক্তিশালী রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। কাইরাস্ হিন্দুকুশের দক্ষিণস্থ কয়েকটি উপজাতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহার পর খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আনুমানিক ৫১৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারস্যের বিখ্যাত সম্রাট দারায়ুস্ ভারত আক্রমণ করিয়া কাম্বোজ ও গান্ধারসহ পঞ্চনদ প্রদেশের কতকাংশ অধিকার করেন। এইরূপে ভারতের এক সীমান্ত অঞ্চল কিছুকালের জন্য পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন হয়।

কাইরাস্ ও দারায়ুস

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ : ইউরোপের মেসিডোনিয়া প্রদেশের রাজা ফিলিপ সমগ্র গ্রীস দেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরাক্রান্ত পুত্র আলেকজাণ্ডার সমস্ত পৃথিবী জয়ের এক অদ্ভূত কল্পনায় মাতিয়া প্রথম উদ্যমেই পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি হিন্দুকুশ পর্বত পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিলেন। আসিবার পথে পার্বত্য রাজ্যগুলি জয় করিয়া ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রথম ভাগে তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন। বর্তমান রাওলপিণ্ডির নিকটস্থ তক্ষশীলা রাজ্য তখন একটি প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র ও বাণিজ্যস্থান ছিল। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি যুদ্ধ না করিয়াই আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সে সময় ঝিলাম ও চিনাব নদীর মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন পুরু। আলেকজাণ্ডার দূত পাঠাইয়া পুরুকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিলে, তিনি সদর্পে উত্তর

পুরু

দিলেন—তিনি সশস্ত্রে আসিয়া রাজ্যের সীমান্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। পুরু বহু পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী ও হস্তী লইয়া ঝিলামের তীরে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিতে প্রস্তুত রহিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধে আলেকজাণ্ডার জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু বীরবর পুরুর বীরত্ব দেখিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। কথিত আছে যে, শরীরে নয়টি আঘাত সহ পুরুকে যখন বন্দী অবস্থায় আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল, তখন আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দী, তুমি আমার কাছে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর ?" পুরু সগর্বে উত্তর দিলেন,—"রাজার মতো।" পুরুর উত্তরে প্রীত হইয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহার রাজ্য তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।
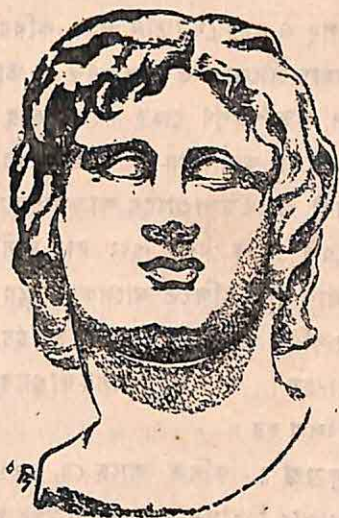
আলেকজাণ্ডার

ইহার পর আলেকজাণ্ডার আবার সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন। পঞ্জাব প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয় করিতে আলেকজাণ্ডারের খুব বেশী বেগ পাইতে হইল না। বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছিয়া তাঁহার সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতে স্বীকার করিল না। অবশেষে আলেকজাণ্ডার বিপাশার তীর হইতেই ফিরিয়া চলিলেন। ঝিলামের তীর পর্যন্ত স্থলপথে গিয়া তিনি বৃহৎ বৃহৎ নৌকার এক বহরে ঝিলাম নদী বাহিয়া সমুদ্রের দিকে চলিলেন। যাত্রার পথে তিনি নানা স্থানে নামিলেন এবং মালব, ক্ষুদ্রক, শিবি ইত্যাদি গণরাজ্য ও রাজাদের শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিয়া অবশেষে সিন্ধুনদের সমুদ্রসঙ্গমে পৌঁছিলেন। বর্তমান করাচীর নিকটস্থ এই স্থান হইতেই তিনি ক্ষুদ্র একদল সৈন্যকে সমুদ্রপথে নৌকায় পাঠাইয়া দিলেন, অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তিনি বেলুচিস্থানের মরুভূমির উপর দিয়া দেশে ফিরিয়া চলিলেন (অক্টোবর, ৩২৫ খ্রীষ্টপূর্ব)। পথে অনেক কষ্ট পাইয়া তিনি অবশেষে পারশ্যের সুসা নগরে পৌঁছিলেন (মে, ৩২৪ খ্রীষ্টপূর্ব)। কিন্তু পর বৎসর ব্যাবিলন নগরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তন

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের ফলাফল ঃ আলেকজাণ্ডার মাত্র দুই বৎসরকাল ভারতবর্ষে ছিলেন, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার হাতে সিন্ধু ও পঞ্চনদের অধিবাসীরা অশেষ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিয়াছিল। ধনে-জনে পরিপূর্ণ কত জনপদ ও নগর যে তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন, ভারতের অধিবাসী, এমন কি কত অসহায় স্ত্রীলোক ও শিশু পর্যন্ত যে তাঁহার নিষ্ঠুর সৈন্যগণের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল, কত শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র যে তাঁহার পশুপ্রকৃতির সৈন্যগণ বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। গ্রীকদের মতে কেবলমাত্র সিন্ধুদেশেই ৮০,০০০ ভারতবাসী আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে প্রাণ হারাইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক বন্দী এবং দাস-দাসীরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। এই দুঃখ ও ধ্বংসলীলার পরিপ্রেক্ষিতে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর ভারত ও গ্রীক সভ্যতার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তাহাই ইহার একমাত্র সুফল বলিয়া গণ্য করা হয়। ভারতে আলেকজাণ্ডারের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়।

চন্দ্রগুপ্ত ঃ কথিত আছে যে, চন্দ্রগুপ্ত নামক এক মৌর্য বংশীয় ক্ষত্রিয় যুবক মগধের রাজার বিরাগভাজন হওয়ায় মগধ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলেকজাণ্ডার তাঁহার ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হওয়ায় তিনি পলাইয়া যান এবং একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একটি রাজ্য স্থাপন করেন (আনুমানিক ৩২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু-সংবাদ ভারতে পৌছিবার পর তিনি গ্রীকদিগকে বিতাড়িত করিয়া পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের রাজ্যগুলি অধিকার করেন (আনুমানিক ৩২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। ক্রমে তিনি মগধের নন্দরাজকে পরাভূত করিয়া সমস্ত আর্যাবর্তের একচ্ছত্র সম্রাট হন। এই সাম্রাজ্য লাভে চাণক্য বা কৌটিল্য নামক এক ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন।

সেলিউকস্

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতি সেলিউকস্ তাঁহার এশিয়া মহাদেশস্থ বিজিত সিরিয়া ও নিকটবর্তী রাজ্যসমূহের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজ্যে শান্তিস্থাপনের পর সেলিউকস্ পুনরায় পঞ্জাব অধিকার করিবার চেষ্টা করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার যুদ্ধের কোন সঠিক বিবরণ জানা যায় না; তবে যুদ্ধের ফলে সেলিউকস্ পঞ্জাবের উপর সমস্ত দাবি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন; এমন কি, বর্তমানে কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট নামে পরিচিত তিনটি নগর যে তিনটি প্রদেশের রাজধানী ছিল, সেই তিনটি প্রদেশ এবং গেড্রোসিয়ার (বেলুচিস্থানের)

কতকাংশ চন্দ্রগুপ্তকে প্রদান করিয়া সন্ধি করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য এইরূপে পারস্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। চন্দ্রগুপ্তের সহিত শান্তি স্থাপনের পর সেলিউকস্ তাঁহার রাজসভায় মেগাস্থিনিসকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেন। সম্ভবতঃ সেলিউকস্ চন্দ্রগুপ্তকে কন্যাদান করিয়া তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইহার প্রায় দেড়শত বৎসর পরে বক্ত্রিয়া (বকৃত্রিয়া) বা বহ্লীক দেশের গ্রীকগণ (Bactrian Greeks), পার্থিয়া বা পহ্লবদেশের পারদগণ (Parthians), সিরদরিয়া নদীর উত্তরাঞ্চলের যাযাবর শকগণ, শকদের পরে আবার সেই অঞ্চল হইতেই ইউচি জাতির কুষাণ শাখা পরপর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া নানা স্থানে আধিপত্য স্থাপন করে।

বহ্লীক গ্রীকগণ ঃ সেলিউকস্ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সিরিয়ায় থাকিয়া হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় রাজত্ব করিতেন। এই বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত হিন্দুকুশের উত্তরস্থ বক্ত্রিয়া বা বহ্লীক এবং বর্তমান ইরাণ বা পারস্যের পূর্ব-দিকস্থ পার্থিয়া বা পহ্লব প্রদেশ দুইটি আনুমানিক ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সেলিউকসের বংশধর তৃতীয় এণ্টিয়োকাস্ এই দুই প্রদেশ পুনরায় অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন এবং দুই রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করেন। তিনি একবার ভারত সীমান্ত আক্রমণ করেন এবং কতকগুলি হাতী উপঢৌকন পাইয়া চলিয়া যান। তাঁহার জামাতা বহ্লীকের রাজা ডেমেট্রিয়াস আনুমানিক ১৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অশোকের পরবর্তী সপ্তম মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের রাজ্য আক্রমণ করিয়া আফগানিস্থান, পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশের বহুলাংশ অধিকার করেন। ডেমেট্রিয়াস যখন ভারতের যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন ইউক্র্যাটাইডিস্ নামে তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী বহ্লীকের সিংহাসন দখল করিয়া বসেন। ডেমেট্রিয়াস্ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন নাই ; কিন্তু ইউক্র্যাটাইডিসের পুত্রই পিতাকে হত্যা করে। এই সকল নিষ্ঠুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কালক্রমে গ্রীকগণ বহ্লীক হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ; এবং অন্যূন কুড়িজন গ্রীক রাজা একশত বৎসরেরও অধিক কাল সেখানে রাজত্ব করেন। এই সকল গ্রীক রাজার অনেকের নামই কেবলমাত্র তাঁহাদের মুদ্রা হইতে জানা যায়, কিন্তু অধিকাংশের কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে মিনাণ্ডারের (বা মিলিন্দের) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার রাজ্য অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। ইনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'মিলিন্দপঞ্‌হো' নামক একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহার অনেক প্রশংসা

স্বাধীনতা লাভ

আছে। এপোলোডোটাস্ নামে অপর একজন গ্রীক রাজা গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন।

বহ্লীকের গ্রীকগণের সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঃ বহ্লীক গ্রীকগণ বহুকাল ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করিয়া স্বাভাবিক ভাবেই সেই অঞ্চলের ভারতীয় অধিবাসীদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া রহিল। একদিকে তাহারা ভারতীয়দের ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হইল, অপরদিকে ভারতীয়গণও তাহাদের নিকট হইতে অনেক নূতন শিক্ষা লাভ করিল। গান্ধার শিল্প ও ভারতে নূতন ভাবে মুদ্রা প্রচলন হইার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পঞ্জাবে ও আফগানিস্থানে বহ্লীক গ্রীকগণের রাজ্য স্থাপন ও বহুকাল বসবাসের ফলে গ্রীস ও রোমের শিল্পকলার পদ্ধতি ঐ সমুদয় দেশে প্রচলিত হয়। ইহার সহিত ভারতীয় পদ্ধতি সংমিশ্রিত হইয়া এক অভিনব শিল্পকলার সৃষ্টি করে। ইহা সাধারণত 'গান্ধার শিল্প' নামে পরিচিত; ইহার নিদর্শন প্রধানত প্রাচীন গান্ধার দেশেই (পূর্ব আফগানিস্থান ও পশ্চিম পঞ্জাবে) পাওয়া যায়। এই শিল্প-পদ্ধতি অনুসারে প্রাচীন গ্রীক দেবদেবীর মূর্তির অনুকরণে যে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল, তাহা সৌন্দর্যে অতুলনীয়। ইহার প্রভাব ভারতের নানা স্থানে, মধ্যএশিয়া ও চীনে প্রসারিত হইয়াছিল। তাহার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ এই সময়েই হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত হয়।

নানাভাবে সংযোগ স্থাপন

বৈদিক যুগে দ্রব্য-বিনিময়ই ছিল ব্যবসায় রীতি। ধীরে ধীরে মূল্যবান্ ধাতুর বিনিময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রথা প্রচলিত হয়। তাহার পর ধাতুদ্বারা নানা আকারের মুদ্রা গঠন করিয়া এবং তাহাতে নানা প্রকারের ছাপ মারিয়া তাহাই ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এই ধরনের হাজার হাজার মুদ্রা ভারতের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। বহ্লীক গ্রীক রাজারা সুন্দর শিল্পকলায় গঠিত গোলাকার মুদ্রার একদিকে নিজেদের ছবি, অপর দিকে কোন দেবমূর্তি বা অন্য কোন চিত্র এবং এক বা উভয় দিকে নিজেদের নাম খোদিত করিতেন। তাহাদের এই মুদ্রানির্মাণ-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ভারতের মুদ্রানির্মাণ-প্রণালীও উন্নত হইয়া উঠে। রঙ্গমঞ্চে ব্যবহৃত 'যবনিকা' (যবন = গ্রীক) এ বিষয়ে গ্রীক নাট্যাভিনয়ের প্রভাব সূচিত করে।

মুদ্রা নির্মাণ

পারদগণ ঃ দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যভাগে এক পারদ (পহ্লব) রাজা সিন্ধু নদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। ইহার পরে মোয়েস নামে শক্তিশালী পারদ রাজা পশ্চিম

পঞ্জাবে আধিপত্য স্থাপন করেন। প্রায় সেই সময়েই পারদ রাজগণের অপরাপর শাখা কান্দাহার জয় করিয়া কাবুল ও সিন্ধুনদের উপত্যকায় কয়েকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর অল্পকাল পরে সেণ্ট টমাস নামক একজন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী ভারতের পারদরাজ গণ্ডোফারনেসের রাজসভায় আসিয়া পরিবারবর্গসহ তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

শকগণ: বহ্লীক গ্রীকদের পরে আসিয়াছিল শকগণ। এই যাযাবর জাতি প্রথমে সিরদরিয়া নদীর উত্তর পারে বাস করিত। শকগণ পরে ইউচি নামক আর একটি যাযাবর জাতির আক্রমণের ফলে বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং হিন্দুকুশ পার হইয়া সিস্তানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তাহারা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া উত্তরে তক্ষশিলা ও মথুরায় এবং দক্ষিণে মালব ও সৌরাষ্ট্রে (কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপে) ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সৌরাষ্ট্রের শক রাজ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী হইয়াছিল এবং এই রাজ্যের রাজারা 'পশ্চিম ক্ষত্রপ' * নামে ইতিহাসে পরিচিত। এই বংশের বহু রাজা সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন সর্বপ্রধান। রুদ্রদামন খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন। তিনি নানা স্থান জয় করিয়া রাজ্যের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পশ্চিম ক্ষত্রপগণ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকের শেষ হইতে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর কাল সৌরাষ্ট্রে রাজত্ব করেন।

কুষাণগণ: সর্বশেষে আসিল কুষাণগণ। ইহারা ইউচি জাতির এক শাখা। ইউচি জাতি প্রথমে চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাস করিত। সেখান হইতে তাহারা হূণ জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হইলে শকগণকে তাড়াইয়া তাহাদের সিরদরিয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের বাসস্থান অধিকার করে। ইহার পর আবার হূণগণ তাহাদিগকে সেখান হইতেও বিদূরিত করে। ইউচিগণ তখন বহ্লীক দেশ অধিকার করিল এবং যাযাবর স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ হইল। এই সময় ইউচি জাতি পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়। ইহাদের মধ্যে কুষাণ শাখাই ক্রমে সর্বাপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। আনুমানিক ৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের নায়ক কুজুল কদ্‌ফিস্ শীঘ্রই সমগ্র ইউচি জাতিকে স্বীয় বশে আনিতে সমর্থ হইলেন এবং গ্রীক ও পারদগণকে পরাজিত করিয়া আফগানিস্থান অধিকার করিলেন। তিনি যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার

ইউচি জাতি

কুষাণ শাখা

*পারস্য দেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্যাট্রাপ (Satrap) উপাধি হইতেই আমাদের দেশে 'ক্ষত্রপ' শব্দের উৎপত্তি হয়। ভারতের শক রাজারা এই পারসীক উপাধিটিই ব্যবহার করিতেন।

উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময় ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র বিম্ কদ্‌ফিস্ গান্ধার হইতে কাশী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকার করেন। তিনি তাঁহার ভারতীয় রাজ্য শাসনের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কুষাণরাজ কনিষ্ক ঃ বিম্ কদ্‌ফিসের পরে কণিষ্ক কুষাণগণের রাজা হইলেন। বিম্ কদ্‌ফিসের সঙ্গে কনিষ্কের কি সম্পর্ক ছিল, তাহা জানা যায় না; কিন্তু কনিষ্কই যে কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়া হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি এক যুদ্ধে

কুষাণ মুদ্রা

চীনরাজকে পরাজিত করিয়া সন্ধির জামিন স্বরূপ চীন রাজকুমারকে নিজের রাজ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষ তাঁহার সভায় ছিলেন।

বৌদ্ধগণ ইতিমধ্যে হীনযান ও মহাযান নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল।

হীনযান

যাহারা বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ধর্ম অনুসরণ করিয়া চলিত, তাহাদের বলা হইত হীনযান। হীনযানরা নির্বাণ বা মুক্তির উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেবের উপাসনা এবং তাঁহার ধর্মোপদেশ পালন করিত। মহাযান নামে অপর

মহাযান

সম্প্রদায় বুদ্ধদেবকে যেমন ভক্তি করিত, তেমনি প্রকৃত বুদ্ধ না হইলেও যাঁহারা প্রায় বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই বোধিসত্ত্বদেরও উপাসনা করিত। এই সম্প্রদায় কেবল নিজেদের মুক্তির দিকে দৃষ্টি না দিয়া জনগণের মুক্তির চেষ্টা করিত এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের মূর্তি পূজাই নির্বাণ লাভের উপায় বলিয়া প্রচার করিত। কনিষ্কের সমসাময়িক বিখ্যাত বৌদ্ধ মনীষী নাগার্জুন ও অশ্বঘোষ উভয়েই এই ধর্মমতকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। কনিষ্ক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের এক মহাসভা আহ্বান করিয়া বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বিরোধ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে মহাযান ধর্মমত অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করায় বৌদ্ধ সমাজের মধ্যে ভীষণ বিরোধের সূচনা হয়। মহাযান মতবাদীরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ন্যায় বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের পূজা ও ভক্তিবাদ গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ইহার ফলে পরবর্তী কালে বুদ্ধদেব হিন্দু সমাজে বিষ্ণুর অবতার রূপে গৃহীত হন এবং মহাযান মতবাদীরা ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম পালন করিয়া হিন্দু সমাজের সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই ভাবে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে লুপ্ত হয়।

চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি

পেশোয়ারে বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর কনিষ্ক এক প্রকাণ্ড স্তূপ নির্মাণ করেন। ইহার অপূর্ব গঠন ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে পেশোয়ারে লোক আসিত। এই স্তূপের অভ্যন্তরে রক্ষিত বুদ্ধের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মথুরায় তুর্কী পোষাক পরিহিত কনিষ্কের একটি প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে কনিষ্কের আকৃতি সবিশেষ শক্তিশালী দেখা যায়। কনিষ্কের রাজত্বকাল ঠিকরূপে এখনও নির্ধারিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ইহা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটি অব্দ প্রচলন করিয়াছিলেন। তাহাই বর্তমানে প্রচলিত শকাব্দ নামে পরিচিত। অনেকে ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কনিষ্ক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শকাব্দ

কনিষ্কের ভগ্নমূর্তি

কনিষ্কের তেইশ বৎসরকাল রাজত্বের পরে বাশিষ্ক ও হুবিষ্ক এবং শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা বাসুদেব রাজ্যলাভ করেন। ইহারা সকলে বহুদিন তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য গৌরবের সহিত শাসন-পালন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পরবর্তী কুষাণ রাজারা তেমন শক্তিশালী ছিলেন না, তাই অবিলম্বে কুষাণ সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন এবং সমগ্র উত্তর ভারত জুড়িয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের

উদ্ভব হইল। কুষাণদের রাজ্য শুধু পঞ্চনদ প্রদেশের পশ্চিমে ও আফগানিস্থানের পূর্বভাগে সীমাবদ্ধ রহিল।

বিদেশে বাণিজ্যের প্রসার: আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর হইতে জলপথে ও স্থলপথে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য পৃথিবীর নানাস্থানে প্রসারিত হইয়াছিল। মৌর্য যুগে সিরিয়া, মিশর এবং গ্রীক-অধিকৃত অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ দৃঢ় হয়। মৌর্য যুগ হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বর্তমান ভুজ, কচ্ছ, ওখা, জামনগর, পোরবন্দর, কম্বে, ব্রোচ প্রভৃতি প্রাচীনতম বহু বন্দর সমুদ্রপথে নানা দেশের সহিত বাণিজ্য করিবার কেন্দ্র হইয়াছিল। বাণিজ্য-বন্দরে বিদেশীয় বণিকরাও উপস্থিত হইত। প্রাচীনকাল হইতেই দক্ষিণ-ভারতের নানা বন্দর হইতে পূর্বাঞ্চলের নানা দ্বীপ ও উপদ্বীপে এবং দক্ষিণে সিংহলে সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলিত।

বাণিজ্য-বন্দর

মৌর্যোত্তর যুগে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ কুষাণ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই সমুদয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে ভারতীয় বণিকগণ স্থলপথে মধ্য এশিয়া ও পারস্যের ভিতর দিয়া রোম সাম্রাজ্যে যাতায়াত করিত এবং বাণিজ্যে তাহাদের প্রচুর অর্থ লাভ হইত। ক্রমে রোম সাম্রাজ্যের সহিত সমুদ্রপথেও ভারতের বাণিজ্য আরম্ভ হইল এবং ধীরে ধীরে ইহা এত বৃদ্ধি পাইল যে, ভারতীয় বিলাসের উপকরণাদি কিনিবার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা রোম হইতে এদেশে আসিত। ইহাতে বিচলিত হইয়া রোমের মনীষী প্লিনি (Pliny—২৩ হইতে ৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রতি বৎসর ভারতীয় বণিকদের নিকট হইতে প্রচুর বিলাস ব্যসনের দ্রব্যাদি ও মসলাপাতি ক্রয় করিবার জন্য রোমের অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। ইহা তাঁহার দেশের পক্ষে নিতান্ত অশুভকর। এই সময়ের বহুসংখ্যক রোমদেশীয় সুবর্ণমুদ্রা ভারতের নানা স্থানে, বিশেষভাবে দক্ষিণ অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।

রোমীয় স্বর্ণমুদ্রা

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশরবাসী একজন গ্রীক নাবিক জাহাজে আরব সাগর পার হইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি সেই সময়কার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে এক বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, ভারতের পশ্চিম উপকূলে অনেকগুলি বন্দর ছিল। বিদেশীয় বণিকরা এই সমুদয় বন্দরে যাতায়াত করিত। ভারতীয় বণিকগণও বহু দ্রব্য-সামগ্রী জাহাজ বোঝাই করিয়া নানা দেশে যাইত। নানা মসলাপাতি, সুগন্ধি জিনিস, হীরা-

বাণিজ্য-বিবরণ

জহরত ও মণিমুক্তা, সূক্ষ্ম সুতার কাপড়, উৎকৃষ্ট রেশম-বস্ত্র, হস্তিদন্ত-নির্মিত নানা দ্রব্য, পশুচর্ম, নীল প্রভৃতি ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইত। কাঁচের বাসন, সোনা, রূপা, তামা, টিন, সীসা, প্রভৃতি ধাতু ও মূল্যবান প্রস্তর এদেশে আমদানি হইত। তামিল গ্রন্থেও 'যবন' জাতির সহিত ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। চীনদেশের সহিত স্থলপথে ও জলপথে ভারতের অবিরাম বাণিজ্য চলিত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 'চীনাংশুক' ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'চীনপট্ট' (চীনদেশীয় রেশমী কাপড়) এবং চৈনিক ভাষা হইতে গৃহীত 'সিন্দুর' প্রভৃতি শব্দ চীনদেশের সহিত বাণিজ্যের কথা এখনও স্মরণ করাইয়া দেয়।

কুষাণ যুগের সংস্কৃতি ঃ গ্রীকগণের প্রভাব ও কনিষ্ক প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পূর্বোক্ত বৈদেশিকদের সহিত গভীর যোগাযোগের ফলে সাহিত্যে, শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এদেশ যথেষ্ট উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। পশ্চিমভারতের জুনাগড়ে শকরাজ রুদ্রদামনের একখানি শিলালিপি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। বৈদেশিক রাজারাও যে এদেশের ভাষা ও সাহিত্যকে যথেষ্ট আদর করিতেন, ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। কণিষ্ক ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পের যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, চরক প্রভৃতি বহু মনীষী তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বর্তমান যুগের একজন ফরাসি পণ্ডিত অশ্বঘোষকে কবি, গায়ক, নাট্যকার, দার্শনিক, প্রচারক ইত্যাদি বহু বিষয়ে অসাধারণ বিদ্বান বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মহাকাব্য রূপে রচিত তাঁহার 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ কাব্য', গদ্যে ও পদ্যে রচিত 'সূত্রালঙ্কার', জাতিভেদ প্রথার নিন্দাপূর্ণ 'বজ্রসূচী', মহাযান মতবাদের দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ 'মহাযান শ্রদ্ধোৎপদ' প্রভৃতি নানা গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। 'শারীপুত্র প্রকরণ' নামে তাঁহার একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। মহাযান ধর্মমত প্রচারক নাগার্জুন মহাযান মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞা-পারমিতা' এবং 'মাধ্যমিকাসূত্র' রচনা করেন। নাগার্জুনের সমকালীন ও পরবর্তী আর্যদেব, অসংগ বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বহু পণ্ডিত ব্যক্তি নানা বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি সিন্ধুনদের তীরস্থ আটকের নিকটবর্তী শালাতুর গ্রামে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। তাঁহার বিখ্যাত পাণিনি ব্যাকরণ এই যুগে বহু আদৃত হইত।

সাহিত্য

বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ 'চরক-সংহিতা' রচয়িতা চরক কনিষ্কের

রাজসভায় ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই যুগের অপর একজন বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলন সুশ্রুত। চরক কায়-চিকিৎসা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। সুশ্রুত অস্ত্র-চিকিৎসার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। পরবর্তী যুগে বাগ্‌ভট নামে একজন চিকিৎসক 'অষ্টাঙ্গসংহিতা' নামে একখানি বিখ্যাত চিকিৎসা-গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

কুষাণ যুগে মধ্য এশিয়া ও চীনদেশের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তখন বৌদ্ধ ধর্ম মধ্য এশিয়ায় বিস্তৃত হয়। ধীরে ধীরে সেখানকার নানা স্থানে ভারতবাসীরা উপনিবেশ স্থাপন ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। পা মর সম-মালভূমির পূর্ব অঞ্চল খনন করিয়া বহু প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল স্থানে অনেক বুদ্ধমূর্তি এবং ভারতীয় ভাষায় লিখিত নানা বৌদ্ধ গ্রন্থ ও সরকারী চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে। চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ক্রমে সেখান হইতে মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে তাহা বিস্তৃত হয়। ধর্ম-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে কুষাণ যুগের অপরূপ শিল্পকলাও সর্ব অঞ্চলেই বিস্তৃত হইয়াছিল। মধ্য এশিয়ায় যে সকল বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা সেই যুগে ভারতীয় ভাস্কর্য-শিল্পের নিদর্শন। ভারতের আদর্শে মধ্য এশিয়ায় বহু বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হইয়াছিল। চীনদেশের গুহাগৃহ এবং তাহার ভিতরের বুদ্ধমূর্তি ও শিল্পাঙ্কনের পদ্ধতি দেখিয়া অনেকেই অনুমান করেন যে, ভারতীয় শিল্পীরাই ঐ দেশে শিল্পকর্ম নির্বাহ করিত, অথবা তাহাদের প্রভাবেই উহা গড়িয়া উঠিয়াছিল। মথুরা ও গান্ধার শিল্পের যে সকল নিদর্শন সেখানে বর্তমান আছে, তাহাই ইহা প্রমাণ করে। ইহা ছাড়া সিংহল (শ্রীলঙ্কা), শ্যামদেশ (বর্তমানে থাইল্যাণ্ড), সুমাত্রা, যবদ্বীপ (জাভা), আনাম, মালয় উপদ্বীপ এবং আরও অনেক স্থলে প্রাচীন যুগের নির্মিত বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

ভারতীয় শিল্পকলার বিস্তার

রাজপুতগণের অভ্যুত্থানঃ কুষাণগণের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে হূণগণ ভারত আক্রমণ করে। এই সমুদয় বিদেশী আক্রমণকারীরা ভারতেই বসবাস করে এবং বিরাট হিন্দু সমাজের সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে তাহাদের পৃথক অস্তিত্বের কোন চিহ্নই থাকে না। অনেকে মনে করেন যে মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসে যে রাজপুত জাতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই এই জাতিদের বংশধর। অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম ভারতে পূর্বোক্ত যে সকল বিদেশী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই পরবর্তী কালে 'রাজপুত'

এই সাধারণ নামে অভিহিত হইত। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও শক্তিশালী ছিল গুর্জর-প্রতিহার বংশ। ইহারাই পরবর্তীকালে 'পরিহার রাজপুত' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ইহারা ও অন্যান্য রাজপুতগণ প্রাচীন আর্য ক্ষত্রিয়দের বংশধর বলিয়া দাবি করিত। এই রাজপুত জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ সাহস, হিন্দু ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা, অদ্ভুত আত্ম-বিসর্জনের ক্ষমতা। তাহারা ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা

১। মগধের অভ্যুত্থান ও মৌর্য সাম্রাজ্য

ষোড়শ মহাজনপদ : খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর কোন কোন গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের সমকালীন ষোলটি মহাজনপদের (অর্থাৎ বড় রাজ্যের) উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহাজন পদগুলির অধিকাংশ রাজার অধীনে ছিল, আবার কোন কোনটিতে সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল। গণরাষ্ট্রে প্রজারা সকলে মিলিয়া, অথবা তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রতিপত্তিশালী, তাহারা একত্রিত হইয়া, রাজ্য রক্ষা ও রাজ্যশাসনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করিত। এই প্রতিনিধিরা সন্থাগারে (বর্তমান পার্লামেন্টের মতো ভবনে) মিলিত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিত।

গণরাষ্ট্র

এই যুগের রাজার অধীনে রাজ্যগুলির মধ্যে বৎস, অবন্তী, কোশল ও মগধ এই চারিটি রাজ্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। বৎস রাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বী এলাহাবাদের দক্ষিণ পশ্চিমে বর্তমান কোশাম নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। অবন্তী রাজার রাজধানী ছিল বর্তমান মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত উজ্জয়িনীতে। কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল অযোধ্যায়। এই রাজ্যে প্রাচীন ইক্ষাকু বংশের রাজারা রাজত্ব করিতেন। পরে এই দেশের রাজধানী বর্তমান উত্তর প্রদেশে গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত শ্রাবস্তী নগরীতে স্থাপিত হইয়াছিল। এই বংশের রাজা প্রসেনজিৎ কাশী রাজ্যের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র কপিলবস্তুর শাক্য গণরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। মগধ রাজ্য দক্ষিণ বিহারে অবস্থিত ছিল।

কোশল ও মগধে যুদ্ধ এবং মগধের উত্থান ঃ গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধে হর্যঙ্ক বংশের রাজা বিম্বিসার রাজত্ব করিতেন। প্রথমে তাঁহার রাজধানী ছিল পাহাড়-বেষ্টিত গিরিব্রজে। পরে তিনি গিরিব্রজের উত্তরে পাহাড়ের পাদদেশে রাজগৃহে (বর্তমান পাটনা জেলার রাজগীরে) রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি অঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। বিম্বিসার বুদ্ধদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি কোশলের রাজা প্রসেনজিতের ভগিনী কোশলদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অন্য এক রাণীর গর্ভে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিম্বিসার যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন অজাতশত্রুর হাতেই তিনি রাজ্যশাসনের ভার ছাড়িয়া দিলেন। অজাতশত্রু কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাইয়াই পিতৃহত্যা করেন। কোশলদেবী স্বামীর শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রসেনজিৎ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ক্রুদ্ধ হইয়া ভগ্নীর বিবাহে কাশীরাজ্যের অন্তর্গত যে একখানি গ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় অধিকার করিলেন। ইহার ফলে মগধ ও কোশল রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। অনেক দিন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। বহু যুদ্ধের পর অবশেষে দুই রাজ্যের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। প্রসেনজিৎ নিজ কন্যার সহিত অজাতশত্রুর বিবাহ দিয়া সন্ধি করিলেন এবং যৌতুক-স্বরূপ পূর্বোক্ত কাশীরাজের অন্তর্গত গ্রামখানি ফিরাইয়া দিলেন। এই সময় হইতেই মগধের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল এবং কোশল রাজ্যের ক্ষমতা কমিয়া গেল। অজাতশত্রু পিতৃহত্যার অনুতাপে বুদ্ধের একজন বিশেষ ভক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বৈশালীর লিচ্ছ-বিদের পরাজিত করিয়া তাহাদের গণরাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। বহিরাক্রমণ ব্যাহত করিবার জন্য গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমস্থলে পাটলিগ্রামে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে যখন তাঁহার মৃত্যু হইল, তখন মগধের মতো শক্তিশালী রাজ্য আর ছিল না।

বিম্বিসার

অজাতশত্রু

প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি

শৈশুনাগ ও নন্দবংশ ঃ অজাতশত্রুর পরবর্তী দ্বিতীয় রাজা উদয়ী রাজগৃহ হইতে গঙ্গাতীরে পাটলীগ্রামে (বর্তমান পাটনায়) রাজধানী স্থাপন করেন। ইহাই ক্রমে প্রসিদ্ধ পাটলিপুত্র নগরীতে পরিণত হয়। উদয়ীর পরে যে কয়জন রাজা রাজত্ব করেন, তাঁহারা সকলেই এই বংশীয় কিনা বলা কঠিন। ইহাদের মধ্যে শিশুনাগ ও তাঁহার নামানুসারে পরিচিত শৈশুনাগ বংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিশুনাগ অবন্তীরাজ্য জয় করিয়া মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার পুত্র রাজা কালাশোক স্থায়ীভাবে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মহাপদ্ম নামে এক

ক্ষৌরকার শ্রেণীর শূদ্র কালাশোককে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মহাপদ্ম নন্দ একজন অসাধারণ বীর ছিলেন। আর্যাবর্তে তখন যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, মহাপদ্ম উহার অধিকাংশ জয় করেন। তিনি বহু ক্ষত্রিয় রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে তাঁহাকে সর্বক্ষত্রান্তক অর্থাৎ সকল ক্ষত্রিয়ের বিনাশকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি পঞ্জাবের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত ভূভাগের একচ্ছত্র সম্রাট হন। ঐতিহাসিক যুগে ইহাই আর্যাবর্তের প্রথম সাম্রাজ্য। মহাপদ্ম নন্দের পরে তাঁহার আটজন পুত্র রাজত্ব করেন। তাঁহাদের শাসন-কালের শেষভাগে বিখ্যাত গ্রীক রাজা আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

মহাপদ্ম নন্দ

চন্দ্রগুপ্ত ঃ মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত কিরূপে গ্রীকগণকে পরাজিত ও নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (৩২ পৃঃ)।

তাঁহার প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য অতিশয় বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ ছিলেন এবং অর্থশাস্ত্র নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত আনুমানিক ৩২৪ হইতে ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম মৌর্যবংশ। চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরার নাম হইতেই এই বংশের নাম মৌর্যবংশ হইয়াছে, ইহাই সাধারণত কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্ত পিপ্পলীবনের মৌর্য-গোষ্ঠীর সন্তান বলিয়াই তাঁহার বংশের নাম মৌর্যবংশ হইয়াছিল।

মৌর্যবংশ

বিন্দুসার ঃ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার অমিত্রঘাত (শত্রুহন্তা) নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি যুবরাজ অশোককে বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, এবং বিদ্রোহ দমিত হইয়া শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বিন্দুসার দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া মহীশূরের উত্তরাংশ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার সময়ে বর্তমান উড়িষ্যার অন্তর্গত কলিঙ্গ রাজ্য স্বাধীন ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সহিত গ্রীক রাজার মিত্রতার কথা পূর্ব অধ্যায়ে (৩৩ পৃঃ) বলা হইয়াছে। গ্রীক রাজারা বিন্দুসারের সহিতও মিত্রতা রক্ষা করিতেন। তাঁহার রাজসভায় মেগাস্থিনিসের পরবর্তী গ্রীক রাষ্ট্রদূত ডেইমাকস এবং মিশরের গ্রীক রাজা টলেমি ফিলাডেল্‌ফাসের একজন গ্রীক রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বিন্দুসার আনুমানিক ৩০০হইতে ২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অশোক ঃ বিন্দুসারের পরে ২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁহার পুত্র অশোকবর্ধন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্ভবত

চারি বৎসর পরে সম্পন্ন হইয়াছিল। কথিত আছে, প্রথম জীবনে তিনি নৃশংস অত্যাচারী ছিলেন ; এজন্য তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল চণ্ডাশোক। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। সিংহাসনে বসিবার কয়েক বৎসর পরেই অশোক
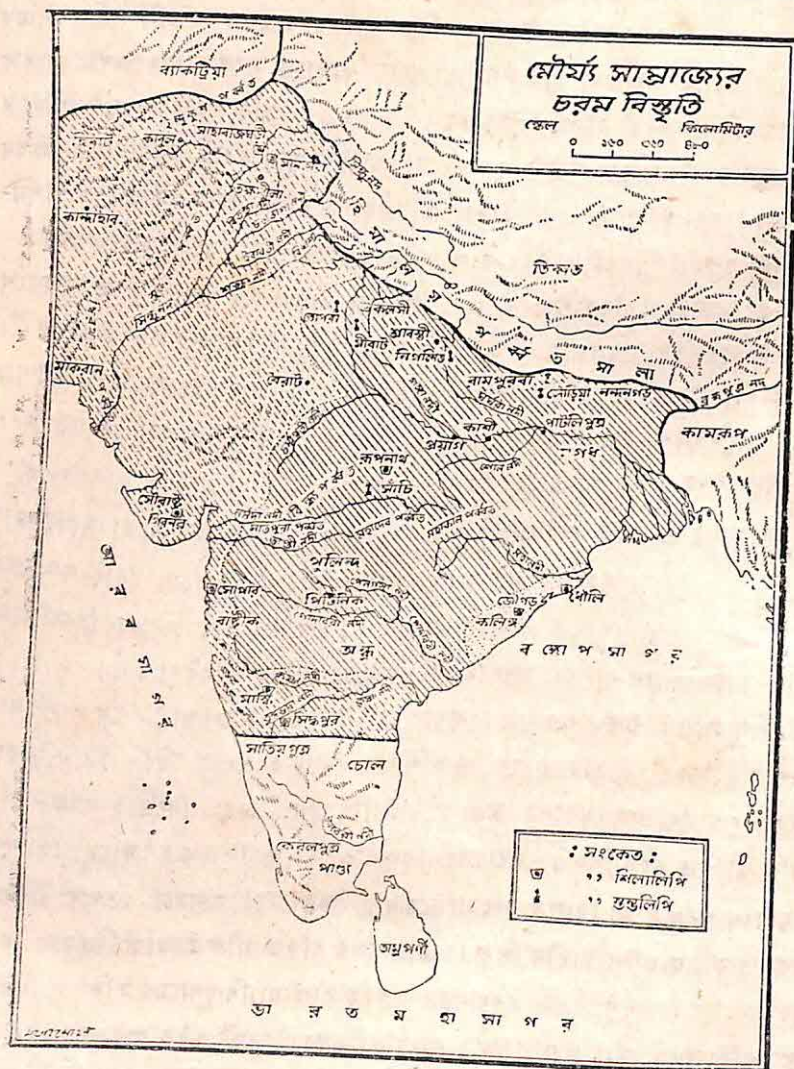
কলিঙ্গদেশ জয় করিতে অগ্রসর হন। কলিঙ্গদেশ তখন সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে ভারতের পূর্ব উপকূল দিয়া গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গের বীরগণ প্রাণপণে অশোককে বাধা দিল এবং এক লক্ষ লোক হত ও দেড় লক্ষ লোক বন্দী হইল। কিন্তু তথাপি অশোক জয়লাভ করিলেন। এই বিজয়ে

প্রায় সমগ্র ভারতে অশোকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। সুদূর দক্ষিণ ভারতের চের, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্থান, বেলুচিস্তান ও মাকরান তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অশোকের ধর্ম ঃ কলিঙ্গের মহাযুদ্ধে বিষম হত্যাকাণ্ড এবং আহত ও শোকার্তগণের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া অশোক অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না। তিনি উপগুপ্ত নামক এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের প্রচারিত 'অহিংসা পরম ধর্ম' এই মহাসত্যকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে বরণ করিয়া লইলেন। দীক্ষার পরেই তিনি বৌদ্ধ তীর্থস্থানসমূহ দর্শন এবং বুদ্ধের ধর্মবাণী প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন।

বুদ্ধের বাণী পৃথিবীময় প্রচার করাই অশোকের প্রধান কার্য হইয়াছিল। এজন্য তিনি একদল ধর্মপ্রচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহারা ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে, এমন কি পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা ও পূর্ব-ইউরোপ অবধি গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে গিয়া এই ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধের সরল ও উদার ধর্মমত ভারতবর্ষের সকলের নিকট সুপরিচিত করিবার জন্য অশোক উহা অতিশয় সহজ ভাষায় সারা দেশময় পর্বতগাত্রে বা প্রস্তর স্তম্ভে খুদিয়া দিলেন। এই সমুদয় উপায় অবলম্বন করার ফলে দেশের সর্বত্র এবং ভারতের বাহিরে বহু স্থানে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

ধর্মপ্রচার

সারনাথের স্তম্ভের শীর্ষদেশ

অশোকের কৃতিত্ব ঃ অশোক নিজের জীবনে বৌদ্ধধর্মের নীতি সম্যকরূপে পালন করায় জনগণও ঐরূপ ধর্মপালনে বিশেষভাবে উৎসাহিত হইল। তিনি স্বদেশে ও বিদেশে মানুষ ও গৃহপালিত পশুর জন্য বহু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন, এবং ঔষধার্থে
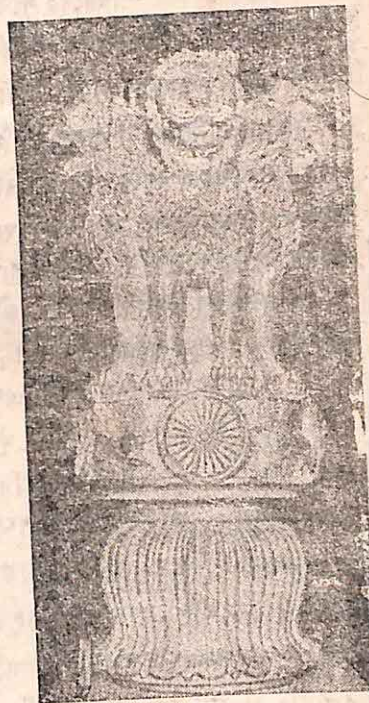
ব্যবহৃত নানা প্রকার লতাগুল্মাদি সর্বত্র রোপণ করিলেন। রাজার ভোজনালয়ে পূর্বে বহু পশুপক্ষী প্রত্যহ হত্যা করা হইত; অশোক নিরামিষ আহার গ্রহণ করিয়া এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড রহিত করিয়া দিলেন। তিনি রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিলেন, অনর্থক কেহ প্রাণিহত্যা করিতে পারিবে না। ভিক্ষাজীবীরা যাহাতে প্রচুর ভিক্ষা লাভ করিয়া অনায়াসে জীবনযাপন করিতে পারে, অশোক তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রাজপথের দুইধারে ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপণ, স্থানে স্থানে কূপ খনন ও বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি পথিকের দুঃখকষ্ট মোচন করিলেন।

হিতকর কার্য

মৌর্য শাসন পদ্ধতি ঃ মৌর্য শাসন-প্রণালী প্রধানত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক —এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। রাজা নিজে কেন্দ্রীয় সর্ববিভাগের শাসন পরিচালনা করিতেন। বিভিন্ন জেলা লইয়া গঠিত এক একটি প্রদেশের শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন রাজপ্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত রাজপুত্র বা রাজপরিবারের ব্যক্তি।

পরিষদ্ বা মন্ত্রিপরিষদ্ রাজাকে শাসনকার্য পরিচালনায় সাহায্য করিত। এই পরিষদের সর্বোচ্চ পদে থাকিতেন মহামন্ত্রী। মহামন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদের মতামত রাজাকে জানাইতেন। রাজাও অনেক সময় মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিতেন।

মহামন্ত্রী ও মন্ত্রী

মেগাস্থিনিসের বিবরণ ঃ গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস্ (৩৩ পৃঃ) বহুদিন পর্যন্ত পাটলিপুত্র নগরে বাস করিয়া, ভারতবাসীদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, এবং তৎসম্বন্ধে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মৌর্য যুগের অনেক তথ্য মেগাস্থিনিসের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়।

মেগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন যে, জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা ভারতবাসীর প্রচুর পরিমাণে ছিল; সুতরাং এদেশে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত না। খনিজ সম্পদ এবং রত্নাদিও ভারতের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ভারতবাসীরা মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিতে ভালবাসিত। কিন্তু অন্য সব বিষয়েই তাহাদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল ও সাধারণ ছিল। ভারতবাসীরা সৎস্বভাব ও সত্যবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দেশে চুরি-ডাকাতি বা মামলা-মোকর্দমা একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। খালি বাড়ীঘরে ধনসম্পদ রক্ষার জন্য কেহ কোন পাহারা রাখা প্রয়োজন মনে করিত না। তাহাদের নীতিধর্ম পালনের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল। তাহারা যজ্ঞ-কাল ভিন্ন অন্য সময়ে পূর্ণমাত্রায় মদ্যপান করা অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া মনে করিত। সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিরাজমান ছিল, এবং দাসত্ব প্রথা মোটেই ছিল না। স্ত্রীলোকেরা উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিত। জনসাধারণও তাহাদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিত।

ভারতবাসীর প্রশংসা

মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ও রাজ্যশাসন-প্রণালীর বিবরণ পাওয়া যায়। রাজধানী পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা) একটি সুদৃঢ় প্রাচীর এবং প্রাচীরের পরে এক প্রশস্ত ও গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল। সম্ভবতঃ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছের কাষ্ঠে নির্মিত এই বিরাট প্রাচীরে ৬৪টি তোরণ এবং ৫৭০টি স্তম্ভ ছিল। পরিখাটি ছয়শত ফুট প্রশস্ত এবং ত্রিশ হাত গভীর ছিল। সৌন্দর্যে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম রাজপ্রাসাদের চরিদিকে বহু স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভ, সোনার দ্রাক্ষা-লতা এবং তাহাতে রূপার তৈয়ারী পাখীগুলি গ্রীকদের মুগ্ধ করিত। এই যুগের একটি বৃহৎ কক্ষের ধ্বংসাবশেষ পাটনার নিকটে কুমারহার গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ

পৌরসভা

রাজধানীর শাসনভার বর্তমান কালের মিউনিসিপ্যালিটির ন্যায় ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পৌরসভার হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রতি পাঁচজনে মিলিয়া এক একটি ক্ষুদ্র সমিতি গঠন করিত, এবং এই প্রকারে যে ছয়টি সমিতি গঠিত হইত, তাহার প্রত্যেকে এক একটি পৃথক বিভাগের পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিত। একটি সমিতির কার্য ছিল নগরে বিদেশীয় আগন্তুকগণের পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। অন্য একটি সমিতি নগরের জন্ম, মৃত্যু, লোকসংখ্যা প্রভৃতির সংবাদ লইত। অপর সমিতিগুলি কৃষিকার্য, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির তত্ত্বাবধান, দেশের বাজার শুল্ক ও বৈদেশিক বাণিজ্যের শুল্কাদি আদায় করিত।

চন্দ্রগুপ্তের সামরিক বিভাগও এইরূপ ত্রিশজন সদস্য ও ছয়টি সমিতির অধীনে উৎকৃষ্ট শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইত। ইহার মধ্যে পাঁচটি সমিতি যথাক্রমে রণতরী, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ও হস্তী—এই পাঁচটি সামরিক বিভাগের তত্ত্বাবধান করিত। অপর সমিতির উপর রসদ ও যানবাহন প্রভৃতি সরবরাহের ভার ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদলে ছয় লক্ষ পদাতিক, নয় হাজার হস্তী এবং ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী ছিল। রথের সংখ্যা জানা যায় না—তবে মোট সৈন্য সংখ্যা সাত লক্ষের কম ছিল না। এই সমুদয় সৈন্যের বেতন রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত। উৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ মাত্র রাজস্ব রূপে গৃহীত হইত।

সামরিক বিভাগ

২। গুপ্ত সাম্রাজ্য

গুপ্তবংশের আরম্ভ : কুষাণ রাজবংশের পতনের পর এক শতাব্দীর অধিক কাল ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর

প্রথম ভাগে মগধে এক নূতন রাজবংশের উদ্ভব হইল। এই বংশের প্রথম রাজা শ্রীগুপ্ত বা গুপ্ত এবং তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ মগধের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে আধিপত্য করিতেন। বঙ্গদেশের একাংশও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল।

গুপ্ত সম্বৎ

ঘটোৎকচের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি লিচ্ছবি রাজকুমারী কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া নিজ বংশের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়াইয়া তুলিলেন। পশ্চিমে প্রয়াগ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেন। পাটলিপুত্র নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়। তিনি তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণের বৎসরটি স্মরণীয় করিবার জন্য ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে যে সম্বতের প্রচলন করেন, তাহা গুপ্ত-সম্বৎ নামে পরিচিত। আনুমানিক ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সমুদ্রগুপ্ত : চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি প্রাচীন ভারতের একজন বিশিষ্ট বীর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গুপ্ত রাজ্যকে একটি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। প্রথমে তিনি উত্তর ভারতের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিয়া সেগুলিকে গুপ্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। আর্যাবর্ত-বিজয় সমাপ্ত হইলে ভারতের পূর্ব উপকূল ধরিয়া তিনি তাঁহার বিজয়বাহিনী সহ দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হন, এবং পথে বহু রাজাকে পরাভূত করিয়া বর্তমান মাদ্রাজের নিকট উপনীত হন। এই সকল রাজা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলে সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাদিগকে তাঁহাদের রাজ্যে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের যে অংশ সমুদ্রগুপ্তের স্বীয় শাসনাধীন ছিল, তাহার উত্তর সীমা হিমালয়ের পাদদেশ, পূর্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণ সীমা নর্মদা এবং পশ্চিম সীমা যমুনা ও চম্বল নদী। এই সীমার বাহিরে বহু রাজ্য ও সাধারণতন্ত্র শাসিত প্রদেশ গুপ্ত সম্রাটকে কর প্রদান করিত। এই সমুদয়ের মধ্যে বাংলার পূর্বাংশ সমতট বা নিম্ন-বঙ্গ, কামরূপ বা আসাম ও নেপাল প্রভৃতি রাজ্যের, মধ্যপ্রদেশের নানা রাজ্যের এবং পঞ্জাব ও রাজপুতানাস্থিত মালব, যৌধেয়, অর্জুনায়ন, আভীর প্রভৃতি গণতন্ত্র-শাসিত জাতির উল্লেখ করা যায়।

এইরূপে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের বহু রাজ্য জয় করিয়া সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এতকাল অহিংসামূলক বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কতকটা নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান তাহার পুনরভ্যুত্থানের সূচনা করিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য : সমুদ্রগুপ্তের পর রামগুপ্ত নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। তারপর

রামগুপ্তের ভ্রাতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন (আনুমানিক ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি শকক্ষত্রপগণকে পরাভূত করিয়া মালব ও সৌরাষ্ট্র অধিকার করেন এবং 'শকারি' নামে বিখ্যাত হন। এইরূপে ভারতে বৈদেশিক প্রভুত্ব বিলুপ্ত করাই তাঁহার রাজত্বকালের বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই জয়ের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য উপাধির অর্থ সূর্যের মতো তেজশালী। এই উপাধিটি একাধিক ভারতীয় রাজা গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং সম্ভবত সমুদ্রগুপ্তেরও এই উপাধি ছিল। এদেশে একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শকগণকে পরাভূত করেন এবং ৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিক্রমসম্বতের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সভায় বিখ্যাত 'নবরত্ন' ছিলেন, এবং এই নবরত্নের এক রত্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস।

উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য

বর্তমানে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়া থাকেন যে, জন-প্রবাদের এই বিক্রমাদিত্য এবং মালব ও সৌরাষ্ট্রের শকরাজ-বিজেতা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি। সম্ভবতঃ কালিদাস এই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভাতেই বর্তমান ছিলেন। কিন্তু কিংবদন্তীতে ধন্বন্তরী, ক্ষপণক,

নবরত্ন

গুপ্তযুগের মুদ্রা

অমর সিং, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি—এই নবরত্নের যে নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই যে এই সময়ে বর্তমান ছিলেন, ইহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীন দেশ হইতে ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

কুমারগুপ্ত: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি লইয়া আনুমানিক ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি চল্লিশ বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পুষ্যমিত্র নামে এক শক্তি-শালী জাতি তাঁহার রাজ্যে উপদ্রবের সৃষ্টি করে। কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত তাহাদিগকে

সম্পূর্ণরূপে দমন করেন। পিতামহের মতো কুমারগুপ্তও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ ভাগে দলে দলে বর্বর হূণগণ মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। এই বর্বর দলের
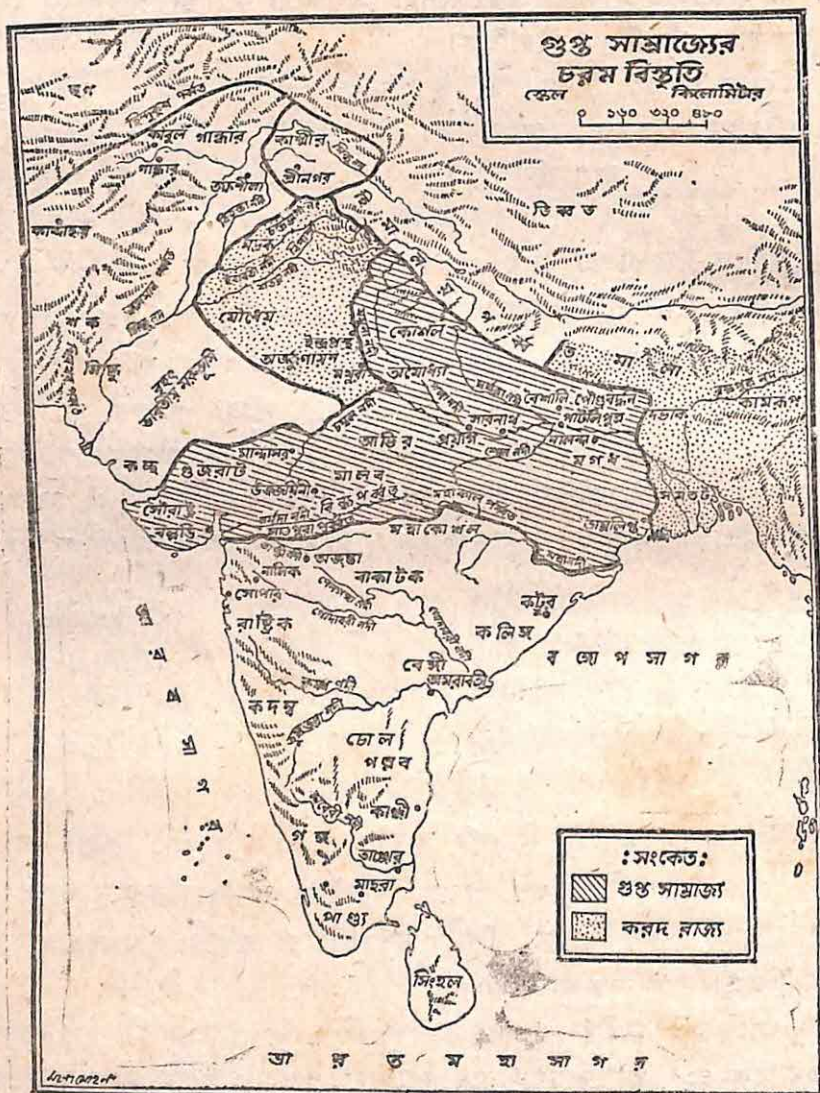
ভয়াবহ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিপন্ন হইয়া পড়িল, কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করিলেন। যুদ্ধকালে এক রাত্রি তাঁহাকে

মাটিতে শুইয়া কাটাইতে হইয়াছিল,—এমনি ভয়াবহ ছিল এই বর্বর জাতির আক্রমণ।

স্কন্দগুপ্ত: ৪৫৫খ্রীষ্টাব্দে কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার এই বীরপুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সময়ে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিরাট সাম্রাজ্য স্কন্দগুপ্ত অতি দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন। ভারতের সীমান্তে তখন বর্বর হূণগণ গান্ধার ও পঞ্জাবের কতকাংশ ছারখার করিতেছিল; কিন্তু যতদিন স্কন্দগুপ্ত জীবিত ছিলেন, ততদিন তাহারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করিতে সাহস করে নাই। ৪৬৭ অথবা ৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়।

হূণগণ: বর্বর হূণগণ প্রথমে মধ্য এশিয়ার অধিবাসী ছিল। তাহারা দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া বহু অঞ্চল আক্রমণ করে এবং মালবের পূর্বাংশ, রাজপুতানা ও পঞ্জাব তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। হূণরাজগণের মধ্যে তোরমান ও মিহিরকুল সবিশেষ খ্যাত ছিলেন। হূণগণ অত্যন্ত নৃশংস ও রক্ত-লোলুপ জাতি ছিল। তাহারা যেখানেই যাইত, সেখানেই সমস্ত ছারখার করিয়া দিত; অবশেষে মালবের রাজা যশোধর্মন্ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া হূণগণের শক্তি খর্ব করেন (আনুমানিক ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ)।

যশোধর্মন্ কর্তৃক মিহিরকুলের পরাজয়

ফা-হিয়েনের বিবরণ—চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তীর্থভ্রমণ ও বৌদ্ধধর্মগ্রন্থাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন হইতে যাত্রা করিয়া ৪০১ হইতে ৪১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পাটলিপুত্রে থাকিয়া তিনি শেষ দুই বৎসর তৎকালীন প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্ততে (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুকে) কাটাইয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি সমুদ্রপথে সিংহল ও যবদ্বীপ ঘুরিয়া ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

ফা-হিয়েন গুপ্ত শাসন ও জনগণের শান্তিপূর্ণ জীবন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায়, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অতিশয় ন্যায়পরায়ণ, উদার ও বিচক্ষণ রাজা ছিলেন এবং অতি উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালী অনুসরণ করিয়া রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। প্রজাগণ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত। তাহারা যখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিত, সেজন্য রাজকর্মচারীর অনুমতি লইতে হইত না।

বিদেশীয় পর্যটকগণেরও এই অধিকার ছিল। সাধারণত অপরাধীদের প্রাণদণ্ড অথবা শারীরিক দণ্ড প্রচলিত ছিল না। কিন্তু কেহ বিদ্রোহী হইয়া রাহাজানি ও লুণ্ঠনাদি করিলে তাহার ডান হাত কাটিয়া দেওয়া হইত। তবে এই শ্রেণীর অপরাধ প্রায় দেখা যাইত না। ফা-হিয়েন যেখানে ইচ্ছা পরম শান্তিতে বাস করিতেন। ভারতের সর্বত্র তিনি অবাধে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; চুরি-ডাকাতির কোন উল্লেখই তিনি করেন নাই। রাজস্ব হিসাবে শস্যাদির অংশ গ্রহণ করা হইত এবং রাজকর্মচারীরা নিয়মিত বেতন পাইত। গুপ্ত-সম্রাট হিন্দু ধর্ম পালন করিলেও সকল ধর্মকেই পরম সমাদর করিতেন।

উন্নত শাসন প্রণালী

জনগণের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল। নানা শ্রেণীর লোকেরা দেশের সর্বত্র পুণ্যশালা বা পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত করিত। পথিকেরা এখানে বিশ্রামের জন্য বাস-স্থান, শয্যা, আহার-পানীয়াদি বিনামূল্যে পাইত। রোগীর চিকিৎসার জন্য দেশময় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। দুঃস্থ লোকেরা এখানে বিনামূল্যে ঔষধ-পথ্যাদি পাইত। পাটলিপুত্রের বিরাট দাতাব্য চিকিৎসালয়টি বহু দানশীল নাগরিকের ব্যয়ে ও শিক্ষিত চিকিৎসকদের অধীনে পরিচালিত হইত। পাটলিপুত্র অতি সমৃদ্ধ ও উন্নত নগর ছিল। এখানে দুইটি বৌদ্ধ বিহারে প্রায় ছয়-সাত শত মনীষী ভিক্ষু বাস করিতেন। বহু অঞ্চল হইতে অসংখ্য শিক্ষার্থী তাঁহাদের নিকট নানা বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য আসিত। পাটলি-পুত্রে বহু সুরম্য প্রাসাদ বর্তমান ছিল। তাহাদের কোন কোনটি অশোকের নির্মিত। এই সকল প্রাসাদের শিল্পশ্রী ও গঠন-নৈপুণ্য দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অশোকের একটি প্রাসাদ তাঁহাকে বিস্ময়ে এতদূর অভিভূত করিয়াছিল যে, তিনি উহা মানুষের নির্মিত বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই।

অতিথিশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয়

ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার দেখিয়া ফা-হিয়েন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সংযম, সচ্চরিত্রতা ও রীতিনীতির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ঈর্ষা বা বিদ্বেষ ছিল না। দেশের প্রচুর ধনবল ও জনবল ছিল। জনগণের মধ্যে চৌর্যবৃত্তি বা অসদাচরণ মোটেই ছিল না। তাহারা পরোপকারী ও ধর্মপ্রবণ ছিল। দেশে প্রাণীহত্যা করা হইত না। নীচ অন্ত্যজ জাতিই সাধারণত মদ্য, মাংস বা পেঁয়াজ খাইত, শূকর বা মুর্গি পালন করিত। তাহারা অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া বিবেচিত হইত এবং বাধ্য হইয়া নগরের বাহিরে বাস করিত, কারণ উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে কোন সংস্পর্শ রখিবার অধিকার তাহাদের

জনগণের জীবন

অস্পৃশ্য জাতি

ছিল না। দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ফা-হিয়েন বৌদ্ধ সাহিত্যের বহু পাণ্ডুলিপি, অনেক মূর্তি ও চিত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

গুপ্ত শাসন-প্রণালী : প্রায় আড়াই শত বৎসর ব্যাপী গুপ্ত সম্রাটগণের শাসন-কাল ভারতের একটি বিশেষ গৌরবময় যুগ। এই যুগে ভারতীয় মনীষা বহুদিকে বিকাশ পাইয়াছিল, এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অনেক পণ্ডিতব্যক্তি গুপ্তযুগকে ভারতের নবজাগরণের যুগ বা স্বর্ণ যুগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গুপ্ত সম্রাটগণ তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য অতি দক্ষতার সহিত শাসন-পালন করিতেন।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য গুপ্ত সাম্রাজ্য কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ছিল; প্রতি বিভাগকে বলা হইত 'ভুক্তি'। প্রতিটি ভুক্তি আবার বর্তমান কালের জেলার ন্যায় কয়েকটি 'বিষয়' নামক অঞ্চলে বিভক্ত হইত। সাধারণত নানা শ্রেণীর বেসরকারী সভ্য লইয়া গঠিত 'অধিষ্ঠানাধিকরণ' বা 'বিষয়াধিকরণ' নামক একটি সমিতির পরামর্শ ও সাহায্য লইয়া বিষয়পতি শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন।

দেশের নানা বিভাগ

৩। কনৌজ সাম্রাজ্য

হর্ষবর্ধন ও প্রতিহার মহেন্দ্রপাল

হর্ষবর্ধন : গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার রাজধানী ছিল স্থাণ্বীশ্বর বা বর্তমান থানেশ্বর। থানেশ্বর রাজ্য প্রথমে ক্ষুদ্র ছিল, কিন্তু রাজা প্রভাকরবর্ধন হূণ, গুর্জর ইত্যাদি শক্তিসমূহকে পরাজিত করিয়া ইহাকে একটি প্রবল রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে বসিবামাত্র তাঁহার নিকট সংবাদ পৌছিল যে, গৌড়রাজ শশাঙ্ক মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত মিলিত হইয়া কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার ভগ্নীপতি মৌখরি-বংশীয় কান্যকুব্জরাজ গ্রহবর্মন নিহত ও ভগ্নী রাজ্যশ্রী কারারুদ্ধ হইয়াছেন। রাজ্যবর্ধন তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য লইয়া শশাঙ্ক ও দেবগুপ্তকে পরাজিত করিয়া রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি সহজেই দেবগুপ্তকে পরাজিত করিলেন বটে, কিন্তু শশাঙ্কের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল। থানেশ্বরে যখন এই সংবাদ পৌছিল, তখন প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এই সময় হইতেই হর্ষাব্দ নামে এক নূতন অব্দ প্রচলিত হয়।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হর্ষ গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, রাজ্যশ্রী কারামুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু মনের দুঃখে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বহু অনুসন্ধানের পর হর্ষ বিন্ধ্যপর্বতে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি তখন আগুনে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করার উদ্যোগ করিতেছিলেন, ঠিক তখনই হর্ষ তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও শশাঙ্ককে পরাজিত করিতে পারিলেন না। পরবর্তী কালে হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীর নামে মৌখরি রাজ্য শাসন করিতেন, এবং কান্যকুব্জেই তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

রাজ্যশ্রী-উদ্ধার

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য : শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন আর্যাবর্তের অধিকাংশ জয় করিয়া এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নর্মদা অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে পরাজিত হওয়ায় তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের সীমা ঠিকরূপ জানা যায় না ; তবে কাশ্মীর, পঞ্জাবের কতক অংশ, রাজপুতানা, সিন্ধু ও কামরূপ ব্যতীত সমগ্র আর্যাবর্তই তাঁহার অধীনে ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

হর্ষবর্ধন

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে

যশোবর্মন নামে একজন শক্তিশালী রাজা কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গৌড়, মগধ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য জয় করেন। বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার ভবভূতি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন।

যশোবর্মনের সময়ে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় নামে কাশ্মীরের একজন অসাধারণ সমর-কুশল রাজা প্রথমে তিব্বতীয় ও অন্যান্য পার্বত্য জাতিকে পরাজিত করেন এবং পরে যশোবর্মনের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। বহুকালব্যাপী যুদ্ধের পর যশোবর্মন পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার রাজ্য বিশাল কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। কান্যকুব্জ পদানত করিয়া ললিতাদিত্য অনায়াসে মগধ, বঙ্গ, কামরূপ এবং

কলিঙ্গ জয় করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি মালব ও গুজরাট অধিকার করেন এবং সম্ভবতঃ সিন্ধুদেশ-বিজেতা মুসলমান ধর্মাবলম্বী আরবগণকেও যুদ্ধে পরাজিত করেন। ললিতাদিত্য কাশ্মীরে বিচিত্র অট্টালিকা ও দেবমন্দিরে-শোভিত মনোহর নগরাবলী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্মিত মন্দিরের মধ্যে বিখ্যাত মার্তণ্ড মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য ঃ গুর্জর জাতি নানা শাখায় বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রতিহারগণই সমধিক প্রসিদ্ধ। গুর্জর-প্রতিহারগণ (৪১ পৃঃ) সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই মালব ও রাজপুতানায় স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মালবের গুর্জর-প্রতিহাররাজা প্রথম নাগভট সিন্ধুনদ-বিজয়ী আরবগণকে বাধা প্রদান করিয়া শক্তিশালী হন। তাঁহার পরে আরও দুইজন রাজা অনেক দেশ জয় করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন, কিন্তু রাষ্ট্রকূটগণের হস্তে পরাজিত হওয়াতে তাঁহাদের কেহই কোন স্থায়ী ফললাভ করিতে পারে নাই। পূর্বদিকে বাংলার পাল-গণের সহিত গুর্জর-প্রতিহারগণের সর্বদা সংঘর্ষ চলিত। পালবংশ হীনবল হইলে গুর্জর-প্রতিহারগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ভোজ নানা দেশ জয় করেন। ভোজ ও তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালে গুর্জর-প্রতিহার রাজ-শক্তি প্রবল হইয়া উঠিল, এবং গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে কাঠিয়াবার উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। তাঁহাদের রাজধানী কান্যকুব্জ নগরও তৎকালে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। কিন্তু মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর পরেই রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র প্রতিহাররাজ মহীপালকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানী কান্যকুব্জ লুণ্ঠন করিলেন (৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ)। মহীপাল শীঘ্রই নিজের রাজ্য উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু গুর্জর-প্রতিহারগণের পূর্ব গৌরব আর ফিরিল না। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরে এবং মুসলমান যুগের পূর্বে গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যই সুবিশাল ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল। ইহাই ছিল এই যুগের শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য। সিন্ধুদেশ-বিজয়ী আরবগণের গতিরোধ করাই ছিল প্রতিহারগণের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব। গুর্জর-প্রতিহার রাজগণের পতন হইলে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। তাঁহাদের প্রভুত্ব কেবল কান্যকুব্জ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী ভূভাগেই সীমাবদ্ধ রহিল।

রাজা প্রথম নাগভট

বাংলার পালগণের সহিত সংঘর্ষ

রাজা ভোজ ও মহেন্দ্রপাল

রাজা মহীপাল

সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি

৪। গৌড় সাম্রাজ্য

বঙ্গদেশের প্রাচীন বিবরণ : ভারতের অন্তর্গত বর্তমান পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশ মিলিয়া যে অঞ্চল, তাহারই নাম বঙ্গদেশ। অতি প্রাচীনকালে এই সমগ্র ভূখণ্ড কোন একটি বিশেষ নামে পরিচিত ছিল না। নানা অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, দৈত্যরাজ বলির পাঁচটি পুত্রের নাম অনুসারে এই অঞ্চলের পাঁচটি দেশের নাম ছিল—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। বর্তমান ভাগলপুর অঞ্চলের নাম ছিল অঙ্গ, বঙ্গদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের নাম ছিল বঙ্গ; উড়িষ্যা অঞ্চল ছিল কলিঙ্গ, বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চল সুহ্ম ও উত্তরাঞ্চল পুণ্ড্র নামে অভিহিত হইত। একটি প্রাচীন জাতি পুণ্ড্র নামে পরিচিত ছিল; সেই জন্যই উত্তরবঙ্গ, পুণ্ড্র দেশ নামে খ্যাত হইয়াছিল। এই অঞ্চলের আর একটি নাম ছিল বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী। বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল সুহ্ম রাঢ় নামেও পরিচিত ছিল, এবং ইহা উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। পরবর্তী কালে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের নাম হয় গৌড়। প্রবল পরাক্রান্ত বাংলার রাজা শশাঙ্কের সময় হইতে সমগ্র বঙ্গদেশই গৌড় নামে পরিচিত হয়। হিন্দু যুগের শেষ আমলে বাংলাদেশ গৌড় ও বঙ্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে বিশেষত মুসলমান যুগে, গৌড় নামের প্রসিদ্ধি আর থাকে না, বাংলা ও বঙ্গ নামেই এই সারা দেশটি সুপরিচিত হয়।

নানা অংশের প্রাচীন নাম

গৌড়

গৌড় ও বঙ্গ

প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনের পর বঙ্গদেশ স্বাধীন হয়। নানা তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে এই স্বাধীন বঙ্গদেশে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা সকলেই গুপ্ত সম্রাটগণের ন্যায় মহারাজাধিরাজ পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাচারদেবের স্বর্ণমুদ্রা ও তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। বাংলা দেশের দক্ষিণাংশ এবং পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশে ইহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। হর্ষবর্ধনের প্রসঙ্গে গৌড়ের মহারাজা শশাঙ্কের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সার্বভৌম নরপতি শশাঙ্ক গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পশ্চিমে কান্যকুব্জ (কনৌজ) এবং দক্ষিণে উড়িষ্যা পর্যন্ত বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন।

স্বাধীন বাংলা ও উহার রাজা

গৌড়ের বাঙালী রাজা শশাঙ্ক

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মন্ তাঁহার বিরাট রাজ্য দখল করিলেও বাংলা দেশে তাঁহাদের অধিপত্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। হিউয়েন্ সাঙ্ বাংলা দেশে ভ্রমণ করিয়া রাজমহলের নিকটবর্তী কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, বঙ্গোপসাগরের উপত্যকায়স্থিত সমতট ও তাম্রলিপ্তি বা তমলুক এই পাঁচটি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায়, সমতটে তখন এক ব্রাহ্মণ বংশ রাজত্ব করিত। এই বংশের শীলভদ্র হিউয়েন্ সাঙ্য়ের সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। পূর্ববঙ্গে তখন খড়্গ বংশ রাজত্ব করিত। এই বংশের খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ প্রভৃতি রাজারা মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন। দেবখড়্গের রাণী প্রভাবতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধাতু-নির্মিত একটি সর্বাণী বা দুর্গামূর্তি কুমিল্লার নিকটে দেউলবাড়ি গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে কনৌজের রাজা যশোবর্মন্ গৌড়ের রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁহার সভাকবি বাক্‌পতিরাজ এই ঘটনা লইয়া প্রাকৃত ভাষায় 'গৌড়বহো' অর্থাৎ গৌড়বধ নামে এক কাব্য রচনা করেন। ইহার পরেই কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় যশোবর্মন্‌কে পরাজিত করিয়া বাংলাদেশ অধিকার করেন। এই যুগে শ্রীধারণরাত্, লোকনাথ, গোবিচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র, ললিতচন্দ্র প্রভৃতি নানা অঞ্চলের নানা রাজার নাম জানা যায়; কিন্তু ইহাদের কোন পরিচয় বা বৃত্তান্ত জানা যায় না।

হিউয়েন্ সাঙ্য়ের বিবরণ

নানা রাজবংশ

বহিরাক্রমণ

পাল বংশের প্রতিষ্ঠা: মোটের উপর শশাঙ্কের পর একশত বৎসরকাল শক্তিশালী রাজার একান্ত অভাব, নানা বহিঃশত্রুর আক্রমণ, দেশের ভিতর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু স্ব-স্ব প্রধান এলাকার সৃষ্টি, সেগুলি মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ ইত্যাদির ফলে তৎকালীন বাঙালীদের দুঃখ-দুর্দশার আর অন্ত ছিল না। তৎকালীন কবির বর্ণনায় বাংলা দেশের এই শোচনীয় অরাজক অবস্থাকে সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত মাৎস্যন্যায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, পুকুরের কোন কোন শ্রেণীর বড় বড় মাছ যেমন ছোট মাছগুলিকে ধরিয়া খায়, দেশের অরাজকতার সময়ে ঠিক তেমনি বড় বড় শ্রেণীর লোকেরা অবিচারে অত্যাচারে সাধারণ জনগণের জীবন যাপন দুর্বিষহ করিয়া তোলে। বাংলা দেশে মাৎস্যন্যায় যখন অসহনীয় হইয়া উঠিল, তখন দেশের প্রবীণ নেতারা পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য ও বিবাদ-বিসংবাদ ত্যাগ করিয়া একজন উপযুক্ত রাজা নির্বাচন

বঙ্গে অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায়

দেশের দুরবস্থা

করিতে উদ্যোগী হইলেন, জনগণও সানন্দে তাঁহাদের সমর্থন করিল। চরম দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের জন্য বাঙালীর এই রাজনীতিক বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বাঙালীরা দেশের মঙ্গলের জন্য আনুমানিক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল নামক একজন সুদক্ষ ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচিত করিয়া সকলেই তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিল। গোপাল যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন; তাহার নাম পাল বংশ; গোপাল ও তাঁহার বংশধরগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসন হইতে অনুমান করা যায় যে, সমগ্র বঙ্গদেশই গোপালের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। গোপালের রাজত্বকালে উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বঙ্গদেশে এক দৃঢ় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং শত বৎসর অরাজকতার পরে দেশে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইহা একদিকে গোপালের, অপর দিকে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ও জনসাধারণের অপূর্ব-কীর্তি।

রাজপদে গোপালের নির্বাচন

গোপালের সুশাসনের ফল

ধর্মপাল: গোপালের মৃত্যুর পর আনুমানিক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আর্যাবর্তে এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। যখন তিনি নিজ রাজ্য হইতে পশ্চিম দিকে বিজয়াভিযান করিলেন, তখন গুর্জর জাতীয় প্রতিহার বংশের শক্তিশালী রাজা বৎসরাজ তাঁহার মলাব ও রাজপুতানা রাজ্য হইতে পূর্বদিকে জয়যাত্রা করিতেছিলেন। ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে এক সংঘর্ষ হইল এবং ধর্মপাল পরাজিত হইলেন। ইহার পরেই দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব আর্যাবর্তে রাজ্যবিস্তার করিতে অগ্রসর হইয়া বৎসরাজকে পরাজিত করেন। ইতিমধ্যে ধর্মপাল মগধ, বারাণসী প্রয়াগ জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু ধ্রুব আসিয়া ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন। এই সুযোগে ধর্মপাল হিমালয়ে কেদারতীর্থ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করিয়া পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে কান্যকুব্জ আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ রাজধানী-রূপে বিবেচিত হইত। সুতরাং সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী রাজারা এই স্থানের দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন। রাজ্যবিস্তারের প্রারম্ভেই ধর্মপাল কান্যকুব্জের ইন্দ্ররাজকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধ নামে তাঁহার এক প্রতিনিধিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের

রাজ্য বিস্তার

কান্যকুব্জ অধিকার

মধ্যে মাত্র বাংলা দেশ ও বিহার নিজের অধীনে ছিল ; পরাজিত রাজারা তাঁহার সামন্ত রূপে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতেন।

আর্যাবর্তের অধীশ্বর হইয়া ধর্মপাল কান্যকুব্জে এক বিরাট রাজদরবার করেন। এই দরবারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার, কীর* প্রভৃতি বহু রাজ্যের সামন্ত রাজারা উপস্থিত হইয়া ধর্মপালের সার্বভৌম অধিপত্য স্বীকার করেন। এই সকল বিবরণ মালদহের নিকটবর্তী খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে। যখন মহা-সমারোহে স্বর্ণকলসী হইতে নানা তীর্থের পবিত্র জলধারায় ধর্মপালের মস্তক ধৌত করিয়া তাঁহাকে রাজচক্রবর্তী পদে অভিষিক্ত করা হইতেছিল, তখন সভায় উপস্থিত সমস্ত রাজা প্রণত মস্তকে 'সাধু! সাধু!' বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। ইহা বাংলাদেশের এক মহাগৌরবের দিন। রাজধানী পাটলিপুত্রেও অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত এইরূপ দরবার হইত, এবং ভারতের সামন্ত রাজারা মহা-উৎসাহে সমবেত হইয়া মহারাজাধিরাজ ধর্মপালকে নানা উপঢৌকন দিয়া সংবর্ধিত করিতেন।

ধর্মপালের রাজ-চক্রবর্তীরূপে অভিষেক

ধর্মপাল কিন্তু নিরুদ্বেগে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পরিলেন না। তাঁহার পূর্বতন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিহাররাজ বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন এবং চক্রায়ুধ ধর্ম-পালের শরণাপন্ন হন। অবশেষে এক ভীষণ যুদ্ধে নাগভট ধর্ম-পালকে পরাজিত করেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই রাষ্ট্রকূট-রাজ ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ নাগভটের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার ক্ষমতা এমন ক্ষুণ্ণ করিয়া দেন যে, নাগভট বা তাঁহার পুত্রেরা আর কখনও পাল রাজাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। রাষ্ট্রকূট রাজাদের বিবরণ হইতে জানা যায়, ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ তৃতীয় গোবিন্দের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ নাগভটের ক্ষমতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা তৃতীয় গোবিন্দের আশ্রয় নিয়াছিলেন। নাগভটের রাজ্য ধ্বংস করিয়া তৃতীয় গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে নিজের রাজ্যে ফিরিয়া গেলে ধর্মপালের বিশাল সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল। ইহার পর হইতে ধর্মপাল পরম শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। তিনি আনুমানিক ৭৭০ হইতে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করেন।

প্রতিহার রাজের সহিত যুদ্ধ ও পরাজয়

রাষ্ট্রকূট রাজ কর্তৃক প্রতিহার ক্ষমতা ধ্বংস

* ভোজ : সম্ভবত বিন্ধ্যপর্বতের পাদমূলে অবস্থিত ভূপালের নিকটবর্তী অঞ্চল ; মৎস্য বর্তমান জয়পুর ; মদ্র, কুরু, যবন, গান্ধার, কীর প্রভৃতি পঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল ; যদুরাজ্য সম্ভবতঃ সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত অঞ্চল ; অবন্তি মালবদেশ।

দেবপাল : ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বহু যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং আসাম ও উড়িষ্যা জয় করেন। দ্রাবিড়, গুর্জর ও হূণগণ তাঁহার হস্তে পরাজিত হয়। উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত এবং পূর্বে আসাম প্রদেশ হইতে পশ্চিমে পঞ্জাবের সীমান্ত পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। দেবপাল তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ও বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন (আনুমানিক ৮১০ হইতে ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁহার কীর্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যে অবস্থিত নালন্দা ও বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয় তখন সমগ্র বৌদ্ধ জগতের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মালয় উপদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় মহারাজ বালপুত্রদেব নালন্দা বিহারে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ইহার ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া দেবপালের নিকট দূত প্রেরণ করেন। দেবপাল তাঁহার এই প্রার্থনা পূরণ করেন। পাল-রাজারা বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরের জন্য তাঁহারা নিষ্কর ভূমি দান করিতেন। পালরাজগণের প্রধান মন্ত্রীর পদে সাধারণত ব্রহ্মণগণই অধিষ্ঠিত থাকিতেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার

তাঁহার কৃতিত্ব

শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাকে গ্রাম দান

ধর্মপাল ও দেবপালের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলা দেশ গৌরবের শিখরে আসীন ছিল। মালদহের নিকটবর্তী খালিমপুরের তাম্রশাসন, মুঙ্গেরের তাম্রশাসন, নালন্দার তাম্রলিপি প্রভৃতি হইতে তাঁহাদের অসীম কৃতিত্বের বিবরণ জানা যায়। কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর পর এই কৃতিত্ব বেশিদিন টিকিল না। দেবপালের দুইজন উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অন্য রাজারা জয় করেন। এমন কি দেবপালের পরে প্রায় একশত বৎসর পর্যন্ত অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে পালরাজ্য বিশেষ বিপর্যস্ত হইয়া যায়।

পাল সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি—খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী

প্রাচীন বৈদিক যুগের পরবর্তী হাজার বছরে ভারতের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ও শাসন প্রণালীর গুরুতর পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন প্রধানতঃ মৌর্য ও গুপ্ত যুগে এবং কতকটা তাহার পরবর্তী কালে ঘটে।

১। মৌর্যযুগ (৩২৪ খ্রীঃ পূঃ—১৮৫ খ্রীঃ পূঃ) ও পরবর্তী যুগ (১৮৫ খ্রীঃ পূঃ—৩১৯ খ্রীঃ)

ধর্ম : মৌর্যযুগে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ও প্রভাবের কথা সম্রাট অশোকের প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় ভারতের বাহিরে প্রচারিত না হইলেও ভারতের সর্বত্র—বিশেষতঃ পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে—প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সুতরাং হিন্দুধর্মের প্রভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল।
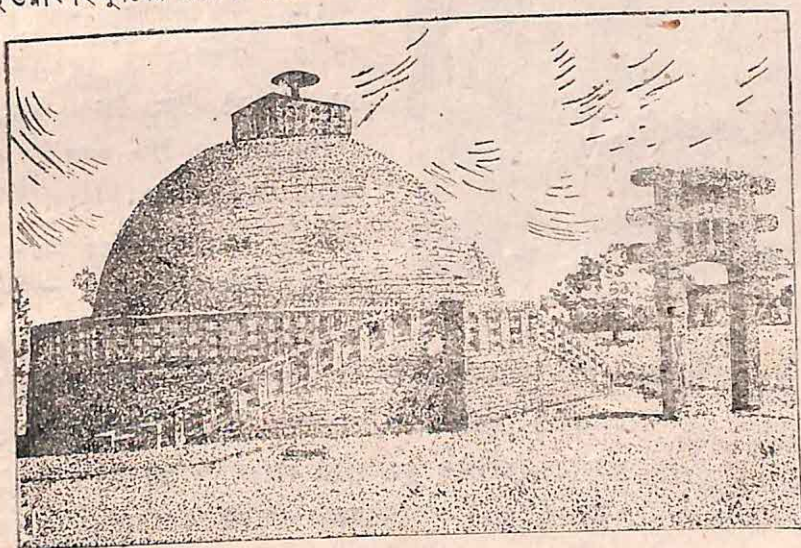
সাঁচীস্তূপ

শিল্পকলা : মৌর্যযুগে, বিশেষভাবে অশোকের রাজত্বকালে, শিল্পকলায় বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজভবনের সৌন্দর্য মেগাস্থিনিস উল্লেখ

ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে।

প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ছিল। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন উভয়েই সুকবি ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতিধর, গোবর্ধন ও শরণ—এই পাঁচজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইহাদের মধ্যে জয়দেব এখনও সুবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যখানি সমগ্র ভারতে সমাদৃত হইতেছে।

লক্ষ্মণসেনের রাজ-সভায় কবিগণ

সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাঙ্ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করিয়া ইহার অধিবাসীদের সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বাঙালী মাত্রেরই শ্লাঘার বিষয়। তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে লেখাপড়া শিখিবার অদম্য আগ্রহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানলাভের জন্য বাঙালীরা দূরদেশেও যাইত। পালগণের রাজত্বকালে বৌদ্ধ আচার্যগণ তান্ত্রিক সহজিয়া ধর্ম সম্বন্ধে অনেক পদাবলী রচনা করেন। পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে এইরূপ কতকগুলি চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। এগুলি যে ভাষায় লেখা, তাহাই বাংলা ভাষার সর্বপ্রাচীন রূপ। সুতরাং এগুলিই বাংলা ভাষায় আদিম সাহিত্য।

পূর্বতন কাল হইতে ভাত, মাছ, মাংস, শাকসব্জী, ফলমূল, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত ঘৃত, দধি, ক্ষীর প্রভৃতি বাঙালীর প্রধান খাদ্য ছিল, এখনও বাংলার হিন্দুদের মধ্যে তাহাই প্রচলিত রহিয়াছে। সেই যুগের বাঙালীর কৃষিকার্যই ছিল জীবনের মূল ভিত্তি। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

বাংলার শিল্পকলা ঃ প্রাচীন কাল হইতে বাংলাদেশে শিল্পের খুব উন্নতি হইয়াছিল। তখন দেশে বহু মন্দির, বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপ নির্মিত হইলেও এইগুলি প্রায় সকলই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে পাল যুগের যে বিরাট মন্দির ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এইরূপ বৃহৎ কোন বিহার অদ্যাবধি ভারতের অন্য কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। হিন্দু দেবদেবীর এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের অনেক সুন্দর মূর্তি বাংলা দেশের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই সমুদয় মূর্তি ছাড়াও পাহাড়পুর ও অন্যান্য স্থানে

পাল ও সেনযুগের ভাস্কর্য

প্রাপ্ত পাথরের ও কাঠের উপর খোদিত কারুকার্য এবং মূর্তিগুলি দেখিলে বুঝা যায় যে, গুপ্ত যুগ হইতে সেন বংশের অবসান পর্যন্ত বঙ্গদেশে ভাস্কর্যের খুবই উন্নতি হইয়াছিল। কয়েকখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে যে সমুদয় ছবি আছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, পাল ও সেন যুগে চিত্র-শিল্পেরও খুব উন্নতি হইয়াছিল।

ব্রোঞ্জের বিষ্ণুমূর্তি

ধীমান ও বীতপাল

ধীমান্ ও তাঁহার পুত্র বীতপাল পালযুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, চিত্র-শিল্প এবং ধাতুমূর্তিসমূহের নির্মাতা ছিলেন। তাঁহাদের শিল্পকলার বহু নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদের অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য ছিল এবং তাঁহারা একটি শিল্পী-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। প্রাচীন বাংলায় পোড়া-মাটির শিল্প খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পাহাড়পুর এবং আরও অনেক স্থানে বিশেষতঃ কুমিল্লার নিকটবর্তী ময়নামতী ও লালমাই পর্বতে পোড়া-মাটির বহু ফলক পাওয়া গিয়াছে।

(গ) দক্ষিণ ভারতের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিঃ দক্ষিণ ভারতের সাধারণ জনগণ অতি প্রয়োজনীয় নানা শস্যের উৎপাদনে এবং শিল্পকার্যে বিশেষ সুদক্ষ ছিল। সুবিস্তৃত উত্তর ভারতের মধ্যাংশের অধিবাসীরা সমুদ্র হইতে দূরে থাকায় সমুদ্র-যাত্রায় তাহাদের তেমন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু দক্ষিণ ভারত, বিশেষভাবে সুদূর-দক্ষিণ-অঞ্চল, সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত থাকায়, সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতে যথেষ্ট উৎসাহী ছিল। সমুদ্রের উপকূলবর্তী দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি রোম সাম্রাজ্যের ও অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া যথেষ্ট ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্য দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণ পরম সুখে জীবন যাপন করিত। দেশের রাজারাও প্রজাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

জীবনযাত্রা

পল্লব রাজারা সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী

করিয়াছেন। অশোকের প্রস্তর-নির্মিত বিরাট রাজ-প্রাসাদ সমস্ত বিদেশীয়কে বিস্মিত করিত। অশোকের নির্মিত মধ্যভারতে ভোপালের অন্তর্গত সাঁচীস্তূপ দেখিয়া এখনও দর্শকগণ স্তম্ভিত হইয়া যায়। এই সুবিখ্যাত বৃহৎ স্তূপটির ব্যাস ১২১½ ফুট এবং উচ্চতা ৭৭½ ফুট। ১১ ফুট উচ্চ একটি প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর দ্বারা ইহা বেষ্টিত রহিয়াছে। ইহার প্রস্তর-নির্মিত চারিটি তোরণে বুদ্ধদেবের জীবনী ও জাতকের কাহিনী অবলম্বন করিয়া বহু চিত্র খোদিত হইয়াছে।

মাত্র একখণ্ড প্রস্তরে গঠিত বহু স্তম্ভ অশোক ভারতের নানা স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। স্তম্ভে ধর্মোপদেশ ক্ষোদিত থাকিত। এই সকল অত্যুচ্চ মসৃণ স্তম্ভের শীর্ষাংশ সিংহ, হস্তী প্রভৃতির মূর্তিসহ ভাস্কর্য-শিল্পে অলঙ্কৃত থাকিত। কিন্তু বহু স্তম্ভই এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বেলে পাথরে নির্মিত আয়নার মতো পালিশ করা অতি মসৃণ লৌরিয়া নন্দনগড় স্তম্ভ এবং তাহার উপরিভাগের পশুমূর্তিটি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহা ৩২ ফুট ৯½ ইঞ্চি উচ্চ। স্তম্ভের নিম্নভাগের ৩৫½ ইঞ্চি ব্যাস ক্রমশঃ কমিয়া উপরে ২২½ ইঞ্চিতে শেষ হইয়াছে; ইহার শীর্ষাংশের নিম্নভাগ অতি চমৎকার শিল্পনিপুণতায় ক্ষোদিত করিয়া তাহার উপরে একটি পশুমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।
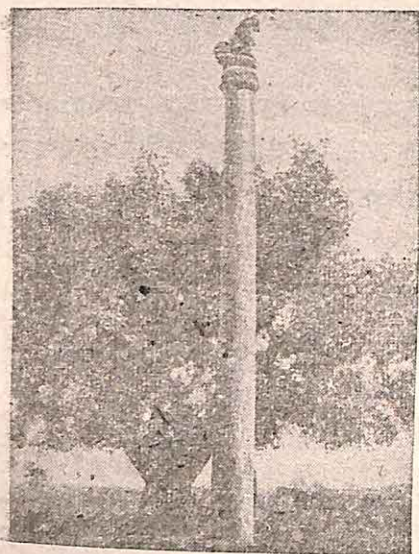
লৌরিয়া নন্দনগড় স্তম্ভ

সারনাথ স্তম্ভশীর্ষের সিংহমূর্তি

সারনাথ স্তম্ভের শীর্ষে স্থাপিত পেছনে পেছনে উপবিষ্ট চারিটি সিংহমূর্তি এবং তাহাদের নীচের শিল্পকলা দেখিয়া বর্তমান শিল্পীরাও মুগ্ধ হইয়া যায়। ইহাদের উপরে একটি ধর্মচক্র ছিল। ভাস্কর্য-শিল্পের এই উৎকৃষ্ট নিদর্শনটি ভারত

সরকার সরকারী

সরকার সরকারী প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বেশনগরের গরুড় স্তম্ভটিও দর্শনীয় বস্তু। স্তূপের নিকটে অনেক স্থানে বিহার ও চৈত্য নির্মিত হইত।

বিহার ও চৈত্য

আবার শিল্পীরা নানা স্থানে পাহাড় কাটিয়াও বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করিত। গয়ার উত্তরে অবস্থিত বরাবর পাহাড়ের বৌদ্ধ

গুহাগুলি উল্লেখযোগ্য। অশোকের দৃষ্টান্ত অনুসরণে পরবর্তী কালেও বহু স্তূপ, গুহা প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। ভাজা, বেদসা, কোন্দানে, জুন্নর, নাসিক, অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি স্থানে পশ্চিমাঞ্চলের গুহা এবং পূর্বাঞ্চলে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী উদয়গিরির জৈন গুহা ভাস্কর্য ও চিত্রকলার অতি উচ্চশ্রেণীর নিদর্শন। বোম্বাই ও পুণার মধ্যবর্তী কালে গুহাটির অতি উন্নত নির্মাণ-পদ্ধতি দেখিয়া যে-কোন ব্যক্তি অবাক হইয়া যায়।

গুহাগৃহ

মৌর্য যুগের পরে গান্ধার, সারনাথ, মথুরা, অমরাবতী প্রভৃতি স্থান শিল্পকলার কেন্দ্র ছিল। এই সকল কেন্দ্রের শিল্পকলা—বিশেষভাবে ভাস্কর্য, অতি উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গান্ধার প্রায় তিন শতাব্দী কাল গ্রীক রাজগণের অধিকারে ছিল। এখানে গ্রীক, পারসীক ও ভারতীয় শিল্পকলা মিলিত হইয়া বিচিত্র শিল্পকলা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতের বাহিরে যে সকল দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সে সকল দেশের হিন্দু ও বৌদ্ধগণ স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় শিল্পের চর্চা করিত। সেইজন্য ভারতীয় শিল্প সিংহল, চীন, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি বহু অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

২। গুপ্তযুগ (৩১৯—৫৫০ খ্রীঃ)।

জনগণের জীবন ও সমাজঃ গুপ্তযুগে সমগ্র দেশের জনগণের আর্থিক অবস্থা যে অতি উন্নত ছিল, ফা-হিয়েনের বিবরণ (৫১ পৃঃ) হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই যুগে ভারত পূর্বে ও পশ্চিমে পৃথিবীর নানা দেশের সহিত জল ও স্থলপথে বাণিজ্য করিত। পশ্চিমবঙ্গের তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ও বাণিজ্যস্থান ছিল। সেখান হইতে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়া ভারতের পূর্বদ্বীপাঞ্চলে এবং চীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি নানা স্থানে বাণিজ্য চলিত।

আর্থিক উন্নতি

শিল্পকলাঃ গুপ্ত-যুগের অতুল সমৃদ্ধির ফলে ভারতীয় শিল্পকলা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে ভারতের বহু অঞ্চলে অতি সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই যুগের দেবদেবীর মূর্তি ও অন্যান্য সকল প্রকার মূর্তিতে দেহের লাবণ্য ও অপরূপ ভাব-ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হইত। ইহাদের গঠন-প্রণালী দেখিয়া এই যুগকে ভাস্কর্য শিল্পের অতি উন্নত যুগ বলিয়া গণ্য করা যায়। এই সময়ে নির্মিত কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি ভাস্কর্য শিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া এখনও গণ্য হইয়া থাকে। বারাণসীর নিকটে

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

সারনাথের একটি বুদ্ধমূর্তি ভারতীয় শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ বলিয়া গণ্য করা হয়।

গুপ্তযুগে চিত্রকলাও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। অজন্তার কঠিন পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া নির্মিত কতকগুলি গুহার নির্মাণ-কৌশল ও মনোরম চিত্রাবলী বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীর শিল্পী ও শিল্পানুরাগীদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছে। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত বাঘ নামক গ্রামের গুহাগৃহ-গুলির অপরূপ চিত্র অজন্তার চিত্রকলারই প্রায় সমতুল্য।

চিত্রকলা

দিল্লীতে কুতবমিনারের নিকট একটি লৌহস্তম্ভ আছে। এত বড় লৌহস্তম্ভ নির্মাণের প্রণালী দুইশত বৎসর পূর্বে ইউরোপেও জানা ছিল না। অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেড় হাজার বৎসর রৌদ্র ও বৃষ্টির মধ্যে থাকা সত্ত্বেও লৌহস্তম্ভের কোথাও মরিচা ধরে নাই; ইহার মসৃণতাও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। গীত-বাদ্য-নৃত্যাদি
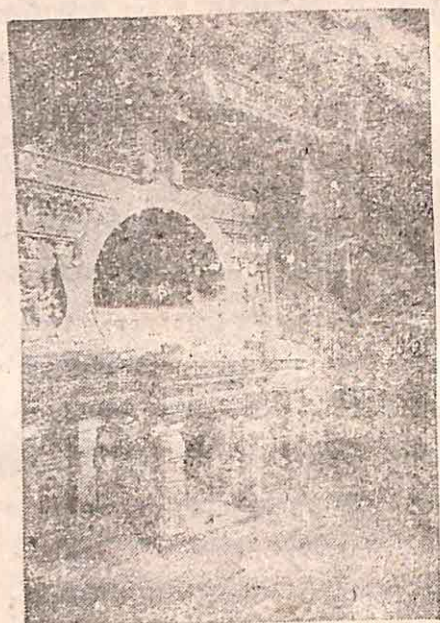
অজন্তার গুহাচিত্র

কলায় গুপ্তযুগ যে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রায় তাঁহার বীণা-বাদনরত মূর্তি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

ধর্ম: বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুদয়ের পরবর্তী যুগে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতায় অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। অশোকের পর প্রায় পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মই

ভারতের প্রধান ধর্ম ছিল। সাতবাহন ও বিশেষভাবে গুপ্তবংশের রাজত্বকালে রাজগণের পোষকতায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। কিন্তু বৈদিক যুগের ধর্মের সহিত এই ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক প্রভেদ ঘটিয়াছিল। বৈদিক যুগের প্রধান প্রধান দেবতাগণ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত এবং তাঁহাদের স্থলে নূতন নূতন দেবদেবীগণ আবির্ভূত হইলেন। এই যুগের বিশিষ্ট দেবতাগণের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্তিই হইলেন প্রধান। তবে বৈদিক যুগের দেবতা সূর্যের পূজা তখনও প্রচলিত ছিল। ব্রহ্মার পূজা অল্পকাল পরেই ধীরে ধীরে অপ্রচলিত হইতে থাকে ; কিন্তু সূর্য, বিষ্ণু ও মহাদেব বহুদিন পর্যন্ত সমান সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে সূর্যের পূজা কতকটা কমিয়া যায় ; অপর দিকে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মানুসারে শিব ও বিষ্ণু এবং তাঁদের পুত্র-কলত্রগণই হিন্দু সমাজের প্রধান উপাস্য দেবতা হন।

পুরাণ নামক ধর্মগ্রন্থসমূহ এই নবধর্মের শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইল। এই জন্য এই নূতন ধর্মকে পৌরাণিক ধর্ম এবং এই যুগকে পৌরাণিক যুগ বলা যাইতে পারে।

পৌরাণিক ধর্ম

পুরাণসমূহে এই যুগে পূজিত দেবদেবীগণের সম্বন্ধে বহু আখ্যায়িকা, তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি, ধর্মানুসরণের আবশ্যকতা, সামাজিক রীতিনীতি, দার্শনিক মতবাদ প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। বৈদিক যুগে মূর্তি গড়িয়া দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল না। পৌরাণিক যুগে মূর্তিপূজাই ধীরে ধীরে ধর্মানুষ্ঠানে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বিস্তার লাভ করিলে দেবদেবীর প্রতিমার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান ঃ গুপ্ত যুগকে প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক যুগ বলা হয়। এই যুগেই অনেক পুরাণ ও উপপুরাণ রচিত হইয়াছিল। সমাজ পরিচালনার জন্য স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র নামে পরিচিত যে সকল ব্যবহার-গ্রন্থের উদ্ভব হয়, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন গ্রন্থের নাম 'মানব ধর্ম-শাস্ত্র বা মনুসংহিতা'। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। হিন্দুগণ এই গ্রন্থকে সমস্ত প্রকার সামাজিক ও ব্যবহারিক বিধানের নিদান বলিয়া মনে করে। গুপ্ত যুগে বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন প্রভৃতি বহু স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারত গুপ্ত যুগেই বর্তমান আকার ধারণ করে। এই দুইখানি মহাকাব্যের আখ্যান অবলম্বন করিয়া সেই যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সংস্কৃত ও নানা দেশীয় ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ

পূরাণ, স্মৃতি ও মহাকাব্য ব্যতীত কাব্য, নাটক, উপন্যাস, দর্শন ও নানা শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে গুপ্ত যুগ সংস্কৃত সাহিত্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কবিগণের মধ্যে কালিদাস জগদ্বিখ্যাত। তাঁহার রচিত মহাকাব্য 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব', গীতিকাব্য 'মেঘদূত', এবং 'শকুন্তলা' ও 'বিক্রমোর্বশী' নাটক মানুষকে মুগ্ধ করে। কালিদাসের পূর্ববর্তী নাট্যকার ভাস ও পরবর্তী যুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দণ্ডী ও সুবন্ধু বিশেষ বিখ্যাত। দণ্ডীর 'দশকুমার-চরিত' এবং সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' খুব আনন্দদায়ক। নাট্যকার শূদ্রকের রচিত 'মৃচ্ছকটিক' ও বিশাখদত্ত প্রণীত 'মুদ্রারাক্ষস' অতি বিখ্যাত নাটক।

বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ

নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের চর্চায় গুপ্ত যুগ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বর্তমান কালে গণিত বিদ্যার মূলরূপে গৃহীত দশমিক পদ্ধতি হিন্দু বিজ্ঞানবিদ্‌রাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে কেবলমাত্র দশটি সংখ্যার সাহায্যে গণিতের উচ্চতম সংখ্যা লেখা সম্ভব হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত 'সিদ্ধান্ত' নামে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলির অধিকাংশই এখন আর পাওয়া যায় না। এই যুগের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মধ্যে, আর্যভট্ট ও বরাহমিহির সমধিক প্রসিদ্ধ। পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে,—এই তথ্য আর্যভট্ট সর্বপ্রথম তাঁহার 'আর্যভট্টিয়ম' গ্রন্থে প্রচার করেন। ইহা ব্যতীত তিনি আরও অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পদার্থ-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও রসায়নে এই যুগ যথেষ্ট উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিজ্ঞান চর্চা

গুপ্ত পরবর্তী যুগ (৫৫০-১৪০০ খ্রীঃ)

(ক) **হিউয়েন্ সাঙ্-এর বিবরণঃ** চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাঙ্ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খ্রীঃ এই ১৬ বৎসর ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারি।

বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত তক্ষশীলা প্রাচীন যুগের একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ-বেদাঙ্গ, সাহিত্য, দর্শন, গণিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হইত। ভারত ও বাহিরের গ্রীস, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে শিক্ষার্থীরা এখানে আসিয়া শিক্ষালাভ করিত। বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, আত্রেয় নামে এক বিখ্যাত চিকিৎসক তক্ষশিলার অধ্যাপক ছিলেন।

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়

চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাঙ্ বিখ্যাত নালন্দা* বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এশিয়ার দূর-দূরান্ত প্রদেশ হইতে ছাত্রগণ অধ্যয়নের জন্য নালন্দায় সমবেত হইত। ভারতের হাজার হাজার বিদ্যা-নিকেতনের মধ্যে ইহাই সেই যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ছিল এবং অধ্যাপকগণ সকলেই বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এখানে দশ হাজার ছাত্র আহার ও বাসস্থান পাইয়া
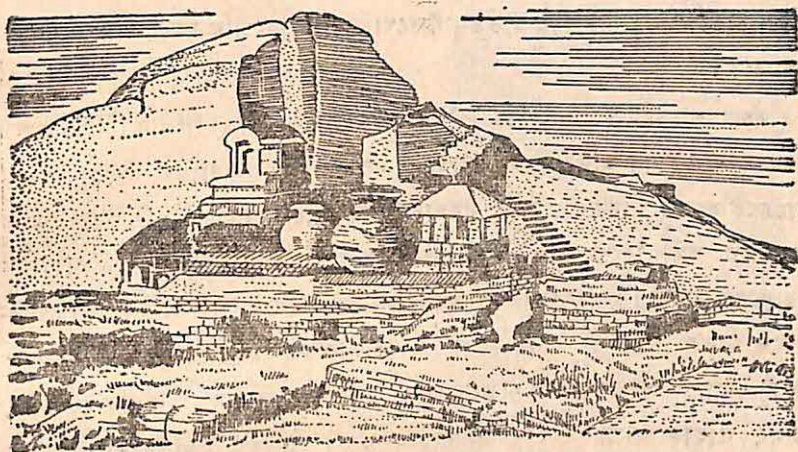
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

বিদ্যাভ্যাস করিত এবং তৎকালে প্রচলিত বৈদিক ও বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিত। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বিখ্যাত মনীষী শীলভদ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং হিউয়েন্ সাঙ্ তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(খ) **বঙ্গদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ** ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচলিত ছিল। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। সুতরাং যখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্মের পরিবর্তে হিন্দু-ধর্ম প্রাধান্য লাভ করিতেছিল তখন পাল রাজগণের পৃষ্ঠ-পোষকতায় বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশেও বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট বিকৃতি ঘটে, এবং নানারূপ তান্ত্রিক ও পৌরাণিক মতের প্রচলন হইতে থাকে। সেন বংশীয় রাজারা হিন্দু

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

* বর্তমান পাটনা জেলার বিহার সাবডিভিসনে 'বড়গাঁও' নামে পরিচিত আধুনিক এক গ্রামের নিকট নালন্দা অবস্থিত ছিল। এই স্থানে মাটি খুঁড়িয়া অনেক পুরাতন মন্দির, মঠ, ছাত্রাবাস প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানটি এখন আবার নালন্দা নামেই অভিহিত হইতেছে।

কাঞ্চী সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। বিখ্যাত 'কিরাতার্জুনীয়ম্' রচয়িতা ভারবি পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর সভাকবি ছিলেন। 'কাব্যাদর্শ' নামক সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার-গ্রন্থ-রচয়িতা দণ্ডী পল্লব রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণ একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন।

সংস্কৃত ভাষার বিস্তার

রাষ্ট্রকূট রাজারা মুসলমানদের সহিত সদয় ও উদার ব্যবহার করিতেন। বহু মুসলমান বাণিজ্যের জন্য রাষ্ট্রকূট রাজ্যে বসবাস করিত এবং মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়া ধর্মপালনে রত থাকিত, ইহাতে কেহই তাহাদের বাধা দিত না। প্রজারা সকলেই মুসলমানদের সহিত সদ্ব্যবহার করিত এবং মিলিত ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইত। যে সকল স্থানে বহু সংখ্যক মুসলমান বাস করিত, সেখানে কোন যোগ্য মুসলমানই শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইত। এই যুগে পরধর্মের প্রতি এরূপ উদারতার দৃষ্টান্ত খুব বেশি পাওয়া যায় না। তৎকালীন কোন কোন মুসলমান লেখক বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা বহ্লরা অর্থাৎ রাষ্ট্রকূটরাজ এবং তাঁহার প্রজারা মুসলমানদের পরম বন্ধু।

পরধর্ম সহিষ্ণুতা

ধর্ম ঃ আর্যাবর্তে প্রবর্তিত বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম দাক্ষিণাত্যেও বিশেষভাবে প্রসারিত হইয়াছিল। এই যুগে দাক্ষিণাত্যের ও সুদূর দক্ষিণ ভারতের অনেক রাজবংশই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে সেখানে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। এই অঞ্চলের বৈষ্ণব ও শৈব সাধকগণ দলে দলে দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া স্তোত্র ও সঙ্গীত এবং বিচার ও বিতর্ক দ্বারা ভগবানের প্রতি ভক্তির মহিমা প্রচার করিতেন। এই সমুদয় বৈষ্ণব সাধুগণ আলওয়ার ও শৈব সাধুগণ নায়নার নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই ছিল। শৈবগণের মধ্যে বীরশৈব বা লিঙ্গায়েত নামে আর একটি খ্যাতিমান্ সম্প্রদায়ও ছিল। আলওয়ারদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন নম্মালওয়ার। অপর একজন বিখ্যাত আলওয়ার কুলশেখর ছিলেন মালাবারের রাজা। নায়নারদের মধ্যে তিরুমূলর, সম্বন্দর, অপ্পর প্রভৃতি সাধুগণ অতি বিখ্যাত ছিলেন।

বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের প্রসার

আলওয়ার ও নায়নার

দাক্ষিণাত্যে অনেক বড় বড় শৈব ও বৈষ্ণব দার্শনিকের উদ্ভব হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান। তিনি অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা নবম শতাব্দীতে নাম্বুদ্রি নামক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র ভারতে তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিস্তৃত রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য শৈব ছিলেন ;

তিনি অদ্বৈতবাদ নামে বিখ্যাত দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে নাথমুনি, যমুনাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব প্রভৃতি আচার্য বহু দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করেন এবং সেই ভিত্তির উপর বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মধ্যে রামানুজ সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে নূতন এক দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন।

রামানুজ

শিল্পকলা ঃ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের বহু অপরূপ নিদর্শন এখনও দাক্ষিণাত্যে ও সুদূর-দক্ষিণ ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাজা, বেদশা, কার্লে, নাসিক, এলোরা, কাহ্নেরী প্রভৃতি নানা স্থানের পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত গুহাগৃহ ও মন্দিরগুলি এখনও সকলকে বিস্মিত করে। বিখ্যাত অজন্তা গুহাগুলির অপূর্ব চিত্র ও ভাস্কর্য এখনও মানুষকে মুগ্ধ করে। শিল্প-কলায় পল্লব রাজগণের সবিশেষ অনুরাগ ছিল। মাদ্রাজের পুডুকোট্টাই-এ অবস্থিত সিত্তন্নবসল গুহা-মন্দিরে যে চিত্রকলার বিকাশ হইয়াছিল তাহা যেমন সুচারু তেমনই সুশ্রী। কাঞ্চীর রাজসিংহেশ্বর বা কৈলাসনাথের মন্দির ও বৈকুণ্ঠ পেরুমল এবং মহাবলীপুরমের কৈলাস ও মুক্তেশ্বর মন্দির পল্লবগণের শিল্পকলার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিশেষভাবে মাদ্রাজের পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে মামল্ল-পুরমের ধর্মরাজ-রথ ও তাহার সন্নিকটস্থ দ্রৌপদী-রথ, গণেশ-রথ প্রভৃতি সাতটি রথ অর্থাৎ ছোট ছোট পাহাড় কাটিয়া সুন্দররূপে নির্মিত সাতটি মন্দির পল্লবরাজ নরসিংহবর্মনের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই মন্দিরগুলি সাধারণভাবে পাথরের পর পাথর গাঁথিয়া তৈয়ার করা হয় নাই, প্রত্যেকটি ছোট ছোট পাহাড়ের অনাবশ্যক অংশগুলি কাটিয়া সুন্দরভাবে পূর্ণাঙ্গ মন্দিররূপে নির্মাণ করা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই এই শ্রেণীর অপরূপ শিল্পকলা দেখা যায় না।

ক্ষোদিত গুহা

নরসিংহ বর্মনের সপ্তরথ

চালুক্য-রাজগণও পল্লব-রাজগণের ন্যায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে রাজধানী বাতাপিপুর ও অন্যান্য স্থানে বহু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ এলোরার বিখ্যাত কৈলাস মন্দির নির্মাণ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। মামল্ল-পুরমের মন্দিরগুলির মতো এই সুবৃহৎ মন্দিরটিও সাধারণভাবে পাথরের উপর পাথর বসাইয়া তৈয়ার করা হয় নাই। একটা বড় পাহাড়ের ২৮০ ফুট দীর্ঘ ও ১৬০ ফুট প্রশস্ত অংশ কাটিয়া এবং নিপুণতার সহিত খোদাই করিয়া এই বিশাল মন্দির নির্মাণ

রাষ্ট্রকূট শিল্পকলা

করা হইয়াছে। ইহার ভিতরে ক্ষোদিত স্তম্ভ ও বড় বড় সুগঠিত কক্ষ রহিয়াছে। দেশী ও বিদেশী যাঁহারাই এই মন্দির দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে, পৃথিবীর অন্য কোথাও এ শ্রেণীর স্থাপত্য আর দেখা যায় না। হোয়সল বংশের রাজা বিষ্ণুবর্ধনের রাজত্বকালে বহু বৈষ্ণব মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।

এলোরার বিখ্যাত কৈলাস মন্দির
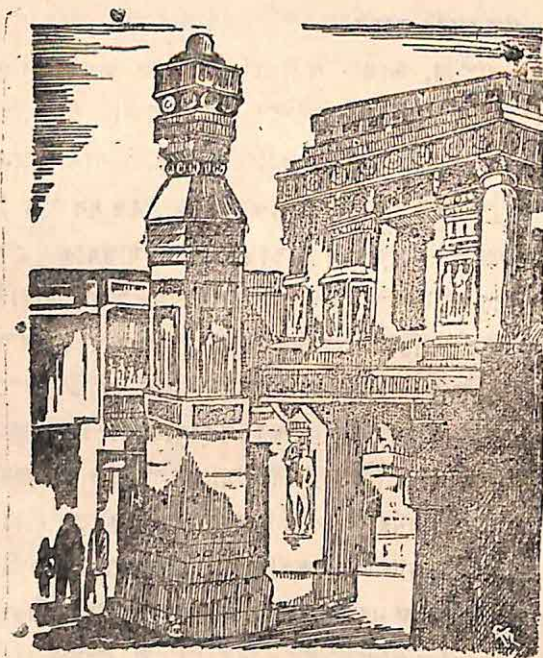
এলোরার মন্দির

রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল উভয়েই শিল্পকলাকে অতি উন্নত ও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাজরাজ চোল তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বরের শিব-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের দৈর্ঘ্য ১৮০ ফুট। পিরামিডের মতো ইহার বিশাল শিখর প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ এবং তেরটি তলায় বিভক্ত। এই তেরতলা বিশাল মন্দিরের আগাগোড়া অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকার্যে খোদাই করা এবং ভিতরের দেওয়াল নানা চিত্রে সুশোভিত। রাজরাজ নিজে শৈব ধর্ম পালন করিতেন, কিন্তু বিষ্ণুমন্দিরও তিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল গঙ্গই-কোণ্ডচোলপুরম্ নামক নগরে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া বহু মন্দির ও

চোল শিল্পকলা ও রাজরাজ চোলের বিখ্যাত শিবমন্দির

রাজপ্রাসাদে ইহা বিভূষিত করিয়াছিলেন। এই মন্দিরগুলি যে কেবল দেবতার পূজাস্থান ছিল, তাহা নহে; এগুলি শিক্ষারও প্রধান কেন্দ্র ছিল। বেদ ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার প্রধান বিষয় হইলেও অন্যান্য অনেক বিষয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিক্ষা ছাড়া ক্রীড়া-কৌতুক, নৃত্য-গীত-বাদ্য, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি সাধারণ অনুষ্ঠানেও সকলে যোগ দিত। মন্দিরেই অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বাস করিত এবং মন্দিরের আয়

রাজেন্দ্র চোলের নানা কার্য ও কৃতিত্ব
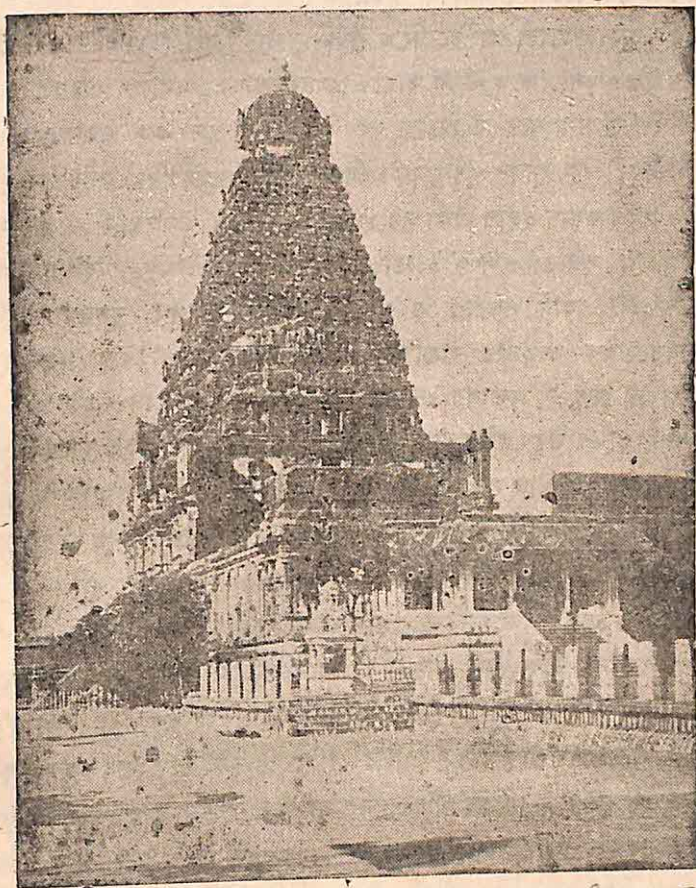
শিবমন্দির—তাঞ্জোর

হইতেই তাহাদের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ করা হইত। রাজগণের ব্যবস্থায় প্রায় সকল মন্দিরই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিল, এবং সাধারণ লোক

ব্যাঙ্কের মতো মন্দিরেই অর্থাদি গচ্ছিত রাখিত। মন্দিরে রোগীর চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল।

পাণ্ড্য শিল্পের অপরূপ মন্দির

সুবিখ্যাত পাণ্ড্যরাজ্য জটাবর্মন্ সুন্দরপাণ্ড্য মাদ্রাজের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গম্ ও চিদম্বরম্ নামক স্থানে স্বর্ণশিখরভূষিত অপরূপ মন্দির নির্মাণ করেন। ইটালীয় পর্যটক মার্কো পোলো ১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ড্যরাজ্য ভ্রমণ করিয়া ইহার অসীম শক্তি, বিপুল সমৃদ্ধি ও অভিনব শিল্প সৌন্দর্যের বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন।

(ঘ) মুসলমান আক্রমণের পরবর্তী যুগ (১২০০-১৪০০ খ্রীঃ)

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে উত্তর ভারতে ও চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ ভারতে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পরে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজে এক গুরুতর পরিবর্তন ঘটিল। যবন্, শক্, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি বিদেশীয় আক্রমণকারিগণ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করায় ইহার ঐক্য নষ্ট হয় নাই। কিন্তু মুসলমান আক্রমণকারীগণের ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারত বিজয়ের পরেও অক্ষুণ্ণ রহিল। এইরূপে ভারতবর্ষে দুইটি প্রধান সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল। মুসলমানরাই সর্বপ্রথম সমসাময়িক ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত প্রভেদ দেখাইবার জন্য ইহাকে 'হিন্দু' আখ্যা দেয়। অতঃপর ভারতে যে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই পৃথক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব হইল বর্তমান কাল পর্যন্তও তাহা অক্ষুণ্ণ আছে। হিন্দু-সভ্যতার উপর মুসলমান সভ্যতা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা দশম অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। তবে ইহার প্রথম ও প্রধান দৃষ্টান্ত—দলে দলে হিন্দুর ইসলাম ধর্মে দীক্ষা ও ইহার ফলে ক্রমশঃ হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস ও মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে হিন্দু সংস্কৃতি ক্রমশঃ স্থিতিশীল হইয়া ওঠে। নূতন কোন পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায় না। তবে সাহিত্যে উত্তর ভারতে নব্যন্যায়ের উদ্ভব বঙ্গদেশের সাহিত্যকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে। দক্ষিণে বিজয়নগরের হিন্দু সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্যের খুবই চর্চা হয়। মাধবাচার্য ও সায়নাচার্য এই দুই ভ্রাতার গ্রন্থগুলি এখনও সমগ্র ভারতে সমাদৃত। সায়ন একদল পণ্ডিত্যের সাহায্যে চতুর্বেদের সংহিতা এবং কয়েকখানি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের যে টীকা বা ভাষ্য রচনা করেন তাহা বর্তমান যুগে বেদের পঠন-পাঠনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

ভারতের বাহিরে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি

মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় যে বৌদ্ধধর্ম পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব ইউরোপে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে চীন, কোরিয়া, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হয়। ইহার ফলে এখনও পৃথিবীর লোকসংখ্যার পাঁচভাগের একভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে হিন্দুধর্মও পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক ভারতবাসী স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করে এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে এবং তাহার পূর্বে ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রহ্মদেশে, স্বর্ণদ্বীপ নামে খ্যাত সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপাঞ্চলে এবং মলয়াদি উপদ্বীপে বহু হিন্দু রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় বণিকগণ কাঠের নৌকায় বঙ্গোপসাগর পার হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানাস্থানে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতে যাইত। ক্রমে ক্রমে ধর্ম-প্রচারক ও ভাগ্যান্বেষী নানা শ্রেণীর লোক দলে দলে তাহাদের সঙ্গে দূরদেশে গিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিত। ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের তখন শিক্ষা ও সভ্যতা বলিতে তেমন কিছুই ছিল না; অনেকে আদিমতম যুগের মানুষের মতো উলঙ্গ থাকিত। নবাগত ভারতীয়গণ তাহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। এইভাবে ভারতবাসীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ব্রহ্মদেশ ঃ বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয়গণ স্থলপথে ও জলপথে আরাকান ও ব্রহ্মদেশে গিয়া বসতি স্থাপন করে। ধীরে ধীরে উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মে কয়েকটি ভারতীয় রাজ্য গড়িয়া উঠে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অনিরুদ্ধ নামক একজন পরাক্রান্ত রাজা সমগ্র ব্রহ্মদেশে ও আরাকানে আধিপত্য স্থাপন করিয়া ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশে দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মরূপে গ্রহণ

রাজা অনিরুদ্ধ

করা হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবে সেখানে সাহিত্য, বিশেষভাবে পালি সাহিত্য, শিল্প, আইন, বিচার-পদ্ধতি গঠিত হইয়াছে।

শ্যামদেশ ও মলয় উপদ্বীপ ঃ এখন যে দেশকে বলা হয় থাইল্যাণ্ড, তাহার প্রাচীন নাম ছিল শ্যামদেশ। এখানে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে ভারতীয় বসতি ও রাজ্য স্থাপিত হয়। শ্যামদেশে হীনযান বৌদ্ধধর্ম এখনও প্রচলিত আছে। মলয় উপদ্বীপেও কতকগুলি ভারতীয় বসতি ও ছোট ছোট রাজ্য ছিল।

ভারতীয় রাজ্য স্থাপন

চম্পা ঃ ইণ্ডো-চীন উপদ্বীপের পূর্বপ্রান্তে যে দেশকে পূর্বে আনাম বলা হইত, এবং এখন ভিয়েৎনাম বলা হয়, সেখানে ভারতবাসীরা প্রাচীন যুগে এক রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহার নাম দিয়াছিল চম্পা। এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন শ্রীমার। চম্পার উত্তর সীমা পর্যন্ত চীন সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সুতরাং চম্পা ও চীনের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হইত। কালক্রমে ইহার উত্তর সীমান্তে চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত টংকিন প্রদেশে আনাম নামে এক জাতি এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। চম্পায় শম্ভুবর্মন, সত্যবর্মন, ইন্দ্রবর্মন, হরিবর্মন, সিংহবর্মন, জয়পরমেশ্বরবর্মন্ প্রভৃতি বহু পরাক্রমশালী হিন্দু রাজা রাজত্ব করেন। ইহারা উত্তরে আনাম জাতি ও পশ্চিমে কম্বুজের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতেন। চম্পা রাজ্যে পাণ্ডুরঙ্গ, অমরাবতী, বিজয় প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশ ছিল। এই প্রদেশগুলিও মধ্যে মধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিত। অন্তর্বিদ্রোহ ও অবিরাম বহিরাক্রমণে চম্পা দুর্বল হইয়া পড়িলে আনাম জাতি চম্পা অধিকার করে। হিন্দু রাজারা এই রাজ্যে প্রায় তেরশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে নির্মিত মন্দির, মঠ, দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতির বহু নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে।

ভিয়েৎনাম

রাজা শ্রীমার

হিন্দুরাজগণ

আনাম জাতির চম্পা অধিকার

কম্বুজ রাজ্য ঃ বর্তমানে কাম্বোডিয়া নামে পরিচিত কম্বুজ নামক বিস্তৃত ভূ-ভাগে ভারতীয়গণ বহু প্রাচীন কালে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। গুপ্ত যুগে এই দেশের হিন্দু রাজারা খুব শক্তিশালী ছিলেন। ভববর্মন, মহেন্দ্রবর্মন, জয়বর্মন, ইন্দ্রবর্মন, যশোবর্মন্, সূর্যবর্মন প্রভৃতি কম্বুজরাজগণ নানাদেশ জয় করিয়া এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্তমান শ্যাম রাজ্য বা থাইল্যাণ্ড, মলয়-উপদ্বীপের উত্তরাংশ, ব্রহ্মদেশের দক্ষিণভাগ এবং কম্বুজের উত্তর সীমান্ত হইতে চীনদেশ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে কম্বুজ

হিন্দু রাজগণের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কয়েক বৎসরের জন্য চম্পাও কম্বুজের অধীনে ছিল। কম্বুজের রাজারা ভারত ও চীনের সহিত যথাক্রমে সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক সম্পর্ক রাখিতেন এবং ইহাদের অনেকেই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সপ্তম জয়বর্মনের রাজত্বকালে কম্বুজ সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। তিনি আংকোর-থোম্ (অর্থাৎ নগরধাম) নামে দুই মাইল দীর্ঘ সমচতুষ্কোণ স্থানে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও রাজধানীর চতুর্দিকে বেষ্টিত প্রস্তর নির্মিত অতি উচ্চ প্রাকার, প্রাকারের চারিদিকে ৮½ মাইল দীর্ঘ ও ১১০ গজ প্রশস্ত পরিখা, পাঁচটি বিশাল নগর-তোরণ, প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ রাজপথ, নগরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত বেয়ন মন্দির ও বহু দেবদেবীর মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সপ্তম জয়বর্মনের বৈশিষ্ট্য

কম্বুজে বহুশত দেব মন্দির ছিল। ইহার মধ্যে আংকোরভাট বিষ্ণুমন্দিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই মন্দিরের অতি চমৎকার গঠন-প্রণালী দর্শকগণকে মুগ্ধ করে। তিনটি ক্রমোচ্চ তলায় অবস্থিত বিশাল গ্যালারি অর্থাৎ সুদীর্ঘ অপ্রশস্ত কক্ষের শ্রেণী দ্বারা মূল মন্দিরটি পরিবৃত; ইহার শিখর ২১০ ফুট উচ্চ। কক্ষগুলির সমস্ত দেওয়াল নানা কারুকার্যে খোদিত। এই অপরূপ খোদিত শিল্পকলার বিষয়বস্তু মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান ও ঐতিহাসিক কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অতি সুন্দর দেবমূর্তিও সকলকে বিস্মিত করে।

আংকোরভাট বিষ্ণু-মন্দির

চতুর্দশ শতাব্দীতে পশ্চিমদিক হইতে থাইজাতি শ্যামদেশ অধিকার করিয়া কম্বুজ আক্রমণ করে; আবার পূর্ব দিক হইতে আনাম জাতিও রাজ্যটিকে আক্রমণ করিয়া একেবারে দুর্বল করিয়া দেয়। ইহার পর ধীরে ধীরে কম্বুজে হিন্দুগণের আধিপত্য লোপ পায়।

হিন্দুগণের আধিপত্য লোপ

সুমাত্রা দ্বীপে ভারতীয় রাজ্য ঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেই ভারতীয়গণ সুমাত্রা দ্বীপে এক পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করে। ইহার রাজধানী শ্রীবিজয় বর্তমান প্যালেম্বাংগের নিকট অবস্থিত ছিল। মলয় উপদ্বীপের দক্ষিণাংশ এবং সুমাত্রার নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের নৌবল খুব শক্তিশালী ছিল এবং ইহার বাণিজ্য-তরী ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই রাজ্যের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা সমগ্র সুমাত্রা, মলয় উপদ্বীপ ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। আরব দেশীয় লেখকরা বলিয়াছেন যে, খুব দ্রুতগামী জাহাজে চড়িয়া গেলেও এই সাম্রাজ্যের অন্ত-

নৌবল

শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণ

-র্গত দ্বীপগুলি ঘুরিয়া আসিতে অন্ততঃ দুই বৎসর লাগে। শৈলেন্দ্র রাজারা অতুল ঐশ্বর্যশালী ছিলেন এবং তাঁহারা 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা একবার নৌপথে চম্পা রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য কম্বুজও তাঁহাদের অধিকারে ছিল। ভারত মহাসাগরের পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে এতবড় সাম্রাজ্য ইহার পূর্বে বা পরে আর কখনও হয় নাই। সুমাত্রা দ্বীপে শ্রীবিজয় ও মলয় উপদ্বীপে কটাহ ও কড়ার (বর্তমান কেড্ডা) শৈলেন্দ্র রাজগণের শাসন-কেন্দ্র ছিল। মহারাজ বালপুত্র পালরাজ দেবপালের নিকট এবং মহারাজ চূড়ামণিবর্মন্ ও তাঁহার পুত্র শ্রীমার বিজয়োত্তুঙ্গবর্মন্ দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোলের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্র

সাম্রাজ্য বিস্তার ও রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক বিধ্বস্ত
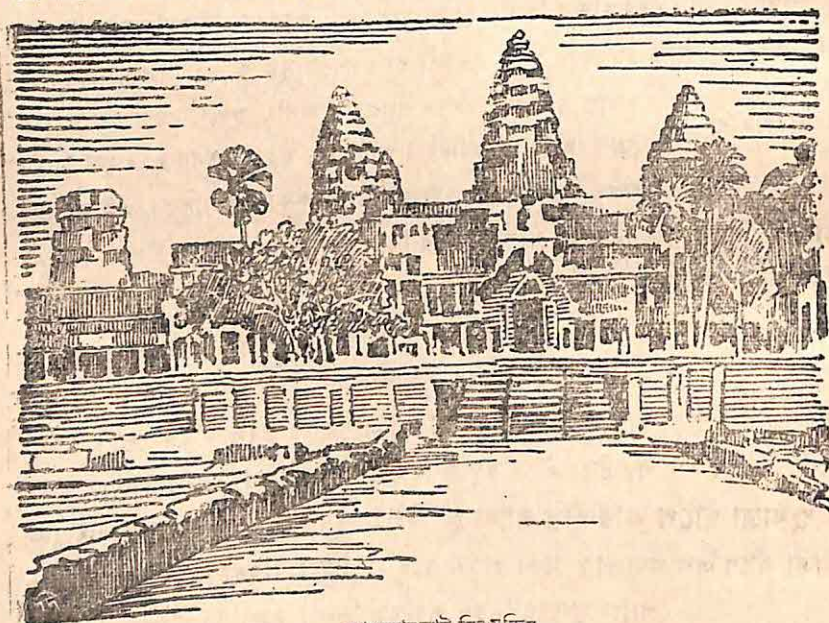
শৈলেন্দ্র রাজারা মহাযান বৌদ্ধ

আংকোরভাট বিষ্ণুমন্দির

চোলই শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্র রাজারা মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ ছিলেন। যবদ্বীপে বিখ্যাত বরবুদুর স্তূপ এবং কয়েকটি অতি সুন্দর ও সুবিশাল বৌদ্ধ-বিহার তাঁহাদের আমলেই নির্মিত হইয়াছিল। পর পর ছয়টি সমচতুষ্কোণ ও তিনটি সম্পূর্ণ গোল স্তরের উপর নির্মিত অতি বিশাল বরবুদুর স্তূপের গঠন-প্রণালী, বৌদ্ধ-গ্রন্থের ও ধর্মবিষয়ের নানা কাহিনী লইয়া অতি সুন্দরভাবে খোদিত কারুকার্যময় প্রাচীর; সর্বোচ্চ

বরবুদুর স্তূপ ও নানা বৌদ্ধ বিহার

তিনটি স্তরে স্থাপিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র স্তূপের অতি সুন্দর নির্মাণ-কৌশল এবং তাহার অভ্যন্তরে ৪৩২টি অপরূপ সুন্দর বুদ্ধমূর্তি দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়।

যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ ঃ অতি প্রাচীন কালেই যবদ্বীপে ভারতীয় বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। যবদ্বীপ নামটি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত এবং রামায়ণে ইহার উল্লেখ আছে। এখানে অনেক বড় বড় ভারতীয় রাজ্য স্থাপিত হয়, এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তির উরর এক বিশাল স্থানীয় কবি-ভাষা ও সাহিত্য গড়িয়া উঠে। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য বহু

যবদ্বীপে ভারতীয় রাজ্য
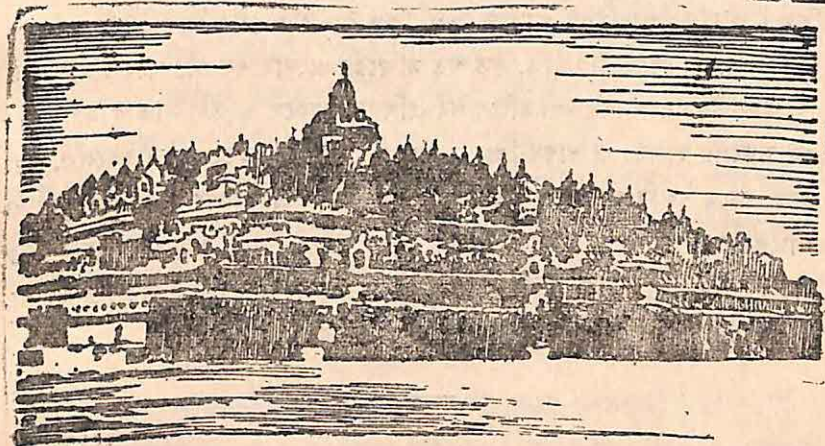
বরবুদুর বৌদ্ধ স্তূপ

সংস্কৃত গ্রন্থ কবি-ভাষায় অনূদিত হয়। গুপ্তযুগে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম যবদ্বীপে পূর্ণবর্মন নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার চারিখানা সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার দুই বা তিন শতাব্দী পরে মধ্য-যবদ্বীপে সঞ্জয় নামে একজন রাজা শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। মতরাম নামক নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ইহার পর শৈলেন্দ্র রাজগণ যবদ্বীপ অধিকার করেন। শৈলেন্দ্র বংশ হীনবল হইলে যবদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে কাদিরি, সিংহসারি প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য গড়িয়া উঠে। অবশেষে রাজধানী মজপহিৎকে কেন্দ্র করিয়া রাজসনগর নামে একজন রাজা বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই রাজ্য মুসলমানগণ অধিকার করে এবং রাজা সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বলিদ্বীপে পলাইয়া যান। বলিদ্বীপে এখনও হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা বিদ্যমান আছে

রাজা পূর্ণবর্মন ও সঞ্জয়

শৈলেন্দ্রগণের অধিকার

মুসলমানদের অধিকার ও বলিদ্বীপে পলায়ন

বৃহত্তর ভারত : মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় বসতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তৃত হইয়া এক বৃহত্তর ভারত গড়িয়া তুলিয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা খুব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্বত্র সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হইত এবং ভারতীয় বর্ণমালা সর্বত্র প্রচলিত ছিল। চম্পায় পঞ্চাশটি এবং কম্বুজে দুই শতেরও অধিক সংস্কৃতে লিখিত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং ভারতীয় আচার, ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি এই দেশীয় লোকেরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীবিজয় বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কম্বুজে শৈবধর্মেরই প্রাধান্য ছিল, কিন্তু বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্মও প্রচলিত ছিল। হাজার হাজার দেবদেবীর মূর্তি, শত শত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ভারতীয় ধর্ম ও শিল্পকলা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই অঞ্চলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্প ভারতের শিল্পকলা হইতে উদ্ভূত হইলেও, ইহা ক্রমে ক্রমে অতিশয় উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। এখানকার বরবুদুর স্তূপ ও আংকোরভাট মন্দিরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে এমন কিছু নাই। শিল্পকলায় এই দুইটি মন্দির জগতে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং ইহারা ভারতীয় সভ্যতার পরম ও চরম গৌরব।

নবম অধ্যায়

(ক) ভারতে তুর্কি-আফগান শক্তিঃ উত্থান, প্রসার ও পতন

সূচনাঃ আরবদেশে হজরত মুহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ) ইস্‌লাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইস্‌লামের প্রেরণায় আরবদের মধ্যে অপূর্ব একতা ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়াছিল। মুহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ) পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে নবজাগ্রত আরবজাতি মুহম্মদের প্রতিনিধিস্বরূপ খালিফাদের নেতৃত্বে ইউরোপের স্পেনদেশ, উত্তর আফ্রিকা এবং সমস্ত পশ্চিম এশিয়া জয় করিয়া একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিল।

হজরত মুহম্মদ ও আরব জাতি

ভারতে আরব অনুপ্রবেশঃ খলিফার অধীনে ইরাক প্রদেশের শাসকের জামাতা মুহম্মদ-ইব্‌ন্‌-কাশিম, ভারতের পশ্চিম প্রান্তে সিন্ধুদেশের দেবল বন্দরের নিকটে জলদস্যুরা আরবদের জাহাজের ক্ষতিসাধন করিয়াছে—এই অজুহাতে সমুদ্র-পথে সিন্ধু আক্রমণ করেন। বহু আয়াসে সিন্ধুর হিন্দু রাজা দাহরকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া তিনি সমস্ত সিন্ধুদেশ অধিকার করেন। ভারতে এই প্রথম মুসলমানের অনুপ্রবেশ (৭১২ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও বিশ্ববিজয়ী আরবগণ বহুদিন ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। উত্তর ভারতে রাজপুত-প্রতিহার বংশের সম্রাট এবং দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ আরবদের পথে অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সুতরাং প্রথম পর্যায়ে ভারতে মুসলমানের প্রাধান্য প্রায় তিনশত বৎসর-কাল ক্ষুদ্র সিন্ধুদেশেই আবদ্ধ রহিল।

মুহম্মদ ইবন্ কাশিম ও সিন্ধু জয়

গজনীর সুলতান মামুদ—দশম শতাব্দীর শেষের দিকে আফগানিস্থানে অবস্থিত গজনীর তুর্কিরাজ সবুক্তিগীন্ উত্তর-পশ্চিম ভারত বিজয়ের সূচনা করেন। তাঁহার প্রতিবেশী রাজা ছিলেন হিন্দু শাহীবংশীয় জয়পাল। কাবুল হইতে অধুনালুপ্ত হক্রা নদী পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সবুক্তিগীন্ জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। অসীম শৌর্য প্রদর্শন করিয়া এবং কয়েকজন রাজপুত রাজার সহায়তা লাভ করিয়াও জয়পাল যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, এবং শেষ পর্যন্ত সিন্ধুনদের পশ্চিমাংশ সবুক্তিগীন্‌কে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

সবুক্তিগীন্

সবুক্তিগীনের পুত্র সুলতান মামুদের শৌর্য ও উন্নততর যুদ্ধ-প্রণালীর ফলে একাদশ শতাব্দীর গোড়ায় কাশ্মীর ব্যতীত সমস্ত পঞ্চনদভূমি বিজিত হইয়াছিল। ১০০১ হইতে ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুলতান মামুদ সতেরো বার উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন, প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যবিস্তার বা প্রতিষ্ঠা নহে—হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা এবং ধনরত্ন লুণ্ঠন করা। তাঁহার শেষ অভিযান পরিচালিত হয় গুজরাটের সোমনাথ মন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন হিন্দু রাজা তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়া ব্যর্থ হন।

সুলতান মামুদের সতেরো বার ভারত অভিযান

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পেশোয়ারের সিংহদ্বারে অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন জয়পাল, তাঁহার পুত্র আনন্দপাল ও তাঁহার বংশধরেরা। পুরুষানুক্রমে তাঁহারা মামুদকে বাধা দিয়াছেন, ও পিতৃরাজ্য হারাইয়াও তাঁহারা কখনও মামুদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই শৌর্যবান শাহীবংশ শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল (১০২৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

শাহীবংশ

কনৌজের প্রতিহার বংশের শেষ সম্রাট রাজ্যপাল যুদ্ধ না করিয়াই মামুদের কাছে নতি স্বীকার করেন। উত্তর ভারতের শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বীর্যশালী প্রতিহারদের এই অযোগ্য অপদার্থ বংশধরকে তাঁহার এই কার্যের শাস্তি স্বরূপ বুন্দেলখণ্ডের চান্দেলরাজ হত্যা করেন।

কনৌজের প্রতিহার বংশের অবলুপ্তি

সুলতান মামুদ গজনীকে কেন্দ্র করিয়া এশিয়ায় বিরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানের ইতিহাসে তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে তিনি লুণ্ঠনকারী দস্যুরূপে কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। মুসলমানের উত্তরভারত জয়ের পথ তিনিই উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।

শিহাবুদ্দিন মুহম্মদ ঘোরী : শিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরব অর্জন করেন। শিহাবুদ্দিন ছিলেন পরাক্রমশালী ঘোর-রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁহার অধীনে গজনীর শাসনকর্তা। পঞ্জাব তখন নামে মাত্র গজনীর অধীনে। শিহাবুদ্দিন পঞ্জাবে গিয়া গজনীর পলাতক শেষ রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেন। পঞ্জাব তাঁহার অধিকারে আসিল এবং এইরূপে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পথ প্রশস্ত হইল। তাঁহার প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন আজমীরের রাজপুত চৌহান-বংশের বীর রাজা পৃথ্বীরাজ। শিহাবুদ্দিনকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিবার জন্য

পৃথ্বীরাজ অন্যান্য রাজপুত রাজাদের আহ্বান করিলেন। তরাইনের ক্ষেত্রে প্রথম যুদ্ধে শিহাবুদ্দিন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন (১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে)। কিন্তু পর বৎসরই শিহাবুদ্দিন নিজের শক্তি আরও বৃদ্ধি করিয়া পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে শিহাবুদ্দিন পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন ও পরে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পর গজনীর স্বাধীন সুলতান হইয়া শিহাবুদ্দিন বিজিত ভারত ভূখণ্ডে তাঁহার পুত্র-প্রতিম সুদক্ষ ক্রীতদাস কুতবুদ্দিন আইবক্‌কে প্রতিনিধি শাসক নিযুক্ত করিলেন। তখনও উত্তর ভারতে কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া রাজপুত গাহড়বাল বংশের রাজা জয়চন্দ্রের বিস্তৃত রাজ্য ছিল। জয়চন্দ্র ছিলেন পৃথ্বীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার পরাজয় জয়চন্দ্রের সৌভাগ্যসূচক মনে হইল। কিন্তু শীঘ্রই এই ভুল ভাঙ্গিল। চান্দাবার রণক্ষেত্রে শিহাবুদ্দিন ও কুতবুদ্দিনের হাতে জয়চন্দ্রের দশা পৃথ্বীরাজের মতই হইল। মুসলমান অধিকার বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হইল (১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

পৃথ্বীরাজ ও দুটি তরাইনের যুদ্ধ

জয়চন্দ্র ও চান্দাবারের যুদ্ধ

বাংলার সেনবংশের বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে (নদীয়ায়) বাস করিতেন। বক্তিয়ার খিল্‌জী নামক একজন তুর্কী সেনানায়ক প্রথমে বিহার ও পরে নদীয়া জয় করিলেন। শিহাবুদ্দিন ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে নিহত হন। অতঃপর কুতবুদ্দিন্ বিজিত ভারতীয় অংশের প্রথম স্বাধীন সুলতান হইলেন। তাঁহার রাজধানী দিল্লী সেদিন হইতে ভারত ইতিহাসের কেন্দ্র হইল। ভারতের প্রাচীন বা হিন্দুযুগ শেষ হইল এবং মধ্যযুগ বা মুসলমান যুগ আরম্ভ হইল।

লক্ষ্মণসেন ও বক্তিয়ার খিল্‌জী

কুতবুদ্দিন উত্তর ভারতের প্রথম মুসলমান শাসক

দাসবংশ (১২০৬-১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ) :

কুতবুদ্দিন্ এবং এই বংশের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ দুইজন সুলতান (ইল্‌তুৎমিস্ ও ঘিয়াসুদ্দিন বল্‌বন) ছিলেন ক্রীতদাস। এই কারণে ভারতের ইতিহাসে এই সুলতনী বংশের নাম দাস বংশ। কুতবুদ্দিন্ মাত্র চার বৎসর রাজত্ব করেন। কঠোর হস্তে হিন্দুর বিদ্রোহ দমনে এবং রাজ্য বিস্তারে সাফল্য লাভ করিলেও সুলতানী শাসনকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। অপঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয় (১২১০ খ্রীষ্টাব্দ)।

ইলতুৎমিস্ (১২১১-১২৩৬) : কয়েকমাসের অনিশ্চয়তার পর কুতবুদ্দিনের

ক্রীতদাস ও জামাতা ইল্‌তুৎমিস্ দিল্লীতে আসিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। এই সুযোগ্য ও গুণগ্রাহী সুলতান আভ্যন্তরীণ বিরোধ দমন করিয়া সাম্রাজ্যের বিস্তার ও উন্নতিসাধন করিলেন। সিন্ধু ও পূর্ব ভারতের (বিহার ও বঙ্গের) মুসলমান আধিপত্যের স্বাতন্ত্র্য বিলোপ করিয়া ঐ দুইটি সীমান্ত দেশকে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। গোয়ালিয়র ও রণথম্ভোর বিজিত হইল।

ইলতুৎমিস দাস-বংশের গৌরব-প্রতিষ্ঠাতা

মধ্য-এশিয়ার মোগল অধিপতি ও সমগ্র এশিয়ার ত্রাস-স্বরূপ চেঙ্গিস্ খাঁ পশ্চিম এশিয়ার পরাজিত ও পলায়িত খিবা রাজের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করেন। ইল্‌তুৎমিস্ খিবারাজকে আশ্রয় দিলেন না।

চেঙ্গিস্ খাঁ

চেঙ্গিস্ খাঁ পশ্চিম পঞ্জাবে কিছুদিন লুণ্ঠনকার্য চালাইয়া ফিরিয়া গেলেন, ভারতের অভ্যন্তরে আর প্রবেশ করিলেন না। সমগ্র মুসলমান জগতের আইনত মালিক বাগদাদের খলিফার কাছ হইতে ইলতুৎমিস্ সুলতান-ই-আজম উপাধি এবং একটি সম্মানসূচক পরিচ্ছদ লাভ করেন।

ইল্‌তুৎমিস্ মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার কন্যা নানাগুণে সমন্বিতা রাজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণীরূপে মনোনীত করেন।—একাধিক পুত্র থাকা সত্ত্বেও কন্যার এই মনোনয়ন মুসলমান ইতিহাসে অনন্য ঔদার্যের দৃষ্টান্ত। রাজিয়াই একমাত্র দিল্লীর সুলতানা বা সাম্রাজ্ঞী। সুলতানা রাজিয়া মুসলমান রমণীর সকল সংস্কার ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবে নিয়মিত রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন, দক্ষহস্তে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন, পুরুষের শিরোভূষণ পরিতেন এবং এমন কি বিদ্রোহী ওমরাহ্‌গণকে দমন করিতে গিয়া নিজেই সৈন্যদল পরিচালনা করিতেন। গোঁড়া মুসলমান প্রধানগণ নারীর সুলতানির তীব্র বিরোধী ছিলেন, এবং রাজিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুযোগ খুঁজিতেন। তদুপরি তরুণ তুর্কি ওমরাহ্‌গণের মধ্যে রেষারেষি ছিল—কে তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। রাজিয়া অবশেষে একজন বিদ্রোহী ওমরাহ্‌কে বিবাহ করিলেন, কিন্তু তিন বৎসর রাজত্ব করার পর তিনিও তাঁহার স্বামী বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হইলেন। রাজকীয়-গুণে বিভূষিতা এই অদ্বিতীয়া সুলতানা স্ত্রীলোক হইবার অপরাধেই শেষ পর্যন্ত শোচনীয় মৃত্যু বরণ করিলেন (১২৪০ খ্রীঃ)।

ভারতের একমাত্র মুসলমান সুলতানা রাজিয়া

ঘিয়াসুদ্দিন বল্‌বন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রীঃ)ঃ রাজিয়ার মৃত্যুর পর বিদ্রোহ ও

নানা গোলযোগের পর ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন সিংহাসনে বসেন। তাঁহার সদাশয়তা, ধর্মপ্রবণতা ও আভিজাত্য-বর্জিত অতি সাধারণ জীবনযাপন সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। কিন্তু স্থলতান হিসাবে ঐ সংকটকালে তিনি অযোগ্য ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ঘিয়াস্থদ্দিন বল্‌বন। পূর্বে তিনি তাঁহার পিতার একজন স্থদক্ষ ক্রীতদাস ছিলেন। বল্‌বনের বিচক্ষণতা ও কার্য-তৎপরতার জন্যই দাস-বংশ ২০ বৎসরকাল স্থায়ী নাসিরুদ্দিনের দুর্বল শাসন সত্ত্বেও টিকিয়া ছিল।

নাসিরুদ্দিন

নাসিরুদ্দিন তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর বল্‌বন অসামান্য অভিজ্ঞতা লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ওমরাহ্‌গণ স্থযোগ পাইলেই রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করিতেন। তিনি কঠোর হস্তে তাহাদের দমন করিলেন, এবং রাজ-সিংহাসনের জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বর ও মর্যাদা স্থাপন করিলেন। বিস্তৃত সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। বিরাট সৈন্যদলে রাজানুগত্য এবং নিয়মানু-বর্তিতা তিনি দৃঢ় হস্তে প্রচলিত করিলেন। চরের মাধ্যমে তিনি সাম্রাজ্যের সকল সংবাদ রাখিতেন। মেওয়াটি দস্যুদের জনগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার তিনি সম্পূর্ণ বন্ধ করিলেন। মোঘলরা তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিমে বার বার হানা দিতেছিল। তিনি তাঁহার স্থযোগ্য দুই পুত্রের সাহায্যে মোগলদের শুধু হঠাইয়া দিলেন না, ভবিষ্যতে তাহাদের আক্রমণের আশঙ্কায় ঐ অঞ্চলে সতর্ক পাহারা রাখিলেন।

বল্‌বনের শাসন

ইল্‌তুৎমিস্‌ প্রথমে বঙ্গদেশকে দিল্লীর অধীনে আনেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল দিল্লীর রাজনীতিক গোলযোগের ফলে বাংলার শাসনকর্তা তুঘ্‌রিল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্থলতান বল্‌বন প্রেরিত বিপুল সৈন্যদলকে তিনি দুইবার পরাজিত করেন। তারপর বল্‌বন নিজেই সসৈন্যে আসিলেন। তুঘ্‌রিল পরাজিত এবং অনুচরবর্গ সহ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইলেন। পুত্র বঘরার্খাকে বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া বল্‌বন দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন।

তুঘরিল খাঁ

বাংলার বিদ্রোহ দমন

বল্‌বন ছিলেন অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের নির্দয় দণ্ডদাতা, কিন্তু নিরীহ প্রজাগণের প্রতি সদাশয় ও ন্যায়পরায়ণ। তাঁহার বিচারব্যবস্থায় ইহা সম্যক প্রতিফলিত হইয়াছিল। বিচারালয়ে ছোট-বড়, আত্মীয়-অনাত্মীয়, ওমরাহ্‌-ভৃত্য—এ সবের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না।

বল্‌বনের যশোগৌরব

খিল্‌জী বংশ (১২৯০-১৩২০ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ

দাস বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া খিল্‌জী বংশীয় জালালুদ্দিন ফিরোজ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। জাতিতে তুর্কী হইলেও বহু দিন আফগানিস্থানে বাস করায় এই বংশ পাঠান বা আফগান বলিয়া পরিচিত। সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজের রাজত্বকালেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন যাদব বংশের রাজধানী দেবগিরি লুণ্ঠন করেন। পরে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জালালুদ্দিনকে হত্যা করেন এবং নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন (১২৯৬ খ্রীঃ)।

আলাউদ্দিন (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ

দিগ্‌বিজয়ী বীররূপে এবং উৎকৃষ্ট শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতারূপে আলাউদ্দিন সুলতানী আমলে সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি পশ্চিম ভারতের গুজরাট, রণথম্বোর, মেবার, মালব, মাণ্ডু, ধারা ও চান্দেরি প্রভৃতি জয় করেন। এইরূপে সমগ্র আর্যাবর্ত তাঁহার অধীনে আসিল।

দক্ষিণ ভারত অভিযানে মালিক কাফুর ছিলেন তাঁহার প্রধান সেনাপতি। যাদব রাজ্য দেবগিরি, কাকতীয় রাজ্য তেলিঙ্গানা, হোয়সল বংশের দোর সমুদ্র এবং মাদুরার পাণ্ড্য রাজ্য অধিকার করিয়া কাফুর ভারতের দক্ষিণ সীমান্ত রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে একবার দেবগিরি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। চতুর্থ এবং শেষ অভিযানে কাফুর কঠোর হস্তে সেই বিদ্রোহ দমন করেন (১৩১৩ খ্রীঃ)।

সমগ্র ভারত জয়

মালিক কাফুর

দাক্ষিণাত্যে ও সুদূর দক্ষিণভারতে এই প্রথম মুসলমান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। একে একে প্রাচীন হিন্দু রাজ্যসমূহের অবসান হইল এবং সমগ্র ভারত দিল্লীর অধীনে আসিল। আলাউদ্দিন উত্তর-পশ্চিমে মোগলদের আক্রমণকে বার বার প্রতিহত করেন, এবং একবার হাজার হাজার মোগলকে বধ করেন।

আলাউদ্দিনের বিপুল সৈন্যবাহিনী ও দেশময় গুপ্তচর ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল নিজের শাসনকে সুরক্ষিত করা—প্রজার মঙ্গল সাধন নহে। শুধু হিন্দুদের নহে, মুসলমানদেরও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। সর্বদা বিদ্রোহের ছায়া দেখিতেন; এবং শাসনের নামে নিষ্ঠুর শোষণ ও অত্যাচার করিয়া তিনি সকলকে অতিষ্ঠ

করিয়া তুলিয়াছিলেন। বহু রাজ্য বিজয়ের দাম্ভিকতায় তিনি পয়গম্বর রূপে এক নূতন ধর্ম প্রচারে অভিলাষী ছিলেন। নিজেকে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং মুদ্রার মধ্যে নিজেকে খলিফা বলিয়া পরিচয় দিলেন। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন সম্ভ্রান্ত লোকগণ পরস্পরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন ও সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী মেলামেশা করিতে পারিতেন না। মদ্যপান, জুয়াখেলা ও পাশাখেলা নিষিদ্ধ হইল। তিনি বিরাট ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রদেশে প্রদেশে বিভিক্ত করিয়া প্রতিনিধি শাসক নিযুক্ত করিলেন।

রাজ্যশাসন ব্যবস্থা

হিন্দু রাজ্য লুণ্ঠন ও প্রজাদের, বিশেষতঃ হিন্দুদের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর আদায় করিয়া তিনি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি জায়গীর প্রথা বন্ধ করেন এবং উচ্চ কর্মচারীদের জায়গীর না দিয়া বেতন দেওয়ার প্রথা প্রচলন করেন। তিনি পুরাতন জায়গীর হইতেও কর আদায় করিতেন। জমির জরিপ করাইয়া শস্যের অর্ধাংশ তিনি রাজস্ব স্বরূপ আদায় করিতেন। তাঁহার আর একটি নূতন ব্যবস্থা বাজারে পণ্য মূল্যের দর বাঁধিয়া দেওয়া। কোন দোকানদার বেশি মূল্য নিলে কিম্বা ওজনে কম দিলে তাহাকে কঠিন দৈহিক শাস্তি দেওয়া হইত। এই কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রথা কার্যকর হইয়াছিল এবং জনসাধারণ জিনিসপত্র সস্তায় পাইত। কোন কোন ঐতিহাসিক আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রশংসা করিয়াছেন।

অর্থনীতি

শাসনব্যবস্থায় খামখেয়ালিপনা ও অসহনীয় স্বৈরতন্ত্রের নিদর্শন থাকিলেও আলাউদ্দিনের অসামান্য সামরিক প্রতিভায় ইহার ভিত্তি দৃঢ় ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সম্ভবতঃ মালিক কাফুরের হাতেই তাঁহার জীবন শেষ হয় (১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

তাঁহার মৃত্যুর পর বিশৃঙ্খলা এবং নানা বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়া খিল্জী বংশের সুলতানী শেষ হইয়া যায় (১৩২০)।

তুঘলক বংশ (১৩২০—১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ) :—পঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের তুর্কী শাসক গাজী মালিক দিল্লীর ওমরাহ্‌দের সহায়তায় সিংহাসনে বসিলেন এবং ঘিয়াসুদ্দিন নাম ধারণ করিলেন। তিনি দক্ষিণ ও পূর্বে (বঙ্গদেশে) বিদ্রোহ দমন করেন এবং শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জুনা খাঁ সম্ভবতঃ পিতাকে সম্বর্ধনা দিবার ছলে হত্যা করেন (১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

মুহম্মদ বিন্ তুঘলক (১৩২৫—১৩৫১—খ্রীষ্টাব্দ)ঃ ঘিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর জুনা খাঁ সুলতান মুহম্মদ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বহু গুণ ছিল; তিনি বিদ্বান, কবি, সাহসী ও সমর-কুশল ছিলেন এবং ইসলাম ধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কিন্তু বিকৃত বিচারবুদ্ধির প্রভাবে এবং অপরের দুঃখের প্রতি সহানুভূতির অভাব থাকায় তাঁহার এই সমস্ত গুণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। মুহম্মদ তাঁহার রাজ্যের দূরতম প্রদেশের শাসনকার্যেও শৃঙ্খলা বিধান করিয়াছিলেন। দেশময় তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় ও দানশালা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুসলমান পণ্ডিতগণের জন্য প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু তিনি প্রথমেই প্রজাগণের কর অসম্ভব বাড়াইয়া দিলেন। শস্যক্ষেত্রে রীতিমত চাষ না হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তারপর সুলতান দিল্লী হইতে দেবগিরিতে (ইহার নূতন নাম দৌলতাবাদ) রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এই পরিকল্পের বিরোধী লোকদের শাস্তি দিবার জন্য আদেশ দিলেন, দিল্লীর সমস্ত লোককে যথাসর্বস্ব নিয়া দেবাগরিতে চলিয়া যাইতে হইবে; নির্দিষ্ট তারিখের পরে যদি কাহাকেও দিল্লীতে দেখা যায়, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। ইহার ফলে দিল্লী প্রায় জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইল। আট বৎসর পরে আবার দিল্লীর অধিবাসীরা দিল্লীতে ফিরিবার অনুমতি পাইল।

চরিত্র

রাজত্বের ধারা

সুলতান অর্থের অভাব দূর করিবার জন্য এক নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। বর্তমান কালে যেমন টাকার বদলে কাগজের নোট চলে, তিনি তেমনি তামার খণ্ড নোট বলিয়া চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহা জাল করার বিরুদ্ধে কোন সতর্কতা না থাকায়, ধূর্ত লোকেরা এই তামার নোট তৈরি করিয়া লক্ষপতি হইতে লাগিল। কাজেই তাঁহার এই উদ্যম একেবারে বিফল হইল। অবশেষে তিনি রাজকোষ হইতে এই সমস্ত জাল টাকার পুরাপুরি মূল্য শোধ করিয়া দিয়াছিলেন।

তামার নোট প্রচলন

সুলতান মুহম্মদ একবার পারস্য জয় করিবার জন্য বিরাট সৈন্যদল সংগ্রহ করেন। এক বৎসর পর্যন্ত ইহার ব্যয়ভার বহন করিবার পর অবশেষে পারস্য জয় অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তিনি এই সৈন্যদলকে বিদায় দিলেন। আর একবার ভারতবর্ষ ও চীনদেশের মধ্যবর্তী একটি পার্বত্য প্রদেশ জয় করিবার জন্য তিনি বিপুল একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কটের মুখে পার্বত্য জাতি—আক্রমণে তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হয়।

ব্যর্থ অভিযান

এই সমুদয় কার্যের ফলে রাজকোষ শূন্য হইল, রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা নষ্ট হইল এবং সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দিল। কতকগুলি বিদ্রোহ সুলতান নিজে যাইয়া দমন করিলেন ; কিন্তু কয়েকটি প্রদেশের বিদ্রোহ আর দমিত হইল না। বঙ্গদেশ স্বাধীনতা লাভ করিল, এবং দাক্ষিণাত্যে দুইটি বিস্তৃত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাদের একটি ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিজয়নগর
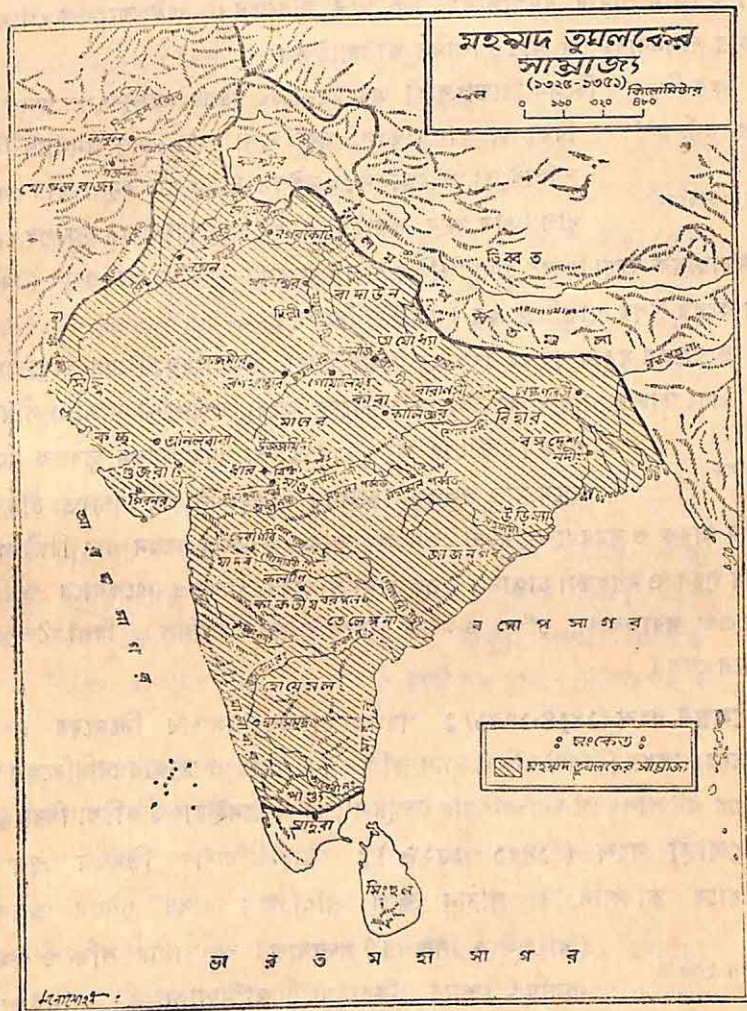
চারিদিকে বিদ্রোহ

রাজ্য, অপরটি ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাহমনী রাজ্য। অবশেষে ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু দেশের এক বিদ্রোহীর পশ্চাদ্ধাবন করিবার সময় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ফিরোজ শাহ্ (১৩৫১-১৩৮৮) ঃ মুহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁহার খুল্লতাতপুত্র ফিরোজশাহ্ সিংহাসনে বসেন। ওই দুর্দিনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার মত যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। চারিদিকের বিদ্রোহ তিনি দমন করিতে পারেন নাই। ফিরোজ ছিলেন গোঁড়া সুন্নি মুসলমান। হিন্দুদের উপর, এমন কি শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের উপর নিগ্রহ করাকে তিনি তাঁহার ধর্মপালনের অঙ্গ মনে করিতেন। এই অহেতুক গোঁড়ামি তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে আরও শিথিল করিয়াছিল।

চরিত্র

কিন্তু ফিরোজ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী এবং মোটের উপর প্রজাবৎসল সুলতান। নগর, দুর্গ, মসজিদ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সরাইখানা এবং সেতু নির্মাণে তিনি সর্বদাই তৎপর ছিলেন। দুইশত মাইল দীর্ঘ যমুনানদীর সেচের খাল তিনি খনন করাইয়াছিলেন। অপরাধীদের হস্ত-পদ ছেদন ও অমানুষিক যন্ত্রণা দিবার প্রথা তিনি বিলোপ করেন। তিনি আবওয়াব (অর্থাৎ বৈধ করের উপর অতিরিক্ত কর) উঠাইয়া দিলেন।

সংস্কার কার্যাবলী

ফিরোজের মৃত্যুর পর ২৫ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার উত্তরাধিকারীদের অযোগ্যতায় দিল্লী এবং তাহার চারিদিকের কিঞ্চিৎ ভূভাগের মধ্যে সুলতানী সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ হইল। তাঁহার পর ১৪১৩ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত ছয়জন তুঘলক বংশীর নামে মাত্র সুলতান ছিলেন। ১৩৯৮ খ্রীঃ অঃ বিখ্যাত চাঘতাই বংশের নায়ক ও সমরখন্দের রাজা তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন এবং দিল্লী পর্যন্ত অবাধ লুণ্ঠন ও নরহত্যা চালান। সুলতানী শাসনের মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল এবং অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক বিরাজ করিতে লাগিল। দিল্লী তৈমুরের অধীনে গেল।

তৈমুরলঙ্গ

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১) ঃ পরপর চারজন সুলতান নিজেদের হজরত মুহম্মদের বংশধর (সৈয়দ) বলিয়া দাবি করিতেন। দিল্লী ও তাহার চারিদিকের ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের এই শাসকবর্গ মধ্য-এশিয়ার তৈমুর বংশের অধীনেই রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

লোদী বংশ (১৪৫১—১৫২৬) ঃ লোদী বংশীয় তিনজন সুলতান ইতিহাসে আফগান বা পাঠান রূপে পরিচিত। প্রথম দুইজন সুলতান (বাহ্লুল ও সিকন্দর) পতনোন্মুখ সুলতানীর শক্তি ও ক্ষমতা সাময়িক ভাবে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। সিকন্দরের দক্ষতা ও শক্তি ছিল, কিন্তু প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষ তাঁহার গুণাবলীকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। শেষ লোদী সুলতান ইব্রাহিম গৃহবিবাদে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া

তিনজন সুলতান

পড়েন। তাঁহার খুল্লতাত আলমখাঁ, পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলতখাঁ লোদীর সহযোগিতায় সিংহাসনের অভিলাষে কাবুলের মুঘল রাজা বাবরকে আহ্বান করেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাবর দিল্লীর সিংহাসনে নিজেই উপবেশন করিলেন। ভারতে মুঘলযুগের সূচনা হইল।

প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ

রক্ষণশীল হিন্দুর তুলনায় তুর্কি-আফগানদের সমরকুশলতা অনেক উন্নত ছিল এবং এই কারণেই প্রধানত হিন্দু পরাজিত এবং মুসলমান বিজয়ী হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে আসিয়া মুসলমানগণও বাহিরের সহিত ক্রমশ সম্পর্ক হারাইলেন। এই স্বর্ণপ্রসূ দেশে ভোগবিলাসে গা ভাসাইয়া দিয়া ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া তাঁহারা স্বভাবগত শৌর্য হারাইয়া ফেলিলেন। তদুপরি এই সুলতানগণ বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির ভিত্তিতে স্থায়ী কোন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। পরস্পর মারামারি ও কাটাকাটি করিয়া এবং হিন্দুদিগকে তাহাদের চিরশত্রু করিয়া রাখিয়া ইহারা আরও অসহায় হইয়া পড়িলেন। তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং শতাধিক বৎসর পরে তাঁহারই এক বংশধর বাবরের উন্নততর যুদ্ধকৌশল সুলতানী শাসনের সমাধি রচনা করিল।

সুলতানীর পতনের কারণ

সুলতানী যুগের শেষার্ধে স্বাধীন প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ : মুহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে আলাউদ্দিনের ভারতজোড়া সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে। পরবর্তী সুলতানদের এই ভাঙ্গন রোধ করা সাধ্যাতীত ছিল। একে একে গড়িয়া উঠিল উত্তর ভারতে বঙ্গদেশ, জৌনপুর, মালব, গুজরাট, কাশ্মীর ও রাজপুতনার বিভিন্ন রাজপুত রাজ্য, এবং দক্ষিণে দুইটি বড় রাজ্য—বিজয়নগর ও বাহ্‌মনী।

বঙ্গদেশ : মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে বাংলা স্থায়িভাবে স্বাধীন হয়। সমগ্র বাংলা শামসুদ্দিন ইলিয়াস্ শাহের অধীনে শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হইল (১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁহার এবং পুত্র সিকন্দর শাহের শাসনকালে ফিরোজ তুঘলক বাংলা পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত দুইবার বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া অভিযান করেন। দুইবারই ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যান। সুলতান সিকন্দরের পুত্র ঘিয়াসউদ্দিন আজম চীনের সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময় করেন। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ সিকন্দর শাহের কীর্তি। এই বংশ ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে।

বঙ্গের স্বাধীনতা

তারপর আবার বাংলার রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা ও গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময় কিছুকালের জন্য রাজা গণেশ নামে উত্তরবঙ্গের এক হিন্দু জমিদার সমগ্র বঙ্গের
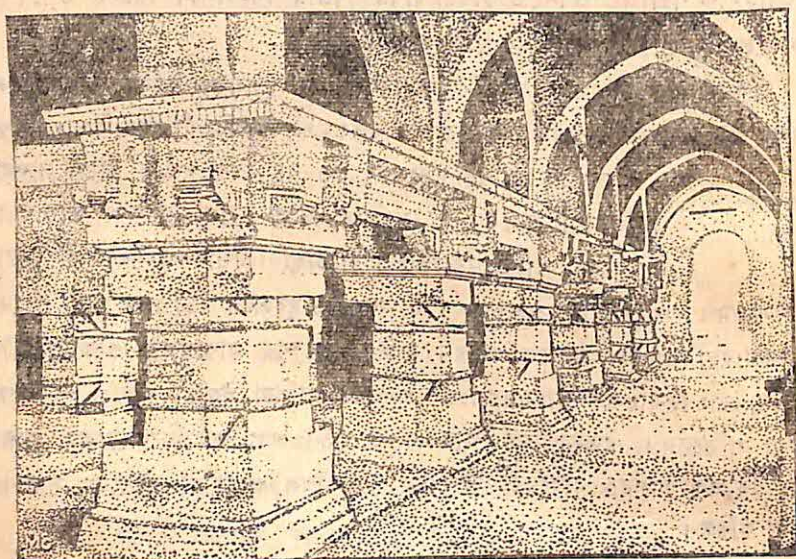
আদিনা মসজিদ

অধিপতি হন। নানা বিপর্যয় ও অশান্তি বাংলাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। অতঃপর হিন্দু ও মুসলমান প্রধানগণ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ নামে এক যোগ্য ব্যক্তিকে বাংলার সিংহাসনে বসাইলেন (১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)। হোসেন শাহী বংশের রাজত্বকালে শান্তি ও শৃঙ্খলার দিক দিয়া এবং আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি দ্বারা বাংলার অনেক উন্নতি হইল। ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হোসেনশাহী বংশ বাংলায় রাজত্ব করে।

বাংলার হোসেনশাহী বংশ

বাহ্মনী ও বিজয়নগর : প্রাদেশিক রাজ্যসমূহের মধ্যে বাহ্মনী ও বিজয়নগর এই দুইটি বৃহৎ রাজ্যের কাহিনী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় একই সময়ে ইহাদের উত্থান হয় এবং উভয়ের বিবাদ ও যুদ্ধ চলে পুরুষানুক্রমে। কৃষ্ণানদী ছিল এই দুটি রাজ্যের বিভাগ রেখা। ১৩৪৭ হইতে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাহ্মনী রাজ্যে মোট চৌদ্দজন সুলতান রাজত্ব করেন। অধিকাংশ সুলতানই হিন্দুধর্মদ্বেষী ও রক্তপিপাসু ছিলেন। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগেই

বাহ্মনী

বেরার, বিদর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং আহম্মদনগর এই পাঁচটি রাজ্যে বাহ্‌মনী সাম্রাজ্য ভাগ হইয়া গেল। বিজয়নগর রণকুশলী বাহ্‌মনীদের এবং এই সমুদয় রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে এবং বিজয়লক্ষ্মী দুই দলকেই সমান অনুগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে যে ইস্‌লাম এই সময় প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে নাই তাহার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিজয়নগরের প্রাপ্য। মুসলমান বাহ্‌মনী রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত হিন্দু বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গম বংশের দুই ভ্রাতা হরিহর ও বুক্ক। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে সমগ্র ভারত জুড়িয়া বিজয়নগর রাজ্য ছিল। রাজা বুক্কের দুই মন্ত্রী ছিলেন। দার্শনিক মাধব বিদ্যারণ্য এবং তাঁহার ভ্রাতা বেদ-সাহিত্যের অবিস্মরণীয় ভাষ্যকার সায়নাচার্য। বিজয়-

বিজয়নগর

নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা তুলুব বংশের কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ) যেমন বীর তেমনই সদাশয় ও পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু রাজকীয় গুণের আধার কৃষ্ণদেব রায় মধ্যযুগের ইতিহাসে অদ্বিতীয় পুরুষ।

যদিও তাঁহার মৃত্যুর পর বিজয়নগরের সে গৌরব আর রহিল না, তথাপি ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিজয়নগর একটি প্রবল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। এই বৎসরই তেলিকোটার নিকট এক যুদ্ধে সম্মিলিত মুসলমান (বেরার, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর ও বিজাপুর) শক্তির কাছে পরাজিত হওয়ায় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবসান হয় এবং রাজধানী বিজয়নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।
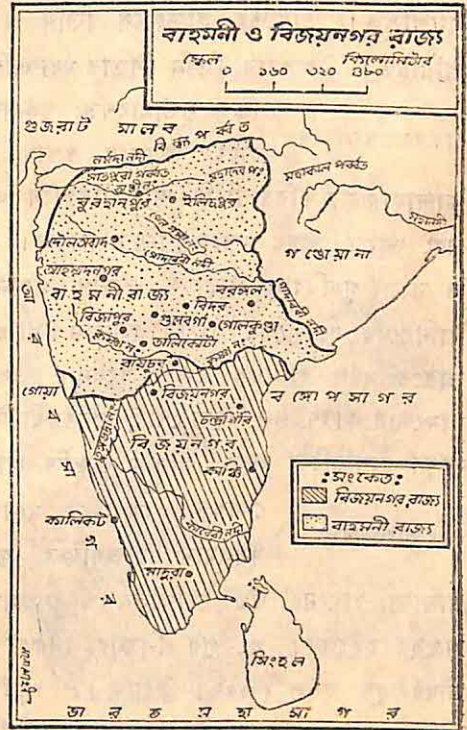
(খ) ভারতে মুঘল শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতনঃ

ভারতে মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর পিতার দিক দিয়া পূর্বোক্ত তুর্কী তৈমুর এবং মাতার দিক দিয়া মুঘলরাজ চেঙ্গিস খাঁর বংশোদ্ভূত। ভারতের ইতিহাসে তিনি ও তাঁহার সন্তানসন্ততি মুঘল নামে পরিচিত। কৈশোরে তিনি পিতার মধ্য এশিয়াস্থ ক্ষুদ্র রাজ্য ফরগনার রাজা হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইবার তিনি রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। অবশেষে প্রথমে কাবুল ও পরে (১৫২২ খ্রীষ্টাব্দ) কান্দাহার জয় করিয়া তিনি আফগানিস্থানে একটি নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ভারত জয়ের সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। দিল্লীর পাঠান লোদীবংশের দুর্বলতা ও তীব্র গৃহবিবাদ তাঁহাকে সুযোগ প্রদান করে। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে শেষ পাঠান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া ভারতে মুঘল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন তাঁহার বয়স ৪৩ বৎসর। তাঁহার সাফল্যের কারণ ছিল অদম্য শৌর্য, প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত বন্দুক, কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ও উন্নত সমর-কৌশল। মেবারের মহারাণা সঙ্গ বা সংগ্রামসিংহ দিল্লীর মুসলমান রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে হিন্দু রাজপুত সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেন। সুতরাং সংগ্রাম সিংহ বাবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ফতেপুর সিক্রীর নিকটে খানুয়ার প্রান্তরে রাজপুত-মুঘলে ভীষণ যুদ্ধ হইল (১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে)। পূর্বোক্ত কারণে সঙ্গ সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। অতঃপর বাবর পূর্বভারতে সম্মিলিত আফগান শক্তিকে রণক্ষেত্রে বিধ্বস্ত করিলেন। পশ্চিমে কাবুল হইতে পূর্বে বিহার এবং দক্ষিণে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বাবরের মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিল। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করেন, সুতরাং সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করিবার সুযোগ পান নাই; বাবরের পুত্র হুমায়ুন অনিশ্চয়তার মধ্যে দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। হুমায়ুনের নানা গুণ ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও উদ্যোগ-উৎসাহের অভাব এবং বিলাস ও আলস্য-প্রবণতা তাঁহার জীবনে বিপর্যয় ঘটাইল। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী, ভ্রাতা কামরান্ ছিলেন কাবুল কান্দাহারের অধিপতি। হুমায়ুন ঔদার্যবশত তাঁহাকে পঞ্জাবও দান করিলেন। গুরুতর প্রয়োজনের সময় প্রধানতঃ এই সমুদয় অঞ্চল হইতেই মুঘলদের সৈন্যসামন্ত এবং যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত হইত। কিন্তু

বাবরের প্রথম জীবন

উত্তর ভারত বিজয়

হুমায়ুন

কামরানের প্রতিবন্ধকতায় বিপদের সময় তিনি এই সমুদয় যোগাড় করিতে পারেন নাই। ফলে তিনি পাঠান শের খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

শের খাঁঃ শূরবংশীয় আফগান জায়গীরদার শের খাঁর আসল নাম ফরিদ খাঁ। একাকী একটি বাঘ মারিয়া তিনি বিহারের শাসক ও তাঁহার প্রভু বাহারখানের নিকট হইতে 'শের' উপাধি পান। নানা অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র নিজের শৌর্য, সাহস ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তিনি ভারতীয় আফগান প্রধানদের শীর্ষে উঠেন, এবং দুর্ভেদ্য চুনার দুর্গের বিধবা মালিকাকে বিবাহ করিয়া অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি শুধু সমগ্র বিহারে নহে, বঙ্গদেশের উপরও প্রাধান্য স্থাপন করেন। এইবার হুমায়ুনের টনক নড়িল। তিনি শের খাঁকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন, দীর্ঘকাল অবরোধের পর চুনার দুর্গ অধিকার করিলেন এবং বঙ্গের রাজধানী গৌড়ে বিজয় গৌরবে প্রবেশ করিয়া আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলেন। এই অবসরে অসামান্য রণকুশলী শের খাঁ বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে বিনা বাধায় অগ্রসর হইয়া চুনার অধিকার করিলেন এবং বিহার ও বারাণসী অধিকার করিয়া কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া হুমায়ুন তাড়াতাড়ি আগ্রার দিকে যাত্রা করিলেন। গঙ্গাতীরে চৌসা নামক স্থানে শের খাঁ তাঁহার পথ অবরুদ্ধ করিলেন এবং একদিন হঠাৎ আক্রমণে হুমায়ুনের সৈন্য পর্যুদস্ত করিলেন। হুমায়ুন গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন এবং এক ভিস্তির চামড়ার থলি বা মশকের সাহায্যে সাঁতার দিয়া পার হইলেন (১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

শের খাঁ

এই জয়ের ফলে শের খাঁ শেরশাহ্‌ উপাধি ধারণ করিয়া ভারতের সম্রাট হইলেন। হুমায়ুন তাঁহাকে হঠাইয়া দিতে আর একবার বৃথা চেষ্টা করিলেন। মুঘলের এই সঙ্কটে ভ্রাতা কামরানের সাহায্য চাহিয়াও তিনি পাইলেন না। পর বৎসর কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধে আবার পরাজিত হইয়া হুমায়ুন পলায়ন করিলেন। সিংহাসনে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া শেরশাহ পঞ্জাব হইতে বঙ্গ পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডের মালিক হইলেন।

শেরশাহ্‌ দিল্লীর সম্রাট

এই অদ্ভুতকর্মা পুরুষ একহাতে রাজ্য বিস্তার ও বিদ্রোহ দমন এবং অন্যহাতে সাম্রাজ্যে সংহতির ও শাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাত্র পাঁচ বৎসর তাঁহার শাসনকাল। রাজপুতানা জয় করিয়া ফিরিবার পথে কালঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে হঠাৎ গোলাবারুদের বিস্ফোরণের আগুনে দগ্ধ হইয়া তিনি মারা যান (১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ)। পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি শাসনকার্যের সমস্ত বিভাগে যে সমুদয় সংস্কার করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার শাসনের মূলমন্ত্র ছিল জনসাধারণের সর্ববিধ কল্যাণ-সাধন। সাম্রাজ্য ৪৭টি সরকারে এবং প্রতিটি সরকার আবার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত হইল। শাসনের দায়িত্ব সর্বনিম্নে গ্রাম হইতে থাকে থাকে উঠিয়া উর্ধ্বে কেন্দ্রীয় শাসনে পরিণতি লাভ করিল। বৃহৎ জালের মতো ছড়ানো এই ব্যবস্থার রজ্জুটি ছিল বিচক্ষণ শেরশাহের বলিষ্ঠ হস্তে ধৃত। তিনি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরীপ করাইয়া প্রত্যেক প্রজার জমির সীমানা ঠিক করিয়া দেন, এবং লিখিত পাট্টা ও কবুলিয়ত (ভোগের স্বীকার পত্র ও বিক্রয় বা দানের চুক্তিপত্র) প্রথার প্রবর্তন করেন। মোট উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ, কিম্বা এক-চতুর্থাংশ বিকল্পে তাহার আর্থিক মূল্য, রাজস্ব রূপে নির্ধারিত হইল। মুদ্রার ব্যাপক সংস্কার করাইয়া তিনি প্রচুর পরিমাণে সিক্কা তঙ্কার (টাকা) প্রচলন করিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও শৃঙ্খলা, যাতায়াতের জন্য বহু পথ নির্মাণ (গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তাঁহারই কীর্তি), বৃক্ষরোপণ, সরাই নির্মাণ, ঘোড়ার ডাক প্রচলন, সৈন্য বিভাগের ব্যাপক সংস্কার, ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচার প্রভৃতি বহু সংস্কার-মূলক কার্য তিনি সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা

রাজস্ব ব্যবস্থা

বস্তুত তাঁহার শাসনব্যবস্থাই মহামতি আকবরের এবং তাঁহার মাধ্যমে ভারতে ইংরেজ শাসনব্যবস্থার ভিত্তি বলা যাইতে পারে। শেরশাহ্‌ বুঝিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ একা হিন্দুর নহে, একা মুসলমানের নহে, উভয়েরই। তিনি খাঁটি মুসলমান, কিন্তু গোঁড়া বা সঙ্কীর্ণচেতা ছিলেন না। এখানেও তিনি

ইতিহাসে শেরশাহের স্থান

মহামতি আকবরের পূর্বসূরী। উত্তর কালের আকবরী আমলের ভিত্তি স্থাপন করেন শেরশাহ্।

দুর্ভাগ্যক্রমে শেরশাহের উত্তরাধিকারীদের কোন যোগ্যতা বা বিচক্ষণতা ছিল না। গৃহ বিবাদে তাঁহারা শক্তিক্ষয় করিতে লাগিলেন। এই সুযোগে পারস্যদেশে পলাতক হুমায়ুন তথাকার সম্রাটের সাহায্য পাইয়া কান্দাহার ও কাবুল জয় করিলেন এবং ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় গ্রন্থাগারের সোপান হইতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)। পঞ্জাবে কিশোর পুত্র আকবর সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হইলেন। হুমায়ুনের পলায়ন কালে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সিন্ধু প্রদেশে উমরকোটে আকবর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাবক হইলেন হুমায়ুনের বিশ্বস্ত অনুচর বৈরাম খাঁ। ওদিকে শেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র সম্রাট আদিলশাহের হিন্দু সেনাপতি ও মন্ত্রী হিমু, বিক্রমাদিত্য নাম লইয়া দিল্লী ও আগ্রার সিংহাসন অধিকার করিলেন ও আকবরের ও বৈরামের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। পানিপথ প্রান্তরে দ্বিতীয় বার এক যুগান্তকারী যুদ্ধ হইল (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)। বৈরামের বিচক্ষণতায় কিশোর সম্রাট আকবরের সম্পূর্ণ জয় লাভ হইল।

হুমায়ুনের সিংহাসন পুনরুদ্ধার

দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ ১৫৫৬

মহামতি আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ)ঃ প্রথমে বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব, পরে মাতা ও ধাত্রীমাতার প্রাধান্য—ছয় বৎসর কাল এই অসহনীয় অবস্থায় থাকিয়া ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর রাজ্য শাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজ্য বিস্তার ও সংহতির কার্য তাঁহার কিশোর কালেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং আকবরের সারা জীবন ভরিয়া চলিল। শেরশাহের প্রতিষ্ঠিত আফগান সাম্রাজ্য ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লুপ্ত হইল। তারপর তিন বৎসরের মধ্যে গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৌনপুর এবং ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র মালব এবং মধ্যপ্রদেশ বিজিত হইল। গণ্ডোয়ানার রাণী-রাজপুতানী দুর্গাবতী ও তাঁহার বীরপুত্র বীর বিক্রমে মুঘলকে বাধা দিতে গিয়া মৃত্যু বরণ করিলেন। রাজপুতদের বীরত্ব ও জাতীয় চেতনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ফলে আকবর এক নূতন রাজপুতনীতি ঘোষণা করিলেন—যদি রাজপুতরাজগণ তাঁহার সার্বভৌমত্ব মানিয়া লন তবে তিনি তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করিবেন না, উপযুক্ত মর্যাদায় সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করিবেন, আভ্যন্তরীন শাসনে এবং যার যার ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। মারবার, জয়পুর (অম্বর), বিকানির, বুন্দি প্রমুখ সকল রাজপুত রাজ্যের নরপতিগণ একে একে

রাজপুতনীতি

আকবরের এই সখ্যতা স্বীকার করিলেন। মুঘল দরবারে যোগ্যতানুসারে তাঁহারা উচ্চ পদ ও সম্মান লাভ করিলেন। অম্বর-রাজ মানসিংহ আকবরের মুঘল রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রধান সহায় হইলেন এবং কেহ কেহ আকবরের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করিলেন। কিন্তু রাজপুতানার শীর্ষস্থানীয় রাজ্য মেবার এই মিত্রতার নীতি অগ্রাহ্য করিল। সুতরাং স্বয়ং আকবরের অধিনায়কত্বে মুঘল সৈন্য মেবারের রাজধানী চিতোর অবরোধ করিল। রাজপুতেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও চিতোর রক্ষা করিতে পারিল না, কিন্তু তাহাদের সাহস ও বীরত্ব ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। উদয়সিংহ (সঙ্গের পুত্র) চিতোর ছাড়িয়া দুর্গম পাহাড়ের কোলে উদয়পুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ)

আকবর

মেবারের রাণা প্রতাপ

তাঁহার পুত্র রাজপুত বীরচূড়ামণি মহারাণা প্রতাপ সিংহ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আজীবন সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। হলদিঘাটের গিরিসঙ্কটে আকবরের রাজপুত সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে যে ভীষণ যুদ্ধ হয় তাহাতে প্রতাপ সিংহের অদ্ভুত শৌর্যবীর্য ও পরাক্রমের কাহিনী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। কিন্তু বিপুল মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে জয় লাভ করিতে না পারিয়া প্রতাপ মেবারে পর্বত ঘেরা অগম্য অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। অপরিসীম দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও প্রতাপ সিংহ স্বাধীনতা যুদ্ধ হইতে কখনও বিরত হন নাই। মৃত্যুর পূর্বে (১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) চিতোর ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল তিনি পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। স্বদেশের মুক্তির জন্য এইরূপ আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

গুণগ্রাহী আকবরও পরাজিত প্রতাপসিংহ, চিতোর দুর্গ রক্ষায় নিহত পুত্ত ও জয়মল্ল, এবং অন্যান্য রাজপুত বীরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আকবর আফগান শাসিত বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন (১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে), কিন্তু বাংলার চাঁদ রায়, কেদার রায়, ঈশা খাঁ এবং প্রতাপাদিত্য প্রমুখ বারো ভূঁঞা নামে পরিচিত স্বাধীন জমিদারগণ মুঘলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তারপরেও বহু বৎসর কাল উড্ডীন রাখিয়াছিলেন। গুজরাট, কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ, উড়িষ্যা, বেলুচিস্তান, কাবুল ও কান্দাহার—একে একে আফগানিস্তানসহ সমগ্র উত্তর ভারতের স্বাধীন অঞ্চলসমূহ আকবরের কাছে আত্মসমর্পণ করিল। অতঃপর নর্মদানদীর দক্ষিণের রাজ্যগুলি জয় করিতে আকবর উদ্যোগী হইলেন। আহম্মদনগরে অভিযান প্রেরিত হইল। রাণী চাঁদ সুলতানা বীরবিক্রমে বাধা দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরার প্রদেশ মুঘলকে দিয়া সন্ধি করিলেন। বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে এই বীর রমণী নিহত হইলেন ; উত্তর আহম্মদনগর মুঘলের শাসনে আসিল। দাক্ষিণাত্যে খান্দেশ রাজ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ আসিরগড়ের পতনের পর ওই রাজ্যটির অধিকার আকবরের শেষ অভিযানের ফল (১৬০১ খ্রীষ্টাব্দ)।

বঙ্গদেশ

রাণা প্রতাপ

ভারতবর্ষের রাজদণ্ড মুসলমানদের হাতে থাকায় হিন্দুদিগকে জিজিয়া কর ও তীর্থকর দিতে হইত। ধর্মপালনের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য নাগরিক অধিকারও হিন্দুর ছিল না। মন্দির ভাঙিয়া মস্‌জিদ নির্মাণ করা প্রায় সাধারণ নিয়মে দাঁড়াইয়াছিল।

বিজয়ী মুসলমান এবং বিজিত হিন্দুর মধ্যে অত্যাচারী রাজা ও উৎপীড়িত প্রজার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। আকবরের পূর্বে সাড়ে তিনশত বৎসর মুসলমান রাজত্বের ইহাই ছিল চিরন্তন ধারা। একমাত্র শেরশাহের রাজত্বেই অতি অল্পকালের জন্য ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। আকবর এই সকল অসাম্য ও তারতম্য ঘুচাইয়া দেন এবং জিজিয়া কর

আকবরের ধর্মনীতি ও ধর্মজীবন
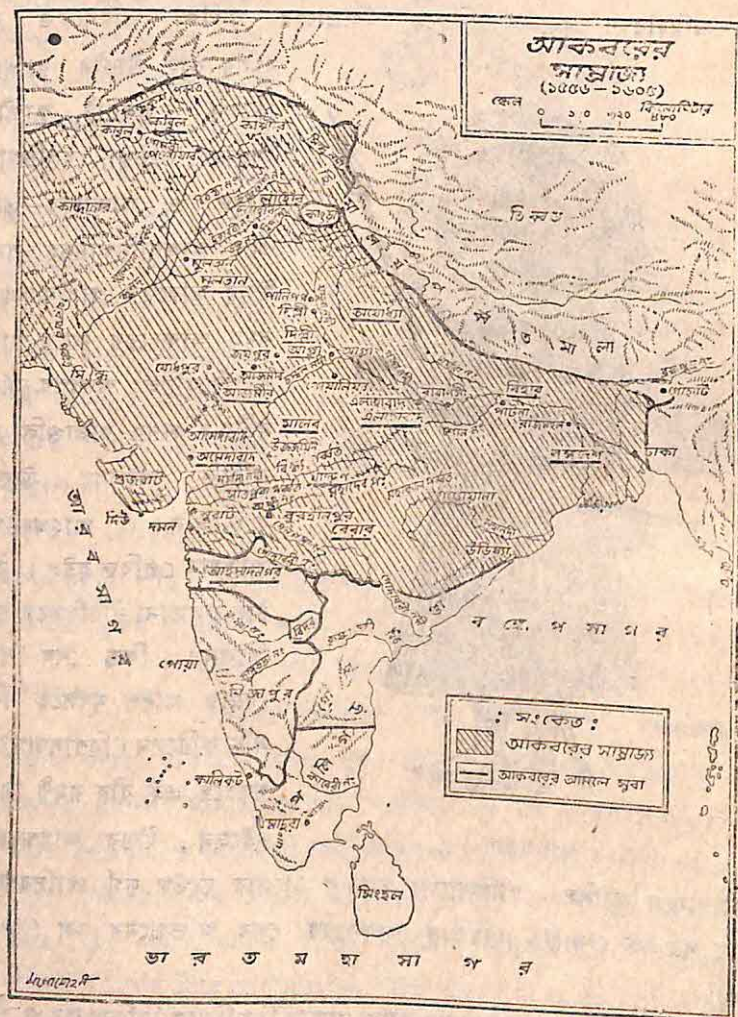
ও তীর্থকর প্রভৃতি বিলোপ করেন। মোটামুটি ভাবে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক একই নাগরিক অধিকার লাভ করিল। অসামান্য উদার ও

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ আকবর আফগান সম্রাট শেরশাহের আরব্ধ অসম্পূর্ণ নীতিকে শুধু বিধিবিধানে নহে, কার্যক্ষেত্রেও রূপ দিলেন। মুসলমান যুগে ধর্মমত-নিরপেক্ষ জাতীয় ভারতরাষ্ট্র গঠনের প্রথম প্রবর্তক সম্রাট আকবর। সুলহ্-ই-কুল (সর্বধর্মে শ্রদ্ধা) ছিল তাঁর ধর্মনীতি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন সুন্নি মুসলমান, কিন্তু ইসলামের উদার সুফি মতবাদের প্রভাবে তাঁহার জীবনদর্শন গড়িয়া উঠে। তৎকর্তৃক নির্মিত বিরাট দুর্গ ফতেপুর সিক্রীর ইবাদত-খানায় (পূজা বাড়ীতে) হিন্দু, জৈন, খ্রীষ্টান, পার্শী ও মুসলমান পণ্ডিতদের মতবাদ ও তর্কাদি দিনের পর দিন শ্রবণ করিয়া তিনি সকল ধর্মের যাহা মূলতত্ত্ব তাহাই গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে দীন্ ইলাহী নামে একটি নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ আবুল ফজল, ফৈজী, বীরবল প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত নূতন ধর্ম দীন্ ইলাহী হিন্দু ও মুসলমান কেহই গ্রহণ করে নাই।

দীন্ ইলাহী

এই ঔদার্য ও দূরদৃষ্টিকে ভিত্তি করিয়াই আকবরের শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। শেরশাহের নিকট কতকটা ঋণী হইলেও আকবরী শাসননীতির ব্যাপকতা, গভীরতা এবং কার্যকারিতা আকবরের নিজস্ব প্রতিভার পরিচায়ক। এই শাসনব্যবস্থা যে প্রচলিত একনায়কত্ব স্বৈরতন্ত্রের অনুগামী এবং ইহার স্থায়িত্ব ও উপকারিতা যে সম্রাটের বিচক্ষণতা ও সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আকবর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাদির সার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য এই যে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরেও ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক হিন্দুর মন্দির, ও হিন্দুর উপর পুনরায় জিজিয়া কর স্থাপন করা পর্যন্ত কার্যকর ছিল। ঔরঙ্গজেব যখন আকবরী ব্যবস্থার কাঠামোটি মাত্র বজায় রাখিয়া তাঁহার উদার মূলনীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিলেন, তখনই আরম্ভ হইল মুঘল শাসনের বিপর্যয়। আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী এবং অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আকবরের শাসনব্যবস্থা উত্তরকালে ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থার আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল। শত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী এই শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা আকবর সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে অনন্য হইয়া রহিয়াছেন।

শাসনব্যবস্থা

সবিস্তারে আকবরের শাসনব্যবস্থা বর্ণনা করার স্থান এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে নাই। কেবল সংক্ষেপে ইহার সারমর্ম দেওয়া হইতেছে। কেন্দ্রীয় শাসনের সকল ক্ষমতার উৎস ছিলেন সম্রাট নিজে, এবং তাঁহার অধীনে ছিলেন প্রধান মন্ত্রী, দেওয়ান বা উজীর ও বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, মীরবক্সী, খান-ই-সামান্, সদর-উস্-সুদার, মুহ্তাসিব, কাজী প্রভৃতি এবং আরও নানা শ্রেণীর সচিব ও কর্মচারীরা।

প্রাদেশিক শাসনও কেন্দ্রীয় আদর্শে গঠিত হইত। সমগ্র সাম্রাজ্য পনেরটি সুবায় বা প্রদেশে বিভক্ত হইল। প্রতি প্রদেশের কর্তা ছিলেন সুবাদার এবং তাঁহার অধীনে দেওয়ান প্রভৃতি কর্মচারী ছিল। বিজিত রাজপুত রাজ্যসমূহ অবশ্য স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিত। প্রতি সুবা কয়েকটি সরকারে এবং প্রতি সরকার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত ছিল ও প্রতি পরগণায় অনেক গুলি থানা, গ্রাম ইত্যাদি ছিল। গ্রামগুলি অনেক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিত। সর্বত্র রাজস্ব আদায়, বিচার ও শান্তি রক্ষার জন্য সরকারী কর্মচারিগণ নিযুক্ত হইত। সমর বিভাগকে আকবর মনসবদারি প্রথার ভিত্তিতে নূতন এক ব্যাপক রূপ দিলেন। দশজন সৈন্যের নায়ক হইতে হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার সৈন্যদলের নায়ক বা মনসবদার নিযুক্ত হইতেন। আকবরের প্রতিষ্ঠিত মুঘল শাসন ছিল আমলা-তান্ত্রিক শাসন। পরবর্তীকালে ভারতের ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় মোটামুটি এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহামতি আকবর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭) এবং শাহ্‌জাহান (১৬২৭-সিংহাসনচ্যুত ১৬৫৮, মৃত্যু ১৬৬৬)ঃ আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর ও পৌত্র শাহ্‌জাহানের রাজত্ব-কালে মুঘল গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বজায় ছিল। অবশ্য উভয়েই যোগ্য-তায় আকবরের চেয়ে অনেক ন্যূন ছিলেন। জাহাঙ্গীর নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতিতে ছিলেন আলস্য-পরায়ণ। মেবারের রাণা (প্রতাপের পুত্র) অমর সিংহকে তিনি পিতার নীতিতে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া-ছিলেন। জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা বেগম নূরজাহান অত্যন্ত ক্ষমতাশালিনী ও উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন। প্রকৃত শাসনকার্য তিনিই নির্বাহ করিতেন।

জাহাঙ্গীর

নূরজাহান

নূরজাহান

জাহাঙ্গীরের শাসনের শেষের দিকে যে অশান্তি সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার দায়িত্ব প্রধানত নূরজাহানের।

শাহ্জাহান

শাহ্জাহান খানিকটা অনুদার ও হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন বটে, কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শাসনের কাঠামো ও নীতি রক্ষা করিবার বিচক্ষণতা তাঁহার ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম ঔদার্য ও মনীষা সম্পন্ন দারার প্রভাবে তাঁহার শাসন সুশাসনই ছিল। তাঁহার উত্তর-পশ্চিম নীতির ব্যর্থতা মুঘল সাম্রাজ্যে পরে বিপদের কারণ হইয়াছিল। কান্দাহার মুঘলের হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) : শাহ্জাহানের শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখে অতিবাহিত হয়। তাঁহার চারি পুত্র ছিল। শাহ্জাহান তাঁহার অসুস্থতার কালে জ্যেষ্ঠ দারাকে সম্রাটের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর দারাই সম্রাট হইবেন ইহাই অবধারিত ছিল। ইহার বিরুদ্ধেই অপর ভ্রাতাদের বিদ্রোহ পরস্পরের মধ্যে গুরুতর গৃহ-যুদ্ধে পরিণত হয়। রাজনীতি ও কূটনীতিতে ধুরন্ধর তৃতীয় ভ্রাতা ঔরঙ্গজেব যুদ্ধে জয়ী হইয়া পিতার জীবিতকালেই সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬৫৮) এবং পিতাকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। বন্দী অবস্থায় শাহ্জাহানের মৃত্যু হয় (১৬৬৬)।

ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ

ব্যক্তিগত যোগ্যতায়, অনাড়ম্বর ও চরিত্র শুচিতায়, কঠোর পবিত্রতাবাদে এবং অনলস কর্মক্ষমতায় ঔরঙ্গজেব অতুলনীয়। কিন্তু তাঁহার অবিশ্বাস্য সন্দিগ্ধচিত্ততা এবং ধর্মান্ধতা এইসব গুণকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল। তিনি ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বিধর্মী হিন্দুকে ইস্লামের ছত্র-ছায়ায় আনিবার প্রচেষ্টাকে তিনি তাঁহার সকল রাজকার্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শ রূপে গ্রহণ করিলেন। এযাবৎ মুসলমান

শাসন ভারতে যাহা করিতে পারে নাই, সেই অসম্ভব কার্যেই তাঁহার সকল শক্তি নিয়োজিত হইল। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দুর উপর পুনরায় জিজিয়া কর চাপাইলেন। তিনি বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিলেন এবং প্রায় ব্রত পালনের মত নিষ্ঠায় বিপুল সংখ্যাধিক্য হিন্দু প্রজাকে ধর্মের কারণে নানা অত্যাচারে জর্জরিত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার অর্ধশতাব্দীকাল স্থায়ী রাজত্বকাল দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে (১৬৮১ পর্যন্ত) উত্তর ভারতে এবং দ্বিতীয় ভাগে (তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত, ১৭০৭) তাঁহার সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্র ছিল দাক্ষিণাত্যে।

রাজ্যজয়-মুঘল সাম্রাজ্য ভারত জোড়া

আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য আকবরের অনুসরণে মুঘল সাম্রাজ্যবাদের চরম উন্নতি তাঁহার আমলেই দৃষ্ট হয়। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্য পূর্ব-পশ্চিমে কাবুল হইতে চট্টগ্রামে এবং উত্তর-দক্ষিণে কাশ্মীর হইতে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এই রাজ্য-বিস্তৃতি এবং অতিকেন্দ্রিক শাসনের কুফলসমূহ ঔরঙ্গ-জেবের রাজত্বকালের দ্বিতীয় ভাগকে একেবারে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল। শরিয়তী (মুসলমান-ধর্মীয় আচার-বিচার সম্মত) শাসনের ফলে উত্তর ভারতে রাজপুতদের সক্রিয় সমর্থন এবং হিন্দুর সহযোগিতা লুপ্ত হইল। আকবরের প্রতিষ্ঠিত মুঘল শাসনের পরম নির্ভরযোগ্য স্তম্ভটি ভাঙ্গিয়া পড়িল। মেবারের রাণা রাজসিংহের নেতৃত্বে রাজপুতদের স্বাধীন

ঔরঙ্গজেব

হইবার জাতীয় প্রচেষ্টা, অন্যান্য বহু বিদ্রোহ এবং রাজনৈতিক সমস্যাদির সন্তোষজনক সমাধান কিংবা মূলোৎপাটন না করিয়াই তিনি দাক্ষিণাত্যে চলিয়া আসিলেন

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এবং মৃত ছত্রপতি শিবাজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন মারাঠা রাজ্যকে জয় করিতে। প্রথমে ঔরঙ্গজেব অবশ্য সাফল্য লাভ করিলেন। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন এবং শিবাজীর

দাক্ষিণাত্য নীতি

পুত্র ছত্রপতি শম্ভুজীকে বন্দী করিয়া চরম নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করিলেন (১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দ)। শম্ভুজীর নাবালক পুত্র ভবিষ্যৎ ছত্রপতি শাহুকে নিজ আয়ত্তাধীনে মুঘল

অন্তঃপুরে স্থান দিয়া ঔরঙ্গজেব মনে করিলেন, দাক্ষিণাত্য বিজয় পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু নেতৃত্ব-বিহীন হইয়াও নবজাগ্রত মারাঠাজাতি জীবন পণ করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘকালস্থায়ী যে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করিল তাহা দমন করা মুঘল সৈন্যের সাধ্যাতীত ছিল। ইহার ফলে চরম আর্থিক দুর্গতি এবং ব্যর্থতার কালিমায় ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যনীতিই তাঁহার জীবনের সাম্রাজ্যের সমাধি রচনা করিল। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌মদনগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। পরবর্তী চৌদ্দজন মুঘল সম্রাট ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নামে সম্রাট ছিলেন—কিন্তু এই দিল্লীশ্বরগণের রাজ্য ক্রমে দিল্লী ও চতুঃপার্শ্বস্থিত কয়েকটি গ্রামে সীমাবদ্ধ হইল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য শুধু ঔরঙ্গজেবকে একা দায়ী করা অনুচিত।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

রাজ্যের আমির-ওমরাহের মধ্যে তীব্র বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালেই প্রকট হইয়াছিল এবং তাহার সঙ্গে অপরাজেয় মুঘল সেনাদলের চারিত্রিক অবনতি ও যোগ্যতা হ্রাস পাইয়াছিল। ইহাদের সাহায্যে ঔরঙ্গজেবের এত বড় রাজ্যবিস্তারের কাহিনী তাঁহার ব্যক্তিগত যোগ্যতার পরিচায়ক বলিতে হইবে। কাবুল ও কান্দাহার স্বাধিকারে রাখিয়া আকবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহান কান্দাহার হারাইলেন। তাহার ফলে উত্তর-পশ্চিমের সিংহদ্বার বহিঃশত্রুর আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাদিরশাহ্‌ ও আহম্মদশাহ দুররানির আক্রমণকালে মুঘলের বাধা দিবার সুযোগ ও শক্তি আর রহিল না, এবং তাহা মুঘল পতনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সর্বোপরি ছিল পরবর্তী মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাটগণের বংশধরদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও তাঁহাদের অপদার্থতা। ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ যে শুধু অযোগ্য ছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই দুর্বলপ্রকৃতি, খামখেয়ালী, ব্যভিচারী, বিলাসী এবং গৃহবিবাদ-প্রবণ ছিলেন। এই সকল কারণ ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষের সহিত যুক্ত হইয়া মুঘলের পতন ঘটাইয়াছিল।

দশম অধ্যায়

ইস্‌লামী প্রভাবে ভারতীয় ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি

ভারতে ইস্‌লামী সংঘাত : মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ইস্‌লামের ধর্মমত দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে এই নূতন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এ পর্যন্ত গ্রীক, পারদ, শক, কুষাণ, হূণ, গুর্জর ইত্যাদি যত বিদেশীয় জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া এখানে বসবাস করিয়াছে, তাহারা সকলেই বিরাট হিন্দুসমাজে মিশিয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ কিন্তু হিন্দুসমাজে একেবারেই মিশিল না।

হিন্দুদের সহিত নানা-বিদেশীয় জাতির সম্মিলন

হিন্দু-মুসলমানের মৌলিক নীতি ও সম্বন্ধ : হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ ছিল। হিন্দুগণ বহু দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত, এবং নানা দেবদেবীর মূর্তি গড়িয়া ভক্তির সহিত পূজা করাই তাহাদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। মুসলমানরা হজরত মুহম্মদের ধর্মমত অনুসারে একমাত্র আল্লাহ্ বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত এবং তাঁহার কোন মূর্তি গঠন করা তাহাদের ধর্মে ঘোরতর পাপ বলিয়া গণ্য হইত। হিন্দুর দেবদেবীর মূর্তিকে তাহারা পুতুল মনে করিত ; সুতরাং হিন্দুদের মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করা ধর্মানুমোদিত কার্য বলিয়াই মুসলমানদের ধারণা ছিল।

হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মনীতি

সে যুগে হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ ধর্মমতে গভীর বিশ্বাস ছিল, এবং নিষ্ঠার সহিত ধর্মের নির্দেশ ও উপদেশ পালন করাই তাহারা জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। সামাজিক আচার-ব্যবহারও হিন্দুগণ ধর্মের অঙ্গরূপে গণ্য করিয়া চলিত। সুতরাং ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা মুসলমানদিগকে ম্লেচ্ছ বা যবন অর্থাৎ অপবিত্র জাতি বলিয়া গণ্য করিয়াছিল এবং এজন্যই ম্লেচ্ছদের সহিত পান, আহার, বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন তো দূরের কথা, তাহাদের দেহ স্পর্শ করাও হিন্দুগণ সযত্নে পরিহার করিত।

ধর্মমতে উভয় সম্প্রদায়ের নিষ্ঠা

সমাজ হিন্দুধর্মের অঙ্গ

ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ মনোভাব ও বিরুদ্ধ আচরণের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় এক দেশে নিকটবর্তী প্রতিবেশীরূপে বাস করিলেও, তাহারা পরস্পর সম্পূর্ণ

পৃথক্ হইয়াই ছিল,—তাহারা একসঙ্গে এক সমাজভুক্ত হইতে পারে নাই। কোন হিন্দু যদি মুসলমানের স্পৃষ্ট অন্নজল গ্রহণ করিত, তবে তাহার জাতি যাইত, অর্থাৎ হিন্দু সমাজে তাহার আর স্থান থাকিত না, বাধ্য হইয়া সে মুসলমান হইত। হিন্দু ধর্মের গণ্ডী হইতে বাহিরে যাইবার বহু পথ ছিল; কিন্তু একবার বাহিরে গেলে তাহার আর পুনঃ-প্রবেশের কোন উপায় ছিল না। যে কোন হিন্দু মুসলমান হইতে পারিত কিন্তু মুসলমান বা অহিন্দু কেহই হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে পারিত না। অন্যদিকে মুসলমানরা হিন্দু বা অমুসলমানকে ধর্ম গ্রহণ করাইবার রীতি ধর্মসঙ্গত ও সৎকার্য বলিয়াই বিবেচনা করিত।

ভারতের দুই সম্প্রদায়ের অবস্থা ও রাজনীতি

সুতরাং মুসলমানেরা যে কেবল হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক হইয়া রহিল তাহা নহে, তাহারা বহু হিন্দুকে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিল। তৎকালীন হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কারও এই ব্যাপারের জন্য বহু পরিমাণে দায়ী। হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর জাতিসমূহ অত্যন্ত দুঃখময়, হীন ও উপেক্ষিত জীবন যাপন করিত; কিন্তু তাহাদের অনেকে মুসলমান হইবামাত্র রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মুসলমান ওমরাহ্‌দের মত সামাজিক অধিকার লাভ করিত। একদিকে আদর্শ সাম্য ও মৈত্রীর ভাব মুসলমান সমাজে অনেকটা অনুসৃত হইত; অপরদিকে জাতিভেদের বহু শাখা-উপশাখায় বিভক্ত তৎকালীন হিন্দু সমাজে কৃত্রিম, হীন ও গ্লানিকর বৈষম্য কঠোর ভাবে বিরাজ করিত। সুতরাং দলে দলে হিন্দু যে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কারণ নাই। মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদিগকে বহু অসুবিধা, নির্যাতন ও অপমান সহিতে হইত। ইহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং বৈষয়িক সমৃদ্ধিলাভের আশায়ও বহু হিন্দুর মুসলমান হওয়ার প্রলোভন বড়ই অধিক ছিল। হিন্দু সমাজের নেতারা যে এই সামাজিক অধঃপতন ও বিপদের বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা কঠোর হইতে কঠোরতর সমাজ-শাসনের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া সমাজ রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হিন্দু সমাজের নিম্ন শ্রেণীর অবস্থা

মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদের অবস্থা

সংশ্লেষণের নানা পথ ঃ ভাষা, সাহিত্য, শিল্পাদি বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানের ভাবধারা কতকটা সম্মিলিত হইয়াছিল। বেশভূষা বিষয়েও ক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য দেখা দিল। ইবন্ বতুতা মুসলমান বিবাহের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মুসলমানরা অনেক হিন্দু-প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল। মৃতের প্রতি

উভয় সম্প্রদায়ের নানা বিষয়ে সাম্য

সম্মান প্রদর্শন এবং অন্যান্য সামাজিক আচার-ব্যবহারে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। সঙ্গীত, স্থাপত্যশিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়েও একের উপর অন্যের বহু প্রভাব দেখা যায়। সুতরাং ধর্ম ও সামাজিক ব্যবধান সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও মিলনের বন্ধন ধীরে ধীরে দৃঢ় হইতেছিল।

ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক বৈষম্য

হিন্দুগণের সংস্পর্শে ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে যে কতকগুলি গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইস্‌লাম ধর্মে মুসলমানদের মধ্যে কোন শ্রেণীভেদ বা জাতিভেদ ছিল না; কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সমাজের প্রভাবে কিছু কিছু সামাজিক বৈষম্য দেখা দিল। কোন সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলমান, বিশেষত তুর্কী, পাঠান, সৈয়দ বা শেখগণ সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের কন্যাকে বিবাহ করিত না; তাহারা প্রায় সকল বিষয়েই নিজদিগকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করিত।

স্ত্রীলোকদের পর্দা-প্রথা ও তৎসম্বন্ধে মতামত

ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সংস্পর্শের ফলেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে পর্দা-প্রথার উদ্ভব হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মুসলমানদের অনুকরণেই হিন্দু স্ত্রীগণের মধ্যে অবরোধ বা পর্দা-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। আবার কোন মুসলমান লেখক বলেন যে রাজপুতদের নিকট হইতেই মুসলমান সমাজ এই প্রথা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভারতের যে অঞ্চলে, অর্থাৎ দক্ষিণভাগে, কম পরিমাণে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত ছিল, বা অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল, সেই সেই অঞ্চলে স্ত্রীলোকের পর্দা-প্রথাও খুব কম ছিল।

খাদ্য-দ্রব্যাদি

পান খাওয়ার অভ্যাস, খাদ্যদ্রব্যে অতিরিক্ত মসলা ও লঙ্কা-মরিচের ব্যবহার ভারতের বাহিরে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন কম; কিন্তু ইহাতে ভারতীয় মুসমানদের যথেষ্ট আসক্তি ছিল। ভারতে যত রকমের ভোজ্যদ্রব্য ধনী মুসলমানদের প্রিয় ছিল, আরব, ইরাণ বা তুরস্কে তাহার প্রচলন ছিল না। ঐ সকল দেশের পোলাও, কোর্মা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যও ভারতে অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। শেষোক্ত খাদ্যদ্রব্যগুলি হিন্দুরাও বিশেষভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিয়াছে।

রাজপুত ও মুসলমানী আদব-কায়দা

মুসলমানরা রাজপুতদের অনুকরণে মাথায় চীর ও পাগ পরিত এবং রাজপুত মেয়েরা মুসলমানীদের অনুকরণে আঁটসাঁট পায়জামার উপর পেটিকোটের (petticoat) মতো ঢিলা কোঁচানো কাপড় ব্যবহার করিত। উত্তর-প্রদেশের অনেক স্থলে এখনও মুসলমানী কায়দায় আচকান প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত আছে। অনেক মুসলমানী আদব-কায়দাও হিন্দুরা গ্রহণ করিয়াছিল।

মুসলমানদের মধ্যে পুরুষরাও যে হাতে আংটি, গলায় হার ও কর্ণভূষণ ব্যবহার করিত, তাহা সম্ভবত হিন্দুদেরই অনুকরণের ফল; কারণ ইস্‌লাম ধর্মশাস্ত্রে এগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সূক্ষ্ম তূলার ও রেশমী বস্ত্রের প্রচুর ব্যবহারেও মুসলমানরা ভারতে আসিয়াই অভ্যস্ত হইয়াছিল।

অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি বিষয়ে হিন্দুদের অনুকরণ

ভক্তিবাদ ও সুফী মতবাদ : সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মবিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ সত্ত্বেও বহু বৎসর একসঙ্গে বসবাস করার ফলে অনেক বিষয়ে, বিশেষত ধর্মনীতিতে একে অন্যের উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। একদিকে হিন্দু ধর্মাচার্যগণ ভক্তিবাদ এবং অপর দিকে মুসলমান পীরগণ সুফী মতবাদ প্রচার করিয়া দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি ও সমন্বয় স্থাপনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। ধর্মের গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা বর্জন করিয়া সৃষ্টিকর্তা ভগবানের প্রতি গভীর প্রেম ও ভক্তি এবং ভগবৎসৃষ্ট সর্বশ্রেণীর মানুষকে প্রীতি ও প্রেমে আবদ্ধ করাই ছিল ইঁহাদের মূল উপদেশ। তাঁহারা প্রাদেশিক কথ্য ভাষায় মতবাদ প্রচার করিয়া সর্বস্তরের লোককে আকৃষ্ট করিতেন। সুফী মতবাদীদের মধ্যে দিল্লীর নিজামউদ্দিন আউলিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুধর্মের ভক্তি-বাদের মত তাঁহার সুফী মতবাদ প্রচারের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। আজমীরের খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তিও সুফী মতবাদ প্রচারের বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভক্তিবাদী ও সুফী মতবাদীদের অতি উদার নীতির ফলেই হিন্দু ও মুসলমানগণ উভয় সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসী, পীর ও ফকিরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। সত্যপীরের আরাধনা এইভাবেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক মুসলমান রাজা ব্রাহ্মণ ও জৈন সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে বিশেষ সম্মান দেখাইয়াছেন এবং ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়াছেন।

ধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা

মূল উপদেশ

ভক্তিবাদী ধর্মাচার্যগণ : সুফী মতবাদী পীরদের মত সুলতানী যুগের ভক্তিবাদী হিন্দু ধর্মাচার্যগণ উদার ধর্মনীতি প্রচার করিয়া দেশে সাম্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলে ভারতে এক নূতন ধর্মভাবের বন্যা বহিয়া গেল। ইহার প্রভাবে দেশের জনগণ ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতিতে বিশেষ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। এই নূতন ধর্মের প্রধান কথা—ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস, নৈতিক জীবন যাপনের আবশ্যকতা এবং জাতিভেদ ও জটিল পূজাপদ্ধতিতে অবিশ্বাস। এই তিনটি মত অবশ্য নূতন নহে; প্রথমটি ঋগ্‌বেদের সময় হইতে

ভারতে চলিয়া আসিয়াছে, এবং দ্বিতীয়টি ও তৃতীয়টি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের দুইটি প্রধান নীতি। কিন্তু দীর্ঘকাল ধর্মসম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদী হিন্দু ও মুসলমানগণ একত্র বসবাস করার ফলে এই ভাবগুলির মধ্যে নূতন শক্তির সঞ্চার হইল, এবং এই যুগের কয়েকজন প্রধান ধর্মাচার্য আবেগপূর্ণ ভাষায় এই সকল মতের প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে ভারতের সর্বত্র নূতন ধর্মনীতি প্রসারিত হইল, এবং তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত করিলেন। এইসকল ধর্মাচার্যগণের মধ্যে রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য, মীরাবাঈ, নামদেব ও নানক প্রধান।

ধর্মনীতি ও উহার বৈশিষ্ট্য

রামানন্দ—খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে বৈষ্ণব ধর্মের বিখ্যাত প্রচারক রামানন্দ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক স্থানে বসিয়া ভোজন করিতে পারিত। তিনি সমগ্র উত্তর ভারতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঈশ্বরের একত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিয়াছিলেন।

তাঁহার মূল নীতি

শ্রীচৈতন্য

কবীর—রামানন্দের এক শিষ্যের নাম কবীর; অনেকের মতে তিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন। বস্ত্রবয়ন দ্বারা তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। অতি সাধারণ কথায় এবং সুন্দর সুন্দর কবিতায় তিনি ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের চরম সত্যগুলি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানে তিনি কোনও ভেদ করিতেন না। তিনি বলিতেন—যিনি হিন্দুদের ঈশ্বর, তিনিই মুসলমানদের আল্লাহ্‌।

তাঁহার বৈশিষ্ট্য

চৈতন্য—বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের সংস্কার সাধন করেন বিখ্যাত চৈতন্যদেব। তিনি

বঙ্গদেশের অন্তর্গত নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। বাল্যকালে তাঁহার ডাকনাম ছিল নিমাই এবং ভাল নাম ছিল বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার নাম হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। চৈতন্যদেব যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার মূল কথা—একমাত্র ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস। তাহার প্রচারের ফলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। তিনি ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রভাব

মীরাবাঈ—মীরাবাঈ মেবারের রাজপুত রাণা কুম্ভের পত্নী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সম্ভবত ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে মারবার প্রদেশে এক রাঠোর সামন্তের গৃহে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ভগবৎপ্রেমে অধীর হইয়া তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তাঁহার ভক্তিমূলক ব্রজ ভাষার সঙ্গীতে নরনারীবৃন্দ ভক্তিরসে আপ্লুত হইত। এখনও তাঁহার বহু ধর্মসঙ্গীত সর্বত্র আদৃত হয়।

তাঁহার ধর্মসঙ্গীত

নামদেব—সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নামদেব মহারাষ্ট্রে ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি জাতিতে দরজী ছিলেন। ভগবানের প্রতি ভক্তি ও প্রেমই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, ইহার জন্য পূজাপার্বণের কোনই প্রয়োজন নাই,—ইহাই তাঁহার মতবাদ। হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার মতবাদ

নানক—অতি উদার মতবাদের উপরই নানক পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোককেই নিজের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিতেন। শিখগণ পরে এক বিশেষ শক্তিশালী সম্প্রদায়ে পরিগণিত হয়। একাদশ অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা

প্রাদেশিক মাতৃভাষা ও সাহিত্য ঃ সুলতানী যুগে ভক্তিবাদী ধর্মাচার্যগণ প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধান করিয়া দেশের আর একটি মহৎ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এই ধর্মপ্রবর্তকগণও তেমনি নিজ নিজ দেশের ভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়া ঐ সকল ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। রামানন্দ ও কবীরের প্রচারে হিন্দী ভাষা, চৈতন্যদেবের প্রচারে বাংলা ভাষা, নানকের প্রচারে পঞ্জাবের গুরুমুখী ভাষা, নামদেবের প্রচারে মারাঠী ভাষা এবং মীরাবাঈর ভক্তিমূলক সঙ্গীতে ব্রজ ভাষা অনেক উন্নতি লাভ

নানা প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি

করে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস নামে দুইজন বৈষ্ণব-কবি তাঁহাদের অতুলনীয় সঙ্গীত-রাজি দিয়া বিহার ও বঙ্গদেশের ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুগে মুসলমান রাজগণের দরবারে বাংলা ও মৈথিলী ভাষা বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল, এবং এই দুই ভাষার উন্নতির ইহাও একটি প্রধান কারণ। বাংলার দুইজন সুলতানের আগ্রহে বাংলা ভাষায় কৃত্তিবাস পণ্ডিত 'রামায়ণ' এবং মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ) 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও 'বিষ্ণুপুরাণ' অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের সুলতান হোসেন শাহ্ একাধিক বাঙালী কবির উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহাকে 'কলিযুগের কৃষ্ণ' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ্ মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বর দ্বারা মহাভারতের আরও একখানি অনুবাদ করান। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ শ্রীকর নন্দী দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতিও একাধিক মুসলমান সুলতানের উৎসাহ ও সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস

কৃত্তিবাস ও মালাধর বসু

হোসেন শাহের আমল হইতে নানা গ্রন্থ রচনা

চৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচারের ফলে বাংলা ভাষায় যে বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাহা মধ্যযুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। পদ্যে লিখিত বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 'শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' নামক দুইখানি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থে চৈতন্যের জীবনী', লীলাকলা, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে যাইয়া উপরি-উক্ত দুইখানি কাব্য ছাড়া অন্যান্য চরিত-গ্রন্থেও বৈষ্ণব ধর্মের ও ভক্তিবাদের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে বাংলার বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে জাত বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চৈতন্যের পরবর্তীকালে রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণনের জন্য যে সকল পদাবলী রচিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি খুব উচ্চাঙ্গের ভগবদ্‌-ভক্তি, ভগবানের প্রতি আত্মনিবেদন ও ভগবৎ-প্রেমের অতি উন্নত নিদর্শনরূপে বঙ্গসাহিত্যে চিরদিনই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের পদাবলী কীর্তন এখনও বাঙালী শ্রোতৃবৃন্দের মনে ভক্তিরসের উদ্রেক করে।

চৈতন্যের সময় হইতে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি

শ্রীচৈতন্যের পরে উচ্চাঙ্গের বঙ্গসাহিত্য

হিন্দু ও মুসলমানের সংস্রবের ফলে উর্দু নামে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল। এই ভাষার ব্যাকরণ হিন্দীর ন্যায়, কিন্তু ইহার শব্দগুলি আরবী, পারসী ও হিন্দী—এই তিন ভাষা হইতে গৃহীত। কবি আমীর খস্রু (মৃত্যুকাল ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ) হিন্দী ভাষার খুব আদর করিতেন এবং বহু হিন্দী শব্দ তিনি তাঁহার গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনিই উর্দু ভাষার পথ-প্রবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

উর্দু ভাষা

মুসলমানগণ ভারতে আসিয়া পারসী ভাষায় এক বিরাট ঐতিহাসিক সাহিত্য গড়িয়া তুলিলেন। হিন্দুগণ ইতিহাস রচনা করিতে ভালবাসিতেন না। বিরাট সংস্কৃত সাহিত্য অন্য সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ হইলেও ঐতিহাসিক গ্রন্থ উহাতে খুব কমই আছে। মুসলমানগণ কিন্তু ইতিহাস রচনা করিতে খুবই ভালবাসিতেন এবং তাঁহারা কয়েকখানা ভাল ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন।

ঐতিহাসিক সাহিত্য

স্থলতান নাসিরুদ্দিনের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক মীন্হাজউদ্দিন সিরাজ স্থলতানের নাম অনুসারে 'তবকৎ-ই-নাসিরি' নামক একখানা বড় ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতের বাহিরে বহু মুসলমান রাজ্যের ইতিহাসও দেওয়া আছে, এবং স্থলতান নাসিরুদ্দিনের রাজত্বকাল পর্যন্ত ভারতে মুসলমান যুগের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মীন্হাজ যেখানে তাঁহার ইতিহাস শেষ করিয়াছেন, জিয়াউদ্দিন বারনী সেইখান হইতেই তাঁহার ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মীনহাজউদ্দিন সিরাজ

মুঘল যুগে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব কবিগণ চৈতন্যের জীবনী এবং কড়চা ও পদাবলী রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করেন। চণ্ডীদেবী, মনসাদেবী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে রচিত মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী এবং রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ এই যুগের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি

কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামদাসের মহাভারত, মুকুন্দরামের কবিকঙ্কনচণ্ডী এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। মুসলমান কবি আলাওল হিন্দী 'পদ্মাবৎ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

বাংলা সাহিত্য

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দী সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। মালিক মুহম্মদ জ্যায়সীর রচিত 'পদ্মাবৎ' এই যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মেবারের রানী পদ্মিনীর কাহিনী

হিন্দী সাহিত্য

অবলম্বন করিয়া এই অপূর্ব দার্শনিক কাব্যখানি রচিত হয়। তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানস' কেবল সাহিত্য হিসাবে নহে, ধর্মগ্রন্থ হিসাবেও শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে। এখনও লক্ষ লক্ষ লোক এই গ্রন্থ ভক্তি সহকারে পাঠ করিয়া ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়। অন্যান্য হিন্দী কবির মধ্যে আগ্রার অন্ধ কবি সুরদাস সমধিক বিখ্যাত। তুকারাম ও রামদাসের রচনা এই যুগে মারাঠী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

মারাঠা সাহিত্য

মুঘল যুগে ফেরিস্তা, আবুল ফজল, বদাওনি ও মুহম্মদ হাসিম (খাফি খাঁ) এই চারিজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের উদ্ভব হইয়াছিল। প্রথম তিনজন আকবরের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন এবং চতুর্থজন ঔরঙ্গজেবের কালের ঐতিহাসিক। ফেরিস্তা নিজের সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের এক বিস্তৃত ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। আবুল ফজল তাঁহার 'আইন-ই-আকবরী' এবং 'আকবর-নামা' নামক দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থে আকবরের রাজত্বের এক বিশদ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। বদাওনি 'মুন্তখব-উৎ-তওয়ারিখ' নামক গ্রন্থে ভারতে মুসলমান রাজ্যের বিবরণ লিখিয়াছিলেন। ভীমসেন, ঈশ্বরদাস নাগর প্রভৃতি হিন্দুরাও পারসী ভাষায় সমসাময়িক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ফিরোজ শাহ্, বাবর ও জাহাঙ্গীর নিজেদের জীবনচরিত লিখিয়া ইতিহাসের উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন।

ঐতিহাসিক সাহিত্য

আত্মজীবনী

মুঘল যুগে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পারসী ভাষায় অনূদিত হয়। আকবরের আদেশে মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অনুবাদ হইয়াছিল। এই সঙ্কলন 'রজম-নামা' নামে পরিচিত। বদাওনি রামায়ণের অনুবাদ করেন। অথর্ববেদ, লীলাবতী নামক প্রসিদ্ধ গণিত বিষয়ক গ্রন্থ এবং জ্যোতিষ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থ ও পারসী ভাষায় অনূদিত হয়। সংস্কৃত গ্রন্থাদি ছাড়া গ্রীক ও আরবী ভাষায় লিখিত অনেক গ্রন্থও পারসী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সেকোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আরবী, পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং কয়েকখানি উপনিষদ্, ভগবদ্‌গীতা ও যোগবাশিষ্ট রামায়ণ পারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেই যুগে উর্দু ভাষাও বিশেষ উন্নত হইয়াছিল। মুসলমানদের মত বহু হিন্দুও পারসী ও উর্দু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ঐ ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

পারসী ভাষা

উর্দু ভাষা

মুঘল আমলে অনেক মুসলমান রমণী উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন এবং ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম প্রণীত 'হুমায়ুননামা' একখানি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ

স্থলতানী যুগের শিল্পকলা ঃ ভারতের স্থলতানগণ প্রায় সকলেই শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের সময় হইতে ইণ্ডো-সেরাসিনিক (Indo-Saracenic) অর্থাৎ ভারতীয় ও প্রাচীন মুসলমান শিল্পের সংমিশ্রণে এক বিশিষ্ট ধরনের শিল্পকলার উদ্ভব হইয়াছিল। এই যুগে বহু সুন্দর মস্‌জিদ ও সমাধি-সৌধ-নির্মিত হয়। খিলান ও গম্বুজ এই নূতন শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। দাস বা মামলুক বংশের রাজত্বকালে যে সমুদয় স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে আজমীরের মস্‌জিদ এবং দিল্লীর কুতুবমিনার, জামি মস্‌জিদ ও ইলতুৎমিসের সমাধি মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুতুবমিনার প্রায় ২৫৩ ফুট উচ্চ এবং ইহার গঠন-প্রণালী ও কারুকার্য খুবই সুন্দর। মস্‌জিদ-গুলির খিলান ও অন্যান্য কারু-কার্যে হিন্দু শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ প্রথম প্রথম মুসলমান স্থলতানগণ হিন্দু শিল্পীই নিযুক্ত করিতেন, এবং হিন্দু মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া তাহার উপাদান দিয়াই মস্‌জিদ নির্মাণ করিতেন। কুতুব মিনারের নিকটেই আলাউদ্দিন খিল্‌জী একটি সুদৃশ্য বৃহৎ তোরণ নির্মাণ করেন। ইহা আলাই দরওয়াজা নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে যে নূতন ধরনের খিলান ব্যবহৃত হয়, তাহাই পরবর্তী কালে মুসলমান শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রাধান্য লাভ করে। বিখ্যাত মুসলমান পীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগার আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে বিখ্যাত জমায়তখানা মস্‌জিদ নির্মিত হইয়াছিল।
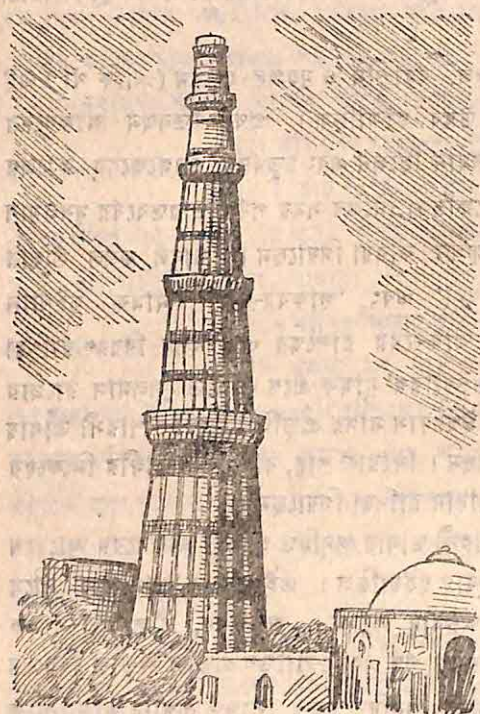
ইণ্ডো-সেরাসিনিক ও ভারতীয় শিল্পরীতি

কুতুব মিনার

স্থাপত্যের নানা নিদর্শন

ভারতীয় শিল্পরীতির প্রভাব

শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য

বাংলা, গুজরাট, জৌনপুর, বিজাপুর প্রভৃতি রাজ্যের মুসলমান এবং বিজয়নগরের হিন্দু রাজারাও দুই প্রকার শিল্পরীতির সংমিশ্রণে বহু সুদৃশ্য মস্‌জিদ ও মন্দির নির্মাণ করেন। বাংলা দেশের সুলতানগণ গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় যে বহু ইমারত নির্মাণ করেন তাহাদের মধ্যে পাণ্ডুয়ায় সুবৃহৎ আদিনা মস্‌জিদ, বড় সোনা মস্‌জিদ, ছোট সোনা মস্‌জিদ, কদম

গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইমারত
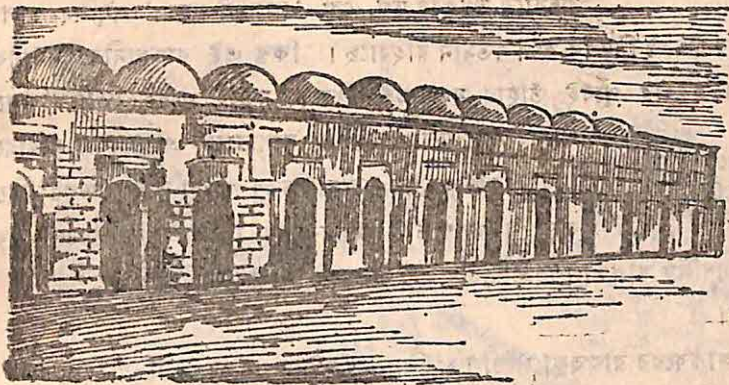
বড় সোনা মস্‌জিদ

রসুল মস্‌জিদ এবং দাখিল দরওয়াজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি বেশির ভাগই ইটের তৈয়ারী, এবং ইহাদের খিলান ও কার্নিস প্রভৃতিতে হিন্দু শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। জৌনপুরেও এক নূতন স্থাপত্য রীতির উদ্ভব হয়। অতাল দেবী মস্‌জিদ ইহার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই মস্‌জিদের গম্বুজ নূতন ধরনের। ইহার প্রাচীর ও স্তম্ভগুলিতে হিন্দু শিল্পের প্রভাব বর্তমান। গুজরাট এবং মালবেও অনেক সুন্দর প্রসাদ ও মস্‌জিদ নির্মিত হয়। গুজরাটের নূতন রাজধানী আহম্মদাবাদের হর্ম্যগুলিতে কাঠের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং পাথরের জালি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এখানকার অপর একটি বিখ্যাত জামি মস্‌জিদে ২৬০টি স্তম্ভের উপর ১৫টি গম্বুজ আছে। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান শিল্পরীতির সংমিশ্রণে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

জৌনপুরের স্থাপত্যরীতি

গুজরাট ও মালবের স্থাপত্য

তুঘলক সুলতানগণ যে শিল্পরীতির প্রবর্তন করেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রভাব হইতে মুক্ত। তাঁহাদের নির্মিত ইমারতগুলি খুব প্রকাণ্ড ও সুদৃঢ়, কিন্তু কারুকার্য অতিশয় সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত। দিল্লীতে ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলকের সমাধি-সৌধ এই নূতন রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

তুঘলক শিল্পরীতি

মুঘল যুগের শিল্পকলা ঃ শেরশাহ্ এবং মুঘল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ্জাহান দেশের নানা স্থানে বহু সুন্দর মস্জিদ, স্মৃতি-সৌধ, দুর্গ, প্রাসাদ ও নানাবিধ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

শেরশাহের শিল্পোন্নতি

শেরশাহ্ দিল্লীতে বিশাল দেওয়াল-বেষ্টিত একটি নূতন রাজধানী গঠনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন ; দেওয়ালের দুইটি তোরণ, 'পুরাণ-কেল্লা' নামক বর্তমানে ভগ্নপ্রায় দুর্গ, এবং 'কেল্লা-ই-কুহ্না' মস্জিদ স্থাপত্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন-রূপে বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এই রাজধানীর নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি বিহারের শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত সাসারামে এক বিস্তৃত সরোবরের মধ্যে একটি অত্যুচ্চ চতুষ্কোণ চত্বর গড়িয়া তাহার উপর নিজের জন্য যে সুশোভন সমাধি-সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্য শিল্পরীতির অপূর্ব মিশ্রণের নিদর্শন-রূপে এখনও সকলকে মুগ্ধ করে।

আকবরের উপর শিল্প প্রভাব বিস্তার

আকবরের রাজত্বকালে স্থাপত্য-শিল্প অতি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল, এবং এই যুগের স্থাপত্যে হিন্দু-পারসিক শিল্পরীতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি-ভবন, আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গে 'জাহাঙ্গীরী মহল' এবং বিশাল তোরণ 'দিল্লী-দরওয়াজা', লাহোরের প্রাসাদ দুর্গ প্রভৃতি দর্শকদের আকৃষ্ট করে। ফতেপুর সিকরীতে তিনি যে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানে বহু প্রাসাদ ও 'জামি মসজিদ', 'বুলন্দ দরওয়াজা,' 'পাঁচ মহল' প্রভৃতি তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। সিকান্দ্রায় তাঁহার সমাধি-সৌধ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে আগ্রায় নির্মিত নূরজাহানের পিতা ইতিমাদ্-উদ্দৌল্লার সমাধি-সৌধ স্থাপত্য-শিল্পের একটি চমৎকার নিদর্শন।

আকবরের সময়ে স্থাপত্য-শিল্পের বহু নিদর্শন

ফতেপুর সিকরীর নানা সৌধ

সিকান্দার সমাধি-ভবন

ইতিমাদ্-উদ্দৌলা

রাজপুত স্থাপত্য

শাহ্জাহানের সময়ে আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাশ্মীর, কান্দাহার, আজমীর প্রভৃতি নানা স্থানে অতি সুদৃশ্য বহু দুর্গ, সৌধ, মস্জিদাদি নির্মিত হইয়াছিল। শাহ্জাহান তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য আগ্রায় যমুনার তীরে যে অপূর্ব সমাধি-সৌধ 'তাজমহল' নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা মুঘল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-

শাহ্জাহানের সময়ে স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি

শিল্পের নিদর্শন ; পৃথিবীর অল্প কয়েকটি আশ্চর্য বস্তুর মধ্যে তাজমহলকেও গণ্য করা হয়। শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত এই অপূর্ব সুষমামণ্ডিত বিশাল সৌধ তিনশত বৎসর যাবৎ জগতের বিস্ময়স্থল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং ইহার অপরূপ সৌন্দর্য এখনও কবি, শিল্পী ও ভাবুকের মন মুগ্ধ করিতেছে।
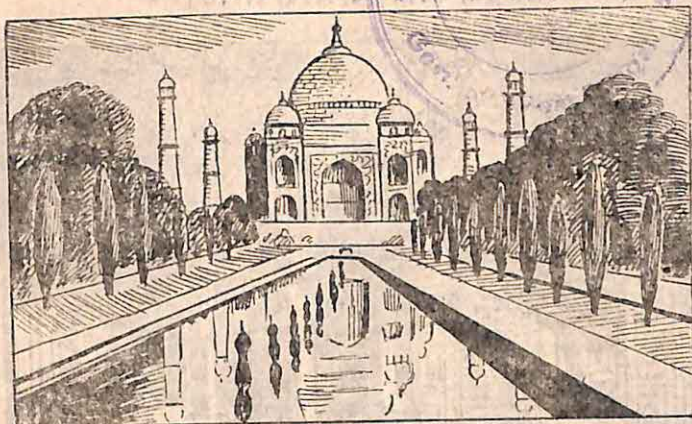
তাজমহল

তাজমহল

শাহ্‌জাহান দিল্লীতে এক নূতন নগরী নির্মাণ করেন। রক্তবর্ণ প্রস্তরের প্রাচীরে বেষ্টিত ইহার বিশাল দুর্গ লালকেল্লা এখনও দিল্লীর প্রধান দ্রষ্টব্য। ইহার মধ্যস্থিত 'দেওয়ান-ই-আম্‌' ও 'দেওয়ান-ই-খাস্‌', নিকটবর্তী 'জুম্মা মস্‌জিদ' এবং আগ্রা দুর্গে নির্মিত 'মতি মস্‌জিদ' শাহ্‌জাহানের অতি উন্নত শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দেয়। তাঁহার নির্মিত ময়ুর-সিংহাসনও শিল্পসৃষ্টির এক অপূর্ব নিদর্শন।

লালকেল্লা, জুম্মা ও মতি মস্‌জিদ

চিত্রকলা ঃ মুঘলযুগে চিত্র-বিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। পারসীক ও হিন্দু রীতির মিশ্রণে এক নূতন চিত্রশিল্পের উদ্ভব হয়। এই মুঘল চিত্রশিল্প বর্ণ-বিন্যাসে, অঙ্কন-রীতিতে ও দেহের সৌষ্ঠব প্রদর্শনে যে নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করে, তাহা সমগ্র শিল্পজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

মুঘল চিত্রকলা

সঙ্গীতকলা ঃ মুঘল যুগে সঙ্গীতকলাও অতি উন্নতি পর্যায়ে পৌছিয়াছিল। বিজাপুরের আদিলশাহী স্থলতানগণ এবং ঔরঙ্গজেব ছাড়া অন্যান্য মুঘল সম্রাট্গণ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। আবুল ফজল বলিয়াছেন, আকবরের সভায় ছত্রিশ জন উচ্চশ্রেণীর গায়ক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তানসেন। মালবের রাজা বাজ বাহাদুর সঙ্গীত-বিশারদ ও অতি উচ্চাঙ্গ শ্রেণীর হিন্দী গানের গায়ক ছিলেন। ইহাদের সঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করিয়া রাখিত।

মুঘল যুগে উন্নতি

তানসেন ও বাজ বাহাদুর
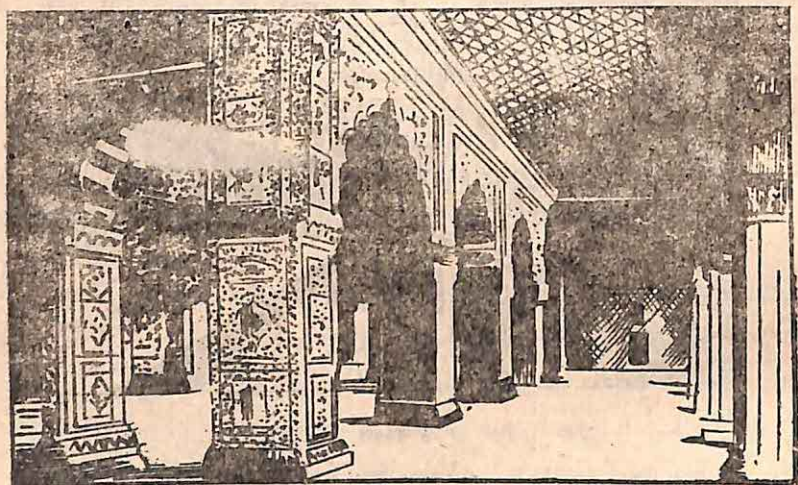
দেওয়ান-ই-খাস

আর্থিক অবস্থা ঃ মুঘল বাদশাহের ঐশ্বর্য ও রাজদরবারের আড়ম্বর ও জাঁকজমকের অন্ত ছিল না। বাদশাহের নীচেই ছিল ওমরাহ্ বা অভিজাত সম্প্রদায়। ইহাদের সংখ্যা কম থাকিলেও ইহারা বিশেষ বিশেষ সম্মান ও সুবিধার রধিকারী ছিল। সুবাদারগণ বাদশাহের মতই জীবন কাটাইত। ধন-সম্পদের অধিকাংশই এই সমুদয় উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ভোগ করিত, কিন্তু সাধারণ লোকের দারিদ্র্যের অবধি ছিল না। এইরূপে সমাজে সম্রান্ত ও সাধরিণ লোকের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান ছিল। সম্রান্ত লোকেরা অত্যন্ত বিলাসী ছিল এবং বিশাল প্রাসাদতুল্য ভবন, মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহারের আতিশয্য ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে বহু অর্থ

ওমরাহ্ ও সুবাদারগণ

সম্রান্ত, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ লোকদের অবস্থা ও রীতিনীতি

ব্যয় করিত। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ধনী ব্যবসায়ী ছিল। বাণিজ্য করিয়া তাহারা যে সম্পদ্ আহরণ করিত, তাহা বিলাসিতায় ও জাঁকজমকে ব্যয় করিত।

নগরের উন্নত অবস্থা ও নানা পর্যটকের মত

মুঘল যুগে ভারতবর্ষে অনেক বড় বড় নগর ছিল। ফিচ্ বলেন যে, আগ্রা ও ফতেপুর এই উভয় নগরই লণ্ডন হইতেও বড় ছিল, ইহাদের মধ্যবর্তী ব্যবধান ১২ মাইলের মধ্যে এত দোকানপাট, লোকজন ছিল যে, ইহাও শহরের মতই মনে হইত। মন্‌সেরেট নামে আর একজন পর্যটক বলেন যে, তাঁহার সময়ে (১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ) লাহোর ইউরোপ বা এশিয়ার কোন নগর হইতে ছোট ছিল না।

কৃষি প্রধান দেশ

ভারতবর্ষ তখনও কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। খাদ্যের উপযোগী শস্য ব্যতীত নীল, তুলা, তামাক ও রেশমের চাষ হইত। দেশে নানা রকম শিল্প ও ব্যবসা প্রচলিত ছিল। শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে চালান যাইত। বয়ন-শিল্প তখন খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বার্নিয়ার লিখিয়াছেন, বাংলাদেশে এত তুলা ও রেশমের কাপড় তৈরী হইত যে, তাহা কেবল সারা হিন্দুস্থান এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যের নহে, ইউরোপেরও অভাব মিটাইত।

বয়ন-শিল্পের উন্নতি ও বিদেশে রপ্তানি

ঢাকার মস্‌লিন বস্ত্র তখন জগদ্বিখ্যাত ছিল। পূর্ববঙ্গের অনেক গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। নানা রং ও চিত্রে ছাপান নানা রকম কাপড়, শাল, কার্পেট, পশমের কাপড় প্রভৃতিও বহু পরিমাণে প্রস্তুত হইত। কাশ্মীর, লাহোর এবং আগ্রা শাল ও কার্পেট তৈরীর প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই সকল মূল্যবান নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য ও তৈজসপত্রাদি বিদেশে বহু বিক্রীত হইত। বহু পরিমাণে সোরা প্রস্তুত হইত। বন্দুকের বারুদ তৈরীর জন্য ইহা ইউরোপে চালান যাইত। বিহার প্রদেশ ইহার প্রধান কেন্দ্র ছিল।

সোরা প্রস্তুত ও রপ্তানি

জল ও স্থলপথে বাণিজ্য বিস্তার

এদেশে জাহাজ তৈরী হইত এবং বণিকেরা সমুদ্রপথে দূরদূরান্তে অবস্থিত বিদেশেও বাণিজ্য করিত। সুরাট, ব্রোচ্, কাম্বে, গোয়া, কালিকট, কোচিন, মস্‌লিপত্তন, সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বন্দর বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্থলপথে লাহোর ও কাবুল এবং মুলতান ও কান্দাহারের মধ্য দিয়া ভারতের বাণিজ্যসম্ভার সুদূর পাশ্চাত্য দেশে প্রেরিত হইত।

জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপযোগী দ্রব্য—চাউল, গম, তরিতরকারী, দুধ, মাংস,

মাছ, মসলা প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যাইত এবং দাম খুব সস্তা ছিল। কিন্তু সেকালে সাধারণ লোকের আয় খুবই কম ছিল ; তবে তাহাদের খাওয়া-পরার তেমন কষ্ট ছিল না। দেশে মাঝে মাঝে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। তখন সাধারণ লোকের দুর্দশার সীমা থাকিত না, এবং বহুলোক অনাহারে মারা যাইত।

জনসাধারণের অবস্থা

একাদশ অধ্যায়

মারাঠা জাতির অভ্যুদয়—শিবাজী হইতে দ্বিতীয় বাজীরাও

ভারতের ইতিহাসে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান একটি স্মরণীয় ঘটনা। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে পর্বতমালা-বেষ্টিত দেশ মহারাষ্ট্র এবং ইহার অধিবাসীরা মারাঠা নামে পরিচিত। মারাঠাগণ মধ্যযুগে অনুন্নত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত থাকিলেও একনাথ, তুকারাম, নামদেব, বামন প্রভৃতি আচার্যদের ধর্মপ্রচারের ফলে তাহাদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক একত্ববোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। মহারাষ্ট্রের অধিকাংশই আহম্মদনগর ও বিজাপুরের সুলতানগণের অধীনে ছিল। শিবাজীর ন্যায় একজন বিশিষ্ট প্রতিভাশালী নেতার অভ্যুদয়ের ফলে মারাঠাগণ একতাবদ্ধ হইয়া এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইল।

শিবাজী (১৬২৭-১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ শিবাজীর পিতা শাহজী বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতানের অধীনে একজন বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার পুনা জায়গীরের অন্তর্গত শিবনের গিরিদুর্গে শিবাজীর জন্ম হয় (১৬৩০ মতান্তরে ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে)। তাঁহার মাতা জীজাবাঈ এবং অভিভাবক দাদাজী কোণ্ডদেব—এই দুইজনের প্রভাবে শিবাজীর মনে হিন্দু জাতীয়তার ভাব জাগিয়া ওঠে। বাল্যকাল হইতেই শিবাজী পুনা অঞ্চলের শক্তিশালী কৃষক মওলিগণের সহিত অবাধে মিশিতেন, এবং তাঁহার নেতৃত্বে এই ক্ষুদ্র দলটি নানারকম অস্ত্রশস্ত্র চালনায় ও সমর কৌশলে নিপুণ হইয়া উঠিল। একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের কল্পনা কিশোর বয়সেই শিবাজীকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি কতকগুলি কর্মদক্ষ ও বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে করিয়া তোরণ, পুরন্দর প্রভৃতি কয়েকটি গিরিদুর্গ অধিকার করিলেন (১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে)। তাঁহার

জন্ম ও প্রথম জীবন

পিতার জায়গীরের পশ্চিমভাগ তিনি পূর্বেই স্বীয় অধিকারে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সমুদয় একত্র করিয়া তিনি একটি ছোটখাটো রাজ্যের পত্তন করিলেন।

বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর কার্যকলাপে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন। অগত্যা শিবাজী চুপ করিয়া রহিলেন এবং কিছুদিন পরেই শাহজী মুক্ত হইলেন। অতঃপর শিবাজী জাওলি রাজ্য হস্তগত করিলেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীকে দমন করিবার জন্য বিজাপুরের সুলতান বহু সৈন্যসহ আফজল খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে পাঠাইলেন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে শিবাজীর প্রস্তাবে সন্ধির শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য শিবাজী ও আফজল খাঁ পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শিবাজী আফজল খাঁর নিকট গেলে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার ছলে আফজল খাঁ বাঁ হাতে শিবাজীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং খুব জোরের সহিত চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতের ছুরিকা দিয়া শিবাজীর পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন। কিন্তু তাঁহার গায়ের পোশাকের নীচে লৌহ বর্ম পরা ছিল সুতরাং আফজলের আঘাত ব্যর্থ হইয়া গেল। শিবাজীর বাঁ হাতের আঙ্গুলে লোহার তৈরী 'বাঘনখ' নামে কৃত্রিম নখ ছিল। শিবাজী তাহা দিয়া আফজলের পেট ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং লুকানো তীক্ষ্ণ ছুরি আফজলের বুকে বসাইয়া দিলেন। শিবাজীর অনুচরেরা আফজলের মাথা কাটিয়া ফেলিল। ইহার পরেই আফজলের সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল।* এইরূপে বিজাপুরের দিক হইতে ভয়মুক্ত হইয়া শিবাজী স্বাধীন নরপতির ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন।

ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন, তখনই শিবাজী মুঘল অধিকৃত প্রদেশে লুঠতরাজ করায় উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল (১৬৫৭ খ্রীঃ)।

ঔরঙ্গজেবের সহিত সংঘর্ষ

এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায়, ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করিবার সুযোগ পান নাই। ভ্রাতৃ-বিরোধের অবসান হইলে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীকে দমন করিবার জন্য ঔরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শিবাজীর হঠাৎ আক্রমণে শায়েস্তা খাঁ নিজের ডান হাতের একটি আঙুল হারাইয়া বহু কষ্টে প্রাণ লইয়া পুনা হইতে পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিবাজী স্বাধীন রাজা হইয়া বসিলেন। অবশেষে ঔরঙ্গজেব অম্বরের রাজপুত রাজা জয়সিংহ

* আফজল যে শিবাজীকে প্রথম আঘাত করিয়াছিলেন মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাহা স্বীকার করেন না। কোন্ পক্ষের কথা সত্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

এবং বিখ্যাত সেনাপতি দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। শিবাজী জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির শর্তে শিবাজী মুঘল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং মাত্র এগারোটি দুর্গ নিজের হাতে রাখিয়া বাকী সমস্ত দুর্গ ছাড়িয়া দিলেন। জয়সিংহের বিজাপুর অভিযানে শিবাজীও সাহায্য করিলেন। পুরস্কার-স্বরূপ ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে খেলাত অর্থাৎ সম্মান-সূচক পরিচ্ছদ পাঠাইলেন এবং আগ্রার রাজদরবারে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। দরবারে উপস্থিত হইয়া শিবাজী ঔরঙ্গজেবের ব্যবহারে নিজেকে অপমানিত বোধ করিলেন, এবং উচ্চকণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

শিবাজী

পরদিন শিবাজী দেখিলেন, তাঁহার বাসভবনের চতুর্দিকে মুঘল সৈন্য পাহারা দিতেছে—অর্থাৎ তিনি মুঘল সম্রাটের বন্দী হইয়াছেন (১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে)। শিবাজী ধূর্ততা অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছে। আরোগ্যের আকাঙ্ক্ষায় তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুড়িতে, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও ওমরাহ্‌গণকে নানাবিধ মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন। দ্বাররক্ষকগণ প্রথম প্রথম ঝুড়িগুলি পরীক্ষা করিত বটে, কিন্তু প্রত্যেকদিন একই জিনিস দেখিয়া যখন তাহারা পরীক্ষা করা ছাড়িয়া দিল, তখন একদিন এইরূপ দুইটি ঝুড়িতে উঠিয়া শিবাজী ও তাঁহার পুত্র পলায়ন করিলেন এবং দেশে ফিরিয়া গেলেন (১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

এইবার শিবাজী প্রবলভাবে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও মুঘল সম্রাট তাঁহাকে দমন করিতে পারিলেন না। সুতরাং ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে স্বাধীন রাজা বলিয়া মানিয়া নিতে বাধ্য হইলেন।

১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী রাজধানী রায়গড়ে মহাসমারোহে 'ছত্রপতি' উপাধি

গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং অনেক দুর্গ ও দেশ পুনরায় অধিকার করিলেন। মুঘল গৌরবরবি যখন সর্বোচ্চ শিখরে, তখন শিবাজীর এইরূপ সাফল্য ইতিহাসের একটি বিরল ঘটনা। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই বিজয়ী মারাঠা-বীরের বিচিত্র জীবনের পরিসমাপ্তি হয়।

"ছত্রপতি শিবাজী"

শিবাজীর শাসন প্রণালী ঃ শিবাজীর শাসন-নীতি অনুসারে রাজ্যরক্ষায় ও শাসন পরিচালনায় রাজা (ছত্রপতি) ছিলেন সর্বপ্রধান। আটজন মন্ত্রী বা "প্রধান" তাঁহাকে রাজকার্যে সহায়তা করিতেন এবং পরামর্শ দিতেন। প্রধান মন্ত্রীকে বলা হইত 'পেশোয়া'। শিবাজী তাঁহার রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেন। প্রত্যেক প্রদেশের ভার একজন শাসনকর্তার হস্তে ন্যস্ত ছিল।

প্রধানমন্ত্রী পেশোয়া

পদমর্যাদা অনুসারে সামরিক কর্মচারীরা নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অশ্বারোহী দলের কতককে বলা হইত 'বর্গীর', ইহারা রাজার নিকট হইতে অশ্ব ও নিয়মিত বেতন পাইত। বাকি অশ্বারোহী সৈন্যগণকে 'শীলাদার' বলা হইত। শিবাজী সৈন্যদলের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন। গেরিলা যুদ্ধ রীতি অর্থাৎ ত্বরিতগতি ও অতর্কিত আক্রমণই মারাঠা সেনাদলের প্রধান বিশেষত্ব ছিল। শিবাজীর শক্তির কেন্দ্র ছিল গিরিদুর্গগুলি। তাঁহার সামরিক বলের আর একটি অঙ্গ ছিল যুদ্ধ জাহাজ।

শিবাজী রাজস্ব-বিভাগের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সমস্ত জমি সযত্নে জরিপ করিয়া উৎপন্ন শস্যের পাঁচ ভাগের দুইভাগ অথবা মূল্য রাজকর বলিয়া ধার্য করিতেন। জমি কখনও ইজারা দেওয়া হইত না, এবং কৃষকগণের নিকট হইতে যাহাতে খাজনার উপর অতিরিক্ত আর কিছু আদায় না করা হয় রাজার সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

রাজস্ব বিভাগের সুবন্দোবস্ত

রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে শিবাজী তাঁহার রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত দেশসমূহ হইতে চৌথ (এক চতুর্থাংশ) ও সরদেশমুখী (এক দশমাংশ) নামে দুই প্রকার কর আদায় করিতেন। তাঁহার সৈন্যদলের লুণ্ঠন এড়াইবার জন্যই অন্য রাজারা এই দুই প্রকার কর দিতে স্বীকৃত হইতেন এবং ইহা হইতে মারাঠা রাজ্যের বিস্তর আয় হইত। শিবাজীর মৃত্যুর সময়ে শিবাজীর রাজ্য থানা জেলার অন্তর্গত কল্যাণ হইতে দক্ষিণে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইতিহাসে যে কয়জন কীর্তিমান পুরুষ বীরত্বে ও রাজনীতিক প্রতিভায় এবং একটি জাতির জন্মদাতা হিসাবে

চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, শিবাজী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার সর্বপ্রধান কীর্তি মারাঠা জাতিকে নবজীবন প্রদান। তাঁহার জাতীয় পতাকা ছিল ত্যাগের গৈরিক রঙ্গে রাঙানো। পরধর্মকে উৎপীড়ন করা দূরের কথা, তিনি ইহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। যে যুগে শিবাজী এই মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন ঠিক সেই যুগেই ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব হিন্দুধর্মের প্রতি চরম বিদ্বেষ বশতঃ হিন্দু মন্দির ধ্বংসে ব্যাপৃত ছিলেন। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতি এমন ভাবে সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর একশত পঁচিশ বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত মারাঠা জাতি ভারতের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত ছিল।

ইতিহাসে শিবাজীর স্থান

শিবাজীর পরে মারাঠা রাজ্য : শিবাজীর মৃত্যুর পর পুত্র শম্ভুজী ছত্রপতি হইলেন। শম্ভুজী শক্তিমান কিন্তু দুশ্চরিত্র ছিলেন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুজী মুঘল সৈন্যের হস্তে বন্দী হইয়া সমস্ত অনুচর সহ নিহত হইলেন। শম্ভুজীর শিশু পুত্র শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজীকে ঔরঙ্গজেব নিজের অন্তঃপুরে নজরবন্দী রাখিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শম্ভুজীর হত্যাতে মারাঠা শক্তি দমিত হইল না। শম্ভুজীর পর তাঁহার ভ্রাতা রাজারাম মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাজারামের মৃত্যু হইলে (১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার বিধবা পত্নী তারাবাঈ তাঁহার পুত্র তৃতীয় শিবাজীর প্রতিনিধিরূপে অতি যোগ্যতার সহিত মুঘলের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল-স্থায়ী জাতীয় যুদ্ধে অধিনায়কত্ব করিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত মারাঠাদের সহিত লড়িলেন, কিন্তু তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। তিনি মারাঠাগণকে 'পার্বত্য মূষিক' বলিতেন। ভারতজোড়া ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে এই পার্বত্য মূষিকের দলই ধ্বংস করিয়াছিল।

শম্ভুজী

রাজারাম ও তারাবাঈ

প্রথম তিনজন পেশোয়া : মারাঠাগণ ধীরে ধীরে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হইল। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শিবাজীর পৌত্র শাহু মুঘল সম্রাটের তত্ত্বাবধান হইতে মুক্ত হইয়া নিজের দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তারাবাঈ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ নামে একজন বিচক্ষণ মারাঠা ব্রাহ্মণের সহায়তায় শাহু তারাবাঈকে পরাজিত করিয়া ছত্রপতি হইলেন।

শাহু : শিবাজীর বংশের কর্তৃত্ব লোপ

পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ : শাহু বালাজী বিশ্বনাথকে পেশোয়ার পদে নিযুক্ত করিলেন (১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে)। বিচক্ষণ বালাজী বিশ্বনাথ অতি যোগ্যতার

সহিত দীর্ঘকাল স্থায়ী জাতীয় যুদ্ধ চালাইলেন। পরে গৃহবিবাদের ফলে যে অরাজকতা ও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অবসান করিয়া রাজ্যশাসনে পুনরায় শৃঙ্খলা ও শান্তি ফিরাইয়া আনিলেন। শাহু নামে ছত্রপতি রহিলেন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা বিশ্বনাথের হাতেই চলিয়া গেল। সাম্রাজ্যবাদী পেশোয়া বংশের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা।

পেশোয়া প্রথম বাজীরাওঃ ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বাজীরাও পেশোয়া হইলেন। বাজীরাও পেশোয়াগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম ছিলেন। মারাঠা ইতিহাসে শিবাজীর পরেই বাজীরাও-এর স্থান। শাহু এক দানপত্রের দ্বারা রাজকীয় সমস্ত ক্ষমতা বাজীরাও-এর হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। বাজীরাও পতনশীল মুঘলদের হস্ত হইতে সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া 'হিন্দুপদ পাদশাহী' প্রতিষ্ঠার বিরাট কল্পনায় মাতিয়া উঠিলেন। প্রথমে মালব, পরে গুজরাট মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। তারপর মারাঠাগণ রাজপুতানা আক্রমণ করিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিল। শীঘ্রই তাহারা বুন্দেলখণ্ড লুণ্ঠন ও জয় করিয়া যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইল। দিল্লীর মুঘল সম্রাট এ সবের অসহায় দর্শক মাত্র ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি তখন বাজীরাও-এর কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতেন। বাজীরাও-এর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী রাজ্য হায়দরাবাদের নিজাম মুঘল দরবারে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ভূপালের কাছে বাজীরাও-এর সঙ্গে তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল। নিজাম পরাজিত হইয়া বাজীরাও-এর শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

সমগ্র দক্ষিণ ভারতে এবং উত্তর ভারতে বহুদূর পর্যন্ত বাজীরাও-এর মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। রাজ্যের দূর প্রদেশগুলিকে শাসনাধীনে রাখিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, খাজনা ইত্যাদি রীতিমত আদায় করিবার জন্য বাজীরাও এই বিস্তৃত রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁহার এক-একজন সেনাপতিকে স্থাপিত করিলেন। এই নীতির ফলে সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়র, হোল্‌কারের ইন্দোর, ভোঁসলার নাগপুর এবং গাইকোয়াড়ের বরোদা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পেশোয়ার অধীনে পুনা রাজ্য লইয়া এইরূপে মারাঠা সাম্রাজ্য পাঁচটি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত হইল। কিন্তু এই পাঁচটি রাজ্যই বাজীরাও-এর কর্তৃত্ব মানিয়া চলিত।

পাঁচটি মারাঠা রাজ্যের উৎপত্তি

পেশোয়া বালাজী বাজীরাওঃ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশোয়া হইলেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনিই পিতার আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু বাজীরাও-এর বিচক্ষণতা বালাজীর

ছিল না। বিভিন্ন মারাঠা নায়কগণের মধ্যে তিনি সংহতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই সময় আফগানদের নেতা আহম্মদ শাহ্ ছুরানী (আবদালী) পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে আফগানিস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলে পেশোয়ার ভ্রাতা রঘুনাথের নায়কত্বে একদল মারাঠা সৈন্য আফগানদিগকে তাড়াইয়া পঞ্জাব অধিকার করিল (১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)। পরের বৎসরই আহম্মদ শাহ্ ছুরানী পুনরায় সম্পূর্ণ পঞ্জাব অধিকার করিলে, সেখানে মারাঠা অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মারাঠা সরকারের পক্ষ হইতে এক বিপুল সৈন্যদল প্রেরিত হইল। পেশোয়ার সতেরো বৎসর বয়স্ক পুত্র বিশ্বাসরাও এই সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। পরামর্শদাতা হইলেন সদাশিবরাও ভাও।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ঃ মারাঠা সৈন্য সহজেই দিল্লী অধিকার করিয়া পাণিপথে আহম্মদ শাহ্ ছুরানীর সৈন্যদলের সম্মুখীন হইল। মারাঠাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া রোহিলাগণ এবং অযোধ্যার শাসনকর্তা সুজাউদ্দৌলা আহম্মদ শাহের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেন। আফগান ও মারাঠা সৈন্যদল ঐতিহাসিক পাণিপথ প্রান্তরে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন (১৪ই জানুয়ারী ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ)। বহুক্ষণ যুদ্ধ হওয়ার পর মারাঠাদের জয়লাভের সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু বিশ্বাসরাও হঠাৎ আহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন, এবং অমনি সমস্ত মারাঠা সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইতে লাগিল। আফগানগণ মারাঠাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং যাহাকে পাইল তাহাকেই হত্যা করিল। বিশ্বাসরাও, সদাশিবরাও এবং প্রায় সমস্ত মারাঠা সেনাপতি ও প্রায় দুই লক্ষ মারাঠা সৈন্য নিহত হইল। এই যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। নিদারুণ পরাজয়ে উত্তর ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বিলীন হইল।

মারাঠাদের পরাজয়

সালবাই-এর সন্ধি পর্যন্ত মারাঠাদের সহিত উত্তরাঞ্চলের সংগ্রাম ঃ তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ) পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি দুর্বল হইয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় নাই। পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া বালাজী বাজীরাও ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার সপ্তদশ বর্ষীয় পুত্র মাধবরাও পেশোয়া হইলেন। এই অল্পবয়স্ক নূতন পেশোয়া পেশোয়া-বংশের পূর্বগৌরব ও শক্তি অনেক পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইলেন। তিনি মহীশূরের রাজা হায়দার আলিকে দুইবার পরাজিত করিলেন এবং ভোঁসলা যে সমস্ত জায়গা জোর করিয়া দখল করিয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করিলেন।

মারাঠাদের অবস্থা

পেশোয়া মাধবরাওর কৃতিত্ব

এই নবীন পেশোয়ার খুল্লতাত এবং অভিভাবক রঘুনাথ রাও তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন ; কিন্তু পেশোয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াও ক্ষমা করিলেন।

এইরূপে নিজের রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া এই নবীন পেশোয়া উত্তর ভারতে বিনষ্ট সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারে যত্নবান হইলেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা সৈন্য রাজপুত ও জাঠদিগকে পরাজিত করিয়া কর দিতে বাধ্য করিল। ইহার পর মারাঠাগণ দিল্লী অধিকার করিয়া শাহ্ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইল। তাহারা গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব প্রদেশ অধিকার করিয়া যখন অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড জয় করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর পেশোয়া মাধবরাওর মৃত্যু হওয়ায় তাহারা দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

মারাঠা সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধেও মারাঠা সাম্রাজ্যের যে ক্ষতি হয় নাই, মাধবরাওর মৃত্যুতে তাহা হইল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হইলে (ডিসেম্বর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ) খুল্লতাত রঘুনাথ রাওর চক্রান্তে তিনি নিজের প্রাসাদেই ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন (অগস্ট, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)। এই দুর্বৃত্ত রঘুনাথ তখন নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু নারায়ণ রাওর গর্ভবতী বিধবা পত্নী মাধবরাও নারায়ণ নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন (এপ্রিল, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ), এবং এই শিশুই প্রকৃত পেশোয়া বলিয়া ঘোষিত হইলেন। তাঁহার অভিভাবক এবং তাঁহার পক্ষে প্রধান নায়ক ছিলেন নানা ফাড়্নবিশ নামে এক ব্রাহ্মণ। ইহার মতো কূট-নীতিবিদ্ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি মারাঠা রাজ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না। মারাঠা নায়কগণের মধ্যে সিন্ধিয়া ও হোলকার মাধবরাও নারায়ণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গাইকোয়াড় পরিবারের কতক তাঁহার পক্ষে ও কতক রঘুনাথের পক্ষে রহিলেন।

মাধবরাওর মৃত্যু ও মারাঠারাজ্যে বিশৃঙ্খলা

রঘুনাথ রাওর চক্রান্তে নারায়ণ রাওর হত্যা

শিশু পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণের অভিভাবক নানা ফাড়্নবিশ

অশুভক্ষণে রঘুনাথ নিজের বলবৃদ্ধির জন্য বোম্বাইর ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য চাহিলেন এবং সল্সেটি দ্বীপ, বেসিন বন্দর এবং বোম্বাইর নিকটবর্তী আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিকার ইংরেজকে দিয়া সুরাটের সন্ধি করিলেন (৬ই মার্চ, ১৭৭৫)। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট রঘুনাথকে পেশোয়া পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন (১৭৭৮ খ্রীঃ)।

বোম্বাই গভর্ণরের সহিত রঘুনাথের সুরাটের সন্ধি

ব্রিটিশ সৈন্য পুনার কুড়ি মাইলের মধ্যে যাইয়া পৌঁছিলে একদল মারাঠা সৈন্য তাহাদিগকে প্রবল বাধা দিল। ব্রিটিশ সৈন্য অমনি পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল; কিন্তু মারাঠাগণ ওয়ারগাঁও নামক স্থানে তাহাদিগকে চারিদিক হইতে এমন করিয়া ঘিরিয়া ধরিল যে, অত্যন্ত অসম্মানজনক শর্তে সম্মত হইয়া ইংরেজদিগকে সন্ধি করিতে হইল (জানুআরি ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্য নিরাপদে বোম্বাইতে ফিরিয়া আসিবামাত্র বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এই অপমানজনক ওয়ারগাঁও সন্ধি অস্বীকার করিল এবং মারাঠাদের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। যখন বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত ইংরেজ সৈন্য আহম্মদাবাদ, বেসিন ও গোয়ালিয়রের দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করিল তখন সিন্ধিয়া নিজে ইংরেজদের সহিত পৃথক সন্ধি করিলেন এবং তাঁহার মধ্যবর্তিতায় ইংরেজ ও মারাঠা সরকারের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল (১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ)। এই সন্ধি সাল্‌বাই-এর সন্ধি নামে খ্যাত। ইহাতে ইংরেজগণ যত জায়গা অধিকার করিয়াছিল, প্রায় সমস্তই ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল এবং রঘুনাথ রাও বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন, এইরূপ স্থির হইল।

প্রথম মারাঠা যুদ্ধ ও ওয়ারগাঁওর সন্ধি

সন্ধি অস্বীকার

সাল্‌বাই-এর সন্ধি ও প্রথম মারাঠা যুদ্ধ শেষ

সালবাই-এর সন্ধির পরে মারাঠা রাজ্যসমূহের শক্তি ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই সময়কার মারঠা নায়কগণের মধ্যে মাহাদজি সিন্ধিয়া এবং নানা ফারনবিশ শক্তিশালী ও সুদক্ষ ছিলেন। উত্তর ভারতে মাহাদজি সিন্ধিয়ার বিস্তৃত রাজ্য ছিল, এবং এম.ডি. বয়েন নামক একজন ইউরোপীয় সেনাপতি কর্তৃক ইউরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত তাঁহার সৈন্যগণ ইংরেজ সৈন্যের সমকক্ষ ছিল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মাহাদজি সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে তাঁহার ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ইহার এক বৎসর পরে হোল্‌কার বংশের বিখ্যাত রানী অহল্যাবাঈ-এর মৃত্যু হয়। এই মহীয়সী মহিলা অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া ইন্দোর রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

মাহাদজি ও দৌলতরাও সিন্ধিয়া

অহল্যাবাঈ

মারাঠা শক্তির কেন্দ্রস্থল পুনাতে নানা ফারনবিশ শিশু পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণের নামে নিজেই মারাঠা রাজ্য শাসন করিতেছিলেন এবং মারাঠা রাজ্যের সীমানা তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শে সিন্ধিয়া, হোল্‌কার ও অন্যান্য প্রধান প্রধান মারাঠা শক্তি মিলিত হইয়া নিজামকে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে খর্দা নামক স্থানে গুরুতররূপে

নিজামের পরাজয়

পরাজিত এবং মারাঠাদের বশীভূত করে। কিন্তু নিজামের বিরুদ্ধে এই বিজয়ই মারাঠাদের শেষ বিজয়। ফারনবিশের কঠোর শাসন অসহ্য মনে করিয়া বালক পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণ আত্মহত্যা করিলেন। অমনি মারাঠা রাজ্য ষড়যন্ত্রে ছাইয়া গেল এবং নানা ফারনবিশ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অবশেষে রঘুনাথের পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফারনবিশ যখন পরলোকগমন করিলেন, তখন হইতেই মারাঠা রাজ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইল।

ফারনবিশের দুরবস্থা ও মারাঠা রাজ্যের প্রতিপত্তি হ্রাস

পেশোয়ার ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্বীকার: এই সময়ে রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা, নায়কদের ষড়যন্ত্র ও অন্তর্বিদ্রোহ প্রজাসাধারণের জীবন দুঃখ-দুর্দশায় দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তারিখে রাজধানী পুনার নিকট এক খণ্ডযুদ্ধে পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার মিলিত সৈন্যদলকে যশোবন্তরাও হেল্‌কার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। পেশোয়া পলাইয়া গিয়া ইংরেজদের আশ্রয় লইলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর পরাক্রান্ত মারাঠা জাতির নায়ক বেসিনের সন্ধিদ্বারা ব্রিটিশের অধীনতা গ্রহণ করিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যের সহায়তায় বাজীরাও পুনরায় সিংহাসন পাইলেন। কিন্তু অন্যান্য মারাঠা নায়কগণ বেসিনের সন্ধিপত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। বড়লাট ওয়েলেস্‌লি তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে অগস্ট মাসে তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

রাজ্যে অরাজকতা ও পেশোয়ার পরাজয়

বেসিনের সন্ধি ও ব্রিটিশের অধীনতা গ্রহণ

দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ: দাক্ষিণাত্যে ও উত্তরাপথে এক সঙ্গেই যুদ্ধ বাধিল। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ সৈন্যগণের নায়ক ছিলেন বড়লাটের ভাই সার্ অর্থার ওয়েলেস্‌লি। ইনি পরে ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আসাই-র যুদ্ধক্ষেত্রে (সেপ্টেম্বর, ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ) সিন্ধিয়া এবং আরগাঁও-এর যুদ্ধক্ষেত্রে (নভেম্বর, ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ) ভোঁসলা সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। উত্তর ভারতে সেনাপতি লেক দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লাসোয়ারীর যুদ্ধক্ষেত্রে সিন্ধিয়ার সেনাগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন (অক্টোবর ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ)। এইরূপে সিন্ধিয়া ও ভোঁস্‌লার পরাজয় ঘটিলে সুরজী অর্জুনগাঁও এবং দেবগাঁও-এর সন্ধিদ্বারা উভয়েই

আসাই, আরগাঁও এবং লাসোয়ারীর যুদ্ধ

'অধীনতামূলক মিত্রতা' গ্রহণ করিলেন (১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ)। সিন্ধিয়া রাজপুতানায় চম্বল নদীর উত্তরস্থ ভূখণ্ড, পশ্চিম ভারতের কয়েকটি স্থান ও দোয়াব প্রদেশ; ভোঁসলা উড়িষ্যার কটক ও বালেশ্বর প্রদেশ এবং মধ্যভারতের একটি রাজ্যাংশ ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। আহম্মদনগর ও বেরার নিজামের ভাগে পড়িল।

সিন্ধিয়া ও ভোঁস্‌লার 'অধীনতা-মূলক মিত্রতা' গ্রহণ

নির্বোধ হোল্‌কার এই সঙ্কটের কালে নিরপেক্ষ থাকিয়া এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথমে একদল ব্রিটিশ সৈন্যকে পরাজিত করিলেও পরে (১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে) ডীগের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পঞ্জাব অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ ও মারাঠা শক্তি বিধ্বস্ত: ব্রিটিশের অধীন হইয়া জীবন যাপন করায় পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মনে বিষম অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। তারপর ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন সন্ধি করিয়া লর্ড হেস্টিংস পেশোয়ার নিকট হইতে কোঙ্কন প্রদেশ এবং কয়েকটি দুর্গ কাড়িয়া লইলেন। দুর্দশার ভরা এবার পূর্ণ হইল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ছাব্বিশ হাজার সৈন্য লইয়া পেশোয়া পুনরায় নিকটবর্তী ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে (Resident) আক্রমণ করিলেন। কিরকীতে ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা তিন হাজারের অধিক ছিল না। কিন্তু তথাপি পেশোয়া গুরতর-রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন কবিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর নূতন সৈন্য আসিয়া ব্রিটিশ সৈন্যের দলবৃদ্ধি করিবামাত্র তাহারা পুনা অধিকার করিল। পেশোয়ার সৈন্য আবার আষ্টি নামক যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৮১৮)।

যুদ্ধের কারণ

কিরকীর যুদ্ধ ও পেশোয়ার পরাজয়

আপ্পা সাহেব ভোঁস্‌লা ও পোশোয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ফল একই হইল। ব্রিটিশ সৈন্য বিপুল মারাঠা বাহিনীকে সীতাবল্‌দি ও নাগপুরে সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত করিল (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ)। হোল্‌কারের সহিতও যুদ্ধ হইল। মাহিদপুরের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া হোল্‌কার ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন (ডিসেম্বর, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

ভোঁস্‌লা ও হোলকারের পরাজয়

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, আপ্পা সাহেব ভোঁসলা ও হোল্‌কার সকলেই ব্রিটিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। আপ্পা সাহেব সিংহাসনচ্যুত হইলেন, এবং

তাঁহার রাজ্যের যে অংশ নর্মদা নদীর উত্তরে অবস্থিত ছিল তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। এক নূতন রাজা ব্রিটিশের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ শাসন করিতে লাগিলেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কানপুরের নিকটস্থ বিঠুরে যাইয়া আবাস স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহার জন্য আট লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল। পেশোয়া পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। শিবাজীর এক বংশধর ব্রিটিশের অধীনে থাকিয়া ক্ষুদ্র সাতরা রাজ্যের রাজা হইলেন। হোল্‌কার বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যের উপর সমস্ত অধিকার ও দাবি ছাড়িয়া দিলেন। নর্মদা নদীর দক্ষিণে যে সমুদয় স্থান তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহা ইংরেজকে সমর্পণ করিলেন এবং 'অধীনতামূলক মিত্রতা' গ্রহণ করিলেন।

ভোস্‌লার পদচ্যুতি

পেশোয়ার পদ বিলুপ্ত

হোল্‌কারের অধীনতা স্বীকার

ভারতে মুসলমান রাজশক্তি ধ্বংস করিয়া হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠাঃ শিবাজীর মহান আদর্শের প্রেরণায় মারাঠা জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। পরবর্তী মারাঠা নায়কগণ তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং কেবলমাত্র নিজেদের শক্তিসম্পদ ও রাজ্যবৃদ্ধির দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া নূতন সাম্রাজ্যবাদের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। উত্তর ভারতে রাজপুতনা ও বঙ্গদেশের উপর অকথ্য অত্যাচারের ফলে তাঁহারা হিন্দুদের সহানুভূতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইলেন এবং মারাঠা শক্তির প্রতি হিন্দুদের মনে তীব্র অসন্তোষ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। শিবাজীর আদর্শ—হিন্দু-পদ পাদশাহী বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইল।

বিভিন্ন নায়কগণের মধ্যে মারাঠা শক্তি বিভক্ত হইয়া যে মারাঠা চক্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তীব্র কলহ ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়া কালক্রমে তাহা মারাঠার পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। গেরিলা যুদ্ধে মারাঠারা ছিল অত্যন্ত পারদর্শী। কিন্তু আহম্মদ শাহ আবদালি ও ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে তাহারা সে রণনীতি পরিত্যাগ করিয়া যথোপযুক্ত শিক্ষা এবং প্রস্তুতি ব্যতীতই আধুনিক যুদ্ধপ্রথা অবলম্বন করিতে গিয়া ব্যর্থতা বরণ করিল।

(২) শিখদের কাহিনী

গুরু নানকের পরে রণজিৎ সিং-এর মৃত্যু পর্যন্ত (১৫৩৮-১৮৩৯ খ্রীঃ)

নানক—মধ্যযুগের ধর্মাচার্যগণের প্রসঙ্গে নানকের (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) কথা

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অতি উদার মতবাদের উপরই নানক বিখ্যাত শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোককেই নিজের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিতেন।

শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা

শিখদের প্রধান ধর্মপুস্তক আদিগ্রন্থে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধু-সন্তগণের 'বচন' উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার একটি বচন এই :—

শিখদের আদিগ্রন্থ

"আমি হিন্দুর উপবাস বা মুসলমানের রমজান পালন করি না। আমি হিন্দুর মত দেবমূর্তি পূজা করি না, এবং মুসলমানের নমাজ পড়ি না। আমি হিন্দুর তীর্থে বা মুসলমানের মক্কায় যাই না। আমি কেবল আমার একমাত্র প্রভু ভগবানের আরাধনা করি, তাঁহারই শরণ লই এবং তাঁহার পায়েই আমার অন্তরের ভক্তি নিবেদন করি। আমি হিন্দুও নহি, মুসলমানও নহি, একজন সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি।"

নানক গাহিতেন : "মাথা মুড়াইলে, গায়ে ছাই মাখিলে এবং শঙ্খধ্বনি করিলেই ধর্মসাধন হয় না, দেহ ও মন পবিত্র রাখিতে পারিলেই প্রকৃত ধর্মসাধন।"—মধ্যযুগের হিন্দু ধর্মাচার্য ও মুসলমান সুফীদের ইহাই ছিল মূল আদর্শ, এবং ইহার ফলেই দেশ ধর্মনীতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ধর্মনীতি

নানকের পরবর্তী নয়জন গুরু : শিখ ইতিহাস প্রথমত এবং প্রধানত দশজন 'গুরুর' ইতিহাস। গুরু নানক তাঁহার শিষ্য অঙ্গদকে 'গুরু' মনোনিত করিয়া যান। গুরু অঙ্গদই নানক পন্থীদের একটি আলাদা সম্প্রদায়রূপে গঠন করেন। তৃতীয় গুরু অমর দাসের নেতৃত্বে শিখ ধর্ম-সম্প্রদায় নিজস্ব সামাজিক আচার ও আদর্শ নিয়া সুসংহত হইল। চতুর্থ গুরু রামদাস সর্বধর্মে শ্রদ্ধাবান মহামতি আকবরের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি ছিলেন। অমৃতসরে যে ভূমিখণ্ডের উপর বিখ্যাত স্বর্ণখচিত শিখ গুরুদ্বার বা মন্দির গড়িয়া উঠে, সে ভূমিখণ্ড আকবরেরই দান। রামদাস গুরুর পদমর্যাদাকে বংশগত করিয়া যান। পঞ্চম গুরু রামদাসের পুত্র অর্জনমল ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সংগঠক। তাঁহার 'গুরু গিরির' কালে শিখধর্ম সমগ্র পঞ্জাবে বিস্তার লাভ করিল। পূর্ববর্তী চারজন গুরুর কবিতাকারে উপদেশাবলী এবং হিন্দু ও মুসলমান সাধুদের নির্বাচিত বাণীসমূহ একত্রিত করিয়া অর্জন 'আদিগ্রন্থ' সংকলন করেন। পরে ইহাই শিখদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' নামে প্রসিদ্ধি

অঙ্গদ ও অমর দাস

চতুর্থ গুরু রামদাস

গুরু অর্জন

লাভ করে। গুরুদ্বারের ক্রমবর্ধমান ব্যয় নির্বাহ করিতে তিনি একটি স্থায়ী 'ধর্মীয় কর' শিখদের উপর ধার্য করেন। মসনদ্ পদবী ধারী একদল শিখের উপর এই কর আদায়ের ভার অর্পিত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খসরু যখন পঞ্জাবে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, তখন অর্জন তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং (কাহারও মতে) পাঁচ হাজার টাকা দিয়া সাহায্য করেন। রাজোচিত ঐশ্বর্যের অধিকারী এবং প্রভাবশালী অর্জনকে জাহাঙ্গীর পূর্ব হইতেই সন্দেহের চোখে দেখিতেন। খসরুকে সাহায্য করার অপরাধে জাহাঙ্গীর অর্জনকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিলেন। ইহার ফলে সমগ্র শিখ সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে একটি গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। তাহারা বুঝিল, ধর্মরক্ষা করিতে হইলে মুঘল রাজশক্তিকে বাধা দিবার মত সামরিক শক্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহার ফলে অর্জনের পুত্র ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায়কে যোদ্ধৃসম্প্রদায়ে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার পিতার অর্থদণ্ডের একাংশ দিয়া বাকী অংশ শোধ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বারো বৎসর গোয়ালিয়রে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। মুক্তিলাভের পর তিনি শাহ্জাহানের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার পরবর্তী সপ্তম ও অষ্টম গুরু হররায় ও হরকিষণের সময় বিশেষ কোন ঘটনা না ঘটিলেও শিখগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। নবম গুরু তেগ বাহাদুরের সময়ে ঔরঙ্গজেব শিখগণের বিরুদ্ধবাদী হইয়া তাঁহাকে রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী করেন এবং মুসলমান ধর্মগ্রহণ বা মৃত্যুবরণ করিতে আদেশ দেন। কিন্তু তেগ বাহাদুর মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হইয়া ঔরঙ্গজেবের হস্তে মৃত্যুবরণ করেন। ইহার ফলে শিখগণের মুসলমানবিদ্বেষ ও সামরিক উত্তেজনা ভীষণ বাড়িয়া যায়; এই সময়ে তেগ বাহাদুরের পুত্র দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখগণকে গুরুহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ় একতাসূত্রে বাঁধিলেন এবং তাহাদের সামরিক শক্তির ভিত্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি নিয়ম করিয়া দিলেন যে, কোন শিখই তামাক খাইতে পারিবে না, তাহাদিগকে দীর্ঘ কেশ রাখিতে হইবে, খাটো পাজামা পরিতে হইবে এবং লৌহ বলয়, ক্ষুদ্র ছুরিকা ও চিরুনি ধারণ করিতে হইবে। এই ধর্মসঙ্ঘের একতা ও ভ্রাতৃভাব দৃঢ় করিবার জন্য গুরুগোবিন্দ জাতিভেদ একেবারে উঠাইয়া দিলেন,

শিখগণ শক্তিশালী

নবম গুরু তেগ বাহাদুরের দুরবস্থা

দশম গুরু গোবিন্দের নূতন পদ্ধতি

একত্রে বসিয়া আহার তাহাদের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইল। এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের নাম হইল খাল্‌সা অর্থাৎ পবিত্র। গুরুগোবিন্দ আরও ব্যবস্থা করিলেন যে, অতঃপর শিখদের কোন গুরু থাকিবে না, শিখদের আদিগ্রন্থই গুরুর স্থান অধিকার করিবে। গুরুগোবিন্দ ১৬৭৫ হইতে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গুরুর আসনে আসীন ছিলেন এবং শিখদিগকে শক্তিশালী করিয়া এক বলিষ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ জাতিরূপে গড়িয়া তুলিলেন। কৃপাণ-সঞ্চালনে পবিত্র বারি ছিটাইয়া সকলকে দীক্ষা দিলেন—ইহাই পাহুল নামে পরিচিত। নবদীক্ষিত শিখদের নাম হইল খালসা (পবিত্র), সকলের পদবী হইল সিং বা সিংহ। পূর্বোক্ত কেশ, কাঙ্গা (চিরুনি), কৃপাণ, কচ্ছ (পায়জামা) এবং কারা (ইস্পাতের বালা) এই পঞ্চ 'ক' সকল শিখের অপরিত্যাজ্য অলংকার হইল। প্রত্যেককে শপথ নিতে হইল যে, তাহারা যুদ্ধে কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না; দুঃস্থ এবং দুর্ভাগাদের তাহারা সর্বদাই সাহায্য করিবে। এই ভাবে অতীতের নিরীহ ধর্মভীরু এক কৃষিজীবী সম্প্রদায় অত্যাচারী মুসলমান শাসকের অত্যাচার হইতে স্বধর্মরক্ষার তাগিদে একটি দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হইল। গুরু গোবিন্দ সিংহ পঞ্জাবের অত্যাচারী মুঘল সরকারের বিরুদ্ধে অসামান্য শৌর্যের সহিত নবমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ খাল্‌সা সৈন্য নিয়া শিখের ধর্ম ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী নদীর তীরে একজন মুসলমান আততায়ীর গুপ্ত ছোরার আঘাতে তাঁহার দেহাবসান হইল (১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ)। মৃত্যুর সময় তিনি শিষ্যদের বলিয়াছিলেন,—"ভগবানের হাতে তোমাদের সঁপিয়া দিলাম; সর্বদা তাঁহার আশ্রয়ে থাকিও, গুরুর শিক্ষা মানিয়া চলে এমন পাঁচজন শিখের মিলন ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত রহিয়াছি জানিবে। 'গ্রন্থ সাহেবকে' মানিয়া চলিবে, গ্রন্থ সাহেব গুরুর আত্মার প্রতীক; গ্রন্থ সাহেবের শ্লোকের মধ্যে আমি সর্বদাই বিরাজমান।"

খাল্‌সা

শিখ খাল্‌সা

শিখ দুর্ধর্ষ সামরিক জাতি

গুরু গোবিন্দ সিং-এর কৃতিত্ব

বান্দা

গুরু গোবিন্দের শিষ্য বান্দা গুরুর অসমাপ্ত কার্যের ভার বলিষ্ঠহস্তে তুলিয়া লইলেন। তিনি গুরু গোবিন্দের শিশুসন্তানদের নির্মম হত্যাকারী ওয়াজির খাঁকে নিহত করিয়া সরহিন্দ দখল করেন। ক্রমে শতদ্রু হইতে যমুনা পর্যন্ত রাজ্যখণ্ড শিখপ্রধান বান্দার অধীনে গেল। স্বাধীন রাজার মত তিনি নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন। ঔরঙ্গজেবের পুত্র সম্রাট বাহাদুর শাহ্ বান্দার এই ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করিলেন না। তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া নেওয়া

হইল। কিন্তু বান্দা গা ঢাকা দিয়া শিখ বাহিনীদ্বারা অসম সাহসিকতায় গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া মুঘলের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিতে লাগিলেন। তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন ফররুখশিয়ার। অবশেষে গুরুদাসপুর গড়ে বান্দা অনুচরদের সহ মুঘলদের হাতে ধরা পড়িয়া দিল্লীতে নীত হইলেন। প্রথমে বান্দার শিশুপুত্রকে পিতার সম্মুখে হত্যা করা হইল। তারপর বান্দাকে মত্ত হস্তীর পদতলে পিষ্ট করা হইল (১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

বান্দার পর শিখদের ইতিহাস

বান্দার মৃত্যুর পরও শিখ জাতির সামরিক শক্তি দমিত হইল না। নানকের বাণী এবং গোবিন্দ সিংহের প্রেরণা প্রত্যেক খালসা সৈনিককে মানের জন্য প্রাণ দিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ওদিকে পারস্য সম্রাট নাদির শাহের আক্রমণে মুঘল শাসন পঞ্জাবে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। শিখগণ এই অরাজকতার ও বিশৃঙ্খলার পূর্ণ সুযোগ লইল এবং ইরাবতী নদীর ধারে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করিয়া লাহোর-এর উপকণ্ঠে লুণ্ঠন কার্য চালাইল। পরবর্তী অভিযানকারী আহমদশাহ দুররানি পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের বিধ্বস্ত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিয়া নিশ্চিন্তে গৃহে ফিরিলেন। শিখ-জাতি এই সুযোগে পঞ্জাবে আবার তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিল। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে দুররানি শিখ জাতির ধ্বংস সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া পঞ্জাবে আবার অভিযান করিলেন। লুধিয়ানার কাছে এক খণ্ডযুদ্ধে তিনি বারো হাজার শিখ মারিয়া ফেলিলেন। তবুও যুদ্ধ জয়ের কোন ফল দুররানি লাভ করিতে পারিলেন না। বার বার অভিযানে ব্যর্থ হইয়া ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ধর্ষ দুররানিকে স্বীকার করিতে হইল যে; আইনত যাহাই হউক না কেন আসলে পঞ্জাব তাঁহার নহে, পঞ্জাব শিখদের। পশ্চিমে আটক, পূর্বে সাহারাণপুর, উত্তরে জম্মু ও কাংড়া এবং দক্ষিণে মুলতান—এই বিস্তীর্ণ এলাকায় শিখ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ব্যাপিয়া এই স্বাধীনতা-যুদ্ধ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মারাঠা জাতির জনযুদ্ধকেও ম্লান করিয়া দেয়।

শিখ শৌর্য

শিখদের 'গুরু' নাই, রাজা নাই, রাষ্ট্র নাই, ঘোড়ার উপর জিন তাহাদের বাসগৃহ। বিধ্বংসী বন্যার স্রোতে (অর্থাৎ নাদির ও দুররানির অভিযান সমূহের প্রকোপে) মুঘল প্রতিষ্ঠা ভাসিয়া গেল, কিন্তু খালসা সংঘ অটল রহিল। দুররানি একবার নাকি মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'যতদিন শিখদের এই ধর্মোন্মাদনা থাকিবে ততদিন তাহারা অপরাজেয়।" গুরু গোবিন্দ সিংহের মন্ত্র ও প্রেরণা শিখদের এই অপূর্ব ইতিহাসের রচয়িতা।

রণজিৎ সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) : যদিও শিখরা অমৃতসরে মিলিত হইয়া শিখ সম্প্রদায়ের নামে বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তবুও তাহারা তখন বারোটি মিস্‌ল অর্থাৎ ছোট ছোট দলে বিভক্ত ছিল। এই বিচ্ছিন্ন দলগুলিকে একতাবদ্ধ করিয়া একটি শক্তিশালী শিখ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই রণজিৎ সিংহের সর্বপ্রধান কীর্তি। রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ একটি শিখ মিস্‌লের নায়ক ছিলেন। তিনি অপরাপর কয়েকটি শিখ মিস্‌লের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যু ঘটে। তখন রণজিতের বয়স মাত্র দশ বৎসর। ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আফগানিস্থানের আমির জমান শাহ পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া ইহার কতকাংশ অধিকার করেন। বালক রণজিৎ নানা ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করায় জমান শাহ্‌ তাঁহাকে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, এবং পরে 'রাজা' উপাধি দেন। ইহার কিছুকাল পরেই রণজিৎ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, এবং ক্রমে ক্রমে শতদ্রু নদীর পশ্চিমে অবস্থিত সমুদয় শিখ মিস্‌ল তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ইউরোপীয় সামরিক কর্মচারীর সাহায্যে রণজিৎ তাঁহার সেনাদলকে সুশিক্ষিত করেন এবং পরাক্রান্ত শিখ সৈন্যদল গঠন তাঁহার অপূর্ব কীর্তি। তাঁহার এই বিখ্যাত খাল্‌সা সেনাবাহিনী শৌর্যবীর্য ও রণকৌশলে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সৈন্যদল পরবর্তীকালে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে যে বীরত্ব, সাহস ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছিল তাহাতে সমগ্র ভারত বিস্মিত হইয়াছিল।

শিখগণ নানা দলে বিভক্ত

রণজিৎ সিংহ

রণজিতের প্রথম জীবন

স্বাধীনতা লাভ ও শক্তি বিস্তার

শতদ্রু নদীর পূর্বদিকের অধিবাসী শিখ-নায়করা সর্বদা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিত। তাঁহাদের একজনের অনুরোধে রণজিৎ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা অধিকার করিলেন (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু ঐ শিখ-নায়কগণের কেহ কেহ রণজিতের বিরুদ্ধে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর (১৮০৭-১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ) নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে মিণ্টো মেট্‌কাফকে রণজিতের সভায় দূত প্রেরণ করিলেন। তখন অমৃতসরের সন্ধি দ্বারা রণজিতের সহিত ব্রিটিশ সরকারের স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ)। রণজিৎ শতদ্রুর পূর্বদিকস্থ শিখ-নায়কগণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, এর ফলে ঐ সকল শিখ-নায়ক ব্রিটিশের অধীন হইয়া গেল। এইরূপে বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে ব্রিটিশ রাজ্যের সীমানা শতদ্রু পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

ইংরেজের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন

লর্ড মিণ্টোর সহিত সন্ধি করিবার পর রণজিৎ সিংহ পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার করিতে না পারিয়া উত্তরে কাংড়া ও কাশ্মীর, পশ্চিমে সিন্ধুতীরবর্তী অ্যাটক ও পেশোয়ার এবং দক্ষিণে মুলতান জয় করেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্থানের রাজা শাহ্‌ সুজা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে রণজিৎ তাঁহার নিকট হইতে জগদ্বিখ্যাত কোহিনুর হীরকখণ্ড আদায় করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুকালে শিখ রাজ্য সিন্ধু হইতে শতদ্রু পর্যন্ত সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশ এবং পেশোয়ার, কাংড়া ও কাশ্মীর জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। তিনি তাঁহার দৃঢ় ও বলিষ্ঠ শাসনক্ষমতায় বিচ্ছিন্ন শিখ সম্প্রদায়কে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেন।

রাজ্যবিস্তার

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতে ইউরোপীয় জাতিসমূহের অনুপ্রবেশঃ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতাঃ ইংরেজ জাতির সাফল্য—বণিক বৃত্তির মাধ্যমে রাজনীতিক প্রভুত্ব স্থাপনঃ

সূচনাঃ—ভারতের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রচলিত বহু কাহিনী আবহমান কাল ধরিয়া নানাদেশের বণিকদের প্রলুব্ধ করিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপ যখন মধ্য যুগের কূপমণ্ডুকতা হইতে মুক্ত হইয়া উদার পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তখন স্বভাবতই এই বৃহৎ দেশ ভারতবর্ষ তাহাকে আকৃষ্ট করিল। সে যুগ সমুদ্রপথে ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগ। ইতালি, স্পেন ও পর্তুগাল—এই তিনটি ইউরোপীয় দেশের নাবিকগণ এই কাজে অগ্রণী ছিল। ব্যবসা করিয়া ধনী হইবার লোভ, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উৎসাহ এবং সমুদ্রের অপর পারে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এই সবই ছিল উহাদের এই অসম সাহসিক প্রয়াসের প্রধান প্রেরণা। পশ্চিম ইউরোপীয় রাজ্যসমূহের নরপতিগণ ছিলেন এই প্রয়াসের পৃষ্ঠপোষক। অবশেষে বহু আয়াসে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া পর্তুগীজ ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন (১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দ)। ইউরোপ হইতে ভারতে আসিবার সামুদ্রিক জলপথ উন্মুক্ত হইল। বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতভূমিতে বিভিন্ন পাশ্চাত্য জাতির সংঘর্ষ ইংরেজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় শেষ হইল। বণিক ইংরেজের মানদণ্ড অবশেষে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল।

পর্তুগীজ অধিকারঃ পর্তুগীজগণই ভারতে প্রথম বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। ভারত-সমুদ্রে বাণিজ্যের মাধ্যমে তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইতে লাগিল। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া তাহাদের অধিকারে আসিল। পশ্চিম উপকূলের গোয়াকে কেন্দ্র করিয়াই তাহাদের ভারতে রাজ্য বিস্তার আরম্ভ হইল। পূর্ব উপকূলে হুগলী ও চট্টগ্রাম ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে তাহাদের উপনিবেশ ও বাণিজ্যঘাঁটিতে পরিণত হইল। পর্তুগীজরা ছিল ভীষণ ধর্মান্ধ রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। তাহারা শুধু জিনিসপত্র ব্যবসার নামে লুঠ করিত না, তাহারা ছিল চরম অত্যাচারী জলদস্যু। হিন্দু, মুসলমান পুরুষ এবং নারীদের জোর করিয়া বাঁধিয়া এবং অনাথ শিশুদের

অপহরণ করিয়া 'ক্রীতদাসের' ব্যবসা চালাইত। সম্রাট জাহাঙ্গীর পর্তুগীজ জল-দস্যুদের একবার কঠিন শাস্তি দিয়াছিলেন। তারপর সম্রাট শাহ্‌জাহনের সুবাদার কাশিম খাঁ বঙ্গে পর্তুগীজদের প্রধান ঘাঁটি হুগলী অবরোধ করিয়া দখল করিলেন। চার হাজার পর্তুগীজবন্দী আগ্রায় প্রেরিত হইল। দক্ষিণবঙ্গ পর্তুগীজ অত্যাচারে প্রায় শ্মশান হইয়াছিল। বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ এবার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পর হইতেই পর্তুগীজদের ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাইতে লাগিল। কেবল ভারতের গোয়া, দমন ও দিউ—এর তিনটি অঞ্চলে পর্তুগীজ আধিপত্য চারিশত বৎসরের অধিক-কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ভারত স্বাধীন হইবার পর (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে) এই স্থানগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মুঘল বাহিনীর সহিত সংঘর্ষ

ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি—১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন ইংরেজ বণিক মিলিয়া একটি বণিক সংঘ গঠন করিল। তাহার নাম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিন এই কোম্পানি ইংলণ্ডের স্বনামধন্যা রাণী এলিজাবেথের অনুগ্রহে পূর্বদেশে বাণিজের একচেটিয়া অধিকার লাভ করিল। দুই বৎসর পরে আসিল হল্যাণ্ডের ওলন্দাজ বণিকেরা। তারপর ডেনমার্কের দিনেমারগণ, এবং সর্বশেষে আসিল ফরাসী কোম্পানি (১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ)। ভারত যেন লুটের বাজারে পরিণত হইল। দিনেমারগণ অবশ্য এদেশে কোন সুবিধা করিতে পারে নাই। বাংলার শ্রীরামপুরে তাহাদের একটি বাণিজ্যকুঠি ছিল। পরে ইংরেজ উহা কিনিয়া নেয়। ইংরজ এবং ফরাসীর পূর্বেই ভারতে ওলন্দাজের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। ওলন্দাজগণ প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টান, সুতরাং রোমান ক্যাথলিক পর্তুগীজদের শত্রু। জাহাঙ্গীর পর্তুগীজদের দমন করিতে গিয়া ওলন্দাজদের সাহায্য পাইয়াছিলেন। ওলন্দাজগণ ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ জুড়িয়া বৃহৎ সামুদ্রিক সাম্রাজ্য স্থাপন করিল। পর্তুগীজদের হটাইয়া দিয়া তাহারা ভারতের অভ্যন্তরে কালিকট, সুরাট, কোচিন, চুঁচড়া, কাশিমবাজার, পাটনা প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। তারপর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ওলন্দাজ ও ইংরজের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রাধান্য লইয়া সংঘর্ষ চলে। কখনও কখনও এই সংঘর্ষের ফলে যুদ্ধ হয়। তারপর ধীরে ধীরে ওলন্দাজ প্রাধান্য ভারত হইতে লোপ পাইল। ইংরাজ রাজদূত স্যার টমাস রো-এর চেষ্টায় জাহাঙ্গীরের অনুমতি লাভ করিয়া বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ বণিকগণ কুঠি স্থাপন করিল। ইহাদের মধ্যে

ওলন্দাজ-পর্তুগীজ দ্বন্দ্ব

ওলন্দাজ-ইংরেজ দ্বন্দ্ব

সুরাটই ছিল প্রধান। পূর্বাঞ্চলে ইংরেজের সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় পর্তুগীজদের সঙ্গে। পরে (১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) একটি চুক্তির মাধ্যমে পর্তুগীজরা ইংরেজের বাণিজ্যাধিকার স্বীকার করিল। ইংরেজ নরপতি দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগীজ রাজকুমারীকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ এখন যে স্থানটি বোম্বাই নগরী—সেই স্থানটি পাইলেন এবং ইংরেজ কোম্পানিকে সামান্য বাৎসরিক জমায় ইহার ইজারা দেওয়া হইল। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট হইতে বোম্বাইতে পশ্চিম উপকূলের প্রধান ইংরেজ কুঠিটি স্থানান্তরিত হইল। পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি হয় ১৬৭৯ সালের পর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য করিবার জন্য বাংলার সুবাদার শাহজাহানপুত্র সুজার কাছ হইতে বার্ষিক তিন হাজার টাকা খাজনার বদলে সকল প্রকার শুল্ক দিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইল। কিন্তু ইহা লইয়া স্থানীয় মুঘল কর্মচারীদের সঙ্গে ইংরেজের সংঘর্ষ হইত। একবার, ইংরেজগণ হুগলীও অধিকার করিয়াছিল। ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের আদেশে পুনরায় তাহারা পূর্বসুবিধা লাভ করিল। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির কর্মচারী জব চার্ণকের চেষ্টায় সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামাঞ্চল জুড়িয়া কলিকাতা নগরীর পত্তন হইল। পূর্বভারতে ইংরেজের বাণিজ্য সুরক্ষিত করিবার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম এবং মাদ্রাজে ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। মূলতঃ বাণিজ্য করিতে এবং বাণিজ্য প্রসারের বাধা দূর করিতে নির্মিত এই দুর্গগুলি আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উত্তরকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের মূল কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে ইংরেজ কোম্পানির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইল ফরাসী কোম্পানি। ইংরেজদের অনুকরণে সুরাটই হইল প্রথম ফরাসী ঘাঁটি। ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী প্রধান কেন্দ্র হইল মাদ্রাজের দক্ষিণে পণ্ডিচেরিতে; তারপর বাংলার চন্দননগরে (১৬৯০-৯২ খ্রীষ্টাব্দ); ইউরোপে ওলন্দাজদের সঙ্গে ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর যুদ্ধের ফলে ভারতে ফরাসীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসীদের ভারতে দুর্দিন চলিল। তারপর ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আস্তে আস্তে তাহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইতে লাগিল। ভারতে ফরাসী কোম্পানির একট অসুবিধা ছিল এই যে, উহার উপর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব ছিল সুদূর ফরাসীদেশের

ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নানা স্থানে কুঠি স্থাপন ও প্রভাব বিস্তার

জব চার্ণক কর্তৃক কলিকাতা পত্তনের উদ্যোগ

ফরাসী কোম্পানি

ফরাসী কোম্পানি গঠনে ত্রুটি

সরকারের। সুতরাং ইউরোপে ফরাসী রাজনীতির গতি-প্রকৃতির উপর ভারতে ফরাসী কোম্পানির অদৃষ্ট নির্ভর করিত। অপর দিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল ইংলণ্ডের সরকারের সনদ-প্রাপ্ত একটি স্বায়ত্ত-শাসিত সংঘ। ভারতে ইংরেজ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই অবস্থাবৈষম্য বিপরীত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যাহা হউক, ফরাসীরা ক্রমে মালাবার উপকূলে মাহে এবং পরে কারিকল অধিকার করিয়াছিল। ফরাসীদের বাণিজ্য-কুঠিগুলিও দুর্গের সৈন্যবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব—ফরাসী ডুপ্লে প্রথমে চন্দননগরের শাসক ছিলেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচেরিতে শাসনকর্তা হইয়া গেলেন। এই অভিজ্ঞ ফরাসী নায়ক উপলব্ধি করিলেন যে ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলি আকারে বড় বটে, কিন্তু তাহা অন্তঃসার-শূন্য। রাজ্যে রাজ্যে তীব্র অসদ্ভাব এবং রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়া গোলমাল লাগিয়াই থাকে। ইউরোপীয়গণ নৌযুদ্ধে পারদর্শী, কিন্তু ভারতীয় রাজ্যের কোন রণতরী নাই (মারাঠাদের ছাড়া); সকল রাজ্যেরই বিপুল সৈন্যবাহিনী, কিন্তু কার্যকালে তাহা একেবারে অকর্মণ্য। এই অবস্থায় ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত অল্পসংখ্যক সৈন্য অনায়াসে এদেশের বহু সৈন্যকে পরাজিত করিতে পারিবে এবং এই ভাবে ভারতে ইউরোপীয় (ফরাসী) সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব হইবে।

ডুপ্লে : বাণিজ্যের মাধ্যমে সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা

ডুপ্লে

ডুপ্লে এই চিন্তাধারার সমর্থন পাইলেন কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধে। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিল, সুতরাং ভারতবর্ষেও দুটি কোম্পানির মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফরাসী নৌবলাধ্যক্ষ লাবুরদোনেস দক্ষিণে ইংরেজের প্রধান ঘাঁটি মাদ্রাজ সমুদ্রপথে অবরোধ করিলেন। প্রতিশ্রুত অর্থ পাইলেই স্থানটি ফিরাইয়া দিতে হইবে এই শর্তে মাদ্রাজ আত্মসমর্পণ করিল। ডুপ্লে কিন্তু মাদ্রাজ অধিকার করিয়াই রহিলেন। মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী দক্ষিণ ভারতে বিরাট কর্ণাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কর্ণাটের নবাব আনোয়ারউদ্দিন তাঁহার রাজ্যমধ্যে

দক্ষিণ ভারতের ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব : প্রথম কর্ণাটযুদ্ধ

ফরাসীর এই শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হইলেন এবং ইংরেজের অনুরোধে মাদ্রাজ উদ্ধারের জন্য দশহাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে অতি সহজে মাত্র পাঁচ শত সৈন্যের সাহায্যে জয়লাভ করিলেন। ডুপ্লে তারপর ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এইবার ইংরেজ প্রস্তুত ছিল—ডুপ্লে ব্যর্থ হইলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে সন্ধি হইল। সন্ধির শর্তানুসারে ডুপ্লে ইংরেজকে মাদ্রাজ ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু ডুপ্লে তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এইবার দেশীয় রাজাদের গৃহবিবাদে তিনি হস্তক্ষেপ করিলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নিজামের মৃত্যু হইল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন লইয়া বিবাদ বাধিল। দুইজন দাবিদার—পুত্র নাজির জঙ্গ এবং দৌহিত্র মুজফ্ফরজঙ্গ। ডুপ্লে মুজফ্ফরকে সমর্থন করিলেন এবং চাঁদা সাহেব নামক এক ব্যক্তিকে কর্ণাটের নবাব আনোয়ার উদ্দিনের বিরুদ্ধে সিংহাসনের দাবিদাররূপে দাঁড় করাইলেন। ফরাসী সৈন্যের সহায়তায় মুজফ্ফর ও চাঁদা সাহেব কর্ণাটের রাজধানী—আর্কটে অগ্রসর হইয়া আনোয়ারউদ্দিনকে পরাজিত ও হত্যা করিলেন। চাঁদাসাহেব ফরাসীর আশ্রয়ে কর্ণাটের নবাব হইলেন। আনোয়ারের পুত্র মহম্মদ আলি ইংরেজের সাহায্যে ত্রিচিনোপল্লীতে পলায়ন করিলেন। হায়দরাবাদে ইংরেজের সাহায্যেই নাজির জঙ্গ তাঁহার সিংহাসন রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তঘাতকের হস্তে তিনি নিহত হইলেন এবং মুজফ্ফরজঙ্গ হায়দরাবাদের নিজাম হইলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তিনি ডুপ্লেকে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে সমগ্র মুসলমান-শাসিত ভূখণ্ডের অধিপতি নিযুক্ত করিলেন। মুজফ্ফর নিহত হইলে পর ফরাসীগণ সলবৎজঙ্গকে সিংহাসনে বসাইল এবং ফরাসী সেনাপতি বুশী সসৈন্যে হায়দরাবাদে তাঁহার পাহারায় রহিলেন। সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য সলবৎজঙ্গ বুশীকে 'উত্তর সরকার' প্রদেশটি দান করিলেন। বিচক্ষণ বুশী হায়দরাবাদ রাজ্যে ফরাসী প্রভাব সাত বৎসর কাল অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। ডুপ্লের কৃতিত্বে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ফরাসী আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ

হায়দরাবাদ ও কর্ণাটের আভ্যন্তরীণ সমস্যা: ডুপ্লের হস্তক্ষেপ

এদিকে চাঁদাসাহেব ফরাসী সৈন্যের সাহায্যে ত্রিচিনোপল্লীতে মহম্মদ আলিকে অবরোধ করিয়া বসিয়া আছেন। ইংরেজ একদল সৈন্য পাঠাইয়া মহম্মদ আলিকে অবরোধমুক্ত করিতে প্রয়াসী হইল, কিন্তু পারিল না।

ত্রিচিনপল্লীর পতন আসন্ন হইল। ইংরেজ কোম্পানীর এই চরম দুঃসময়ে ইংরেজের পরিত্রাতা হইলেন—রবার্ট ক্লাইভ নামে মাদ্রাজের ইংরেজ কুঠির একজন প্রাক্তন কেরাণী। ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে তিনি ইংরেজ সৈন্যদলে ছোটখাটো নায়ক ছিলেন। মহম্মদ আলির অবরোধ লাঘব করিবার জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন—কর্ণাটের রাজধানী আর্কট গোপনে অকস্মাৎ আক্রমণ করা হউক। মাদ্রাজ সরকার রাজী হইয়া ক্লাইভকেই সেনাপতি নিয়োগ করিয়া আর্কটে সৈন্য পাঠাইলেন। ক্লাইভ তৎপরতার সহিত ক্ষুদ্র সৈন্যদলের সাহায্যে আর্কট দখল করিলেন। চাঁদাসাহেব প্রেরিত বিশাল সৈন্যদল ক্লাইভের যুদ্ধকৌশলে পর্যুদস্ত হইল। সমরনীতির সহিত কূটনীতি মিশাইয়া ক্লাইভ অসামান্য সাফল্য লাভ করিলেন। ইংরেজের গৌরব সমগ্র দাক্ষিণাত্য ছাড়াইয়া পড়িল। মহম্মদ আলি ইংরেজের আশ্রয়ে কর্ণাটে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন।

রবার্ট ক্লাইভ

আর্কট অবরোধ: ইংরেজ সাফল্যের সুরু

ডুপ্লে কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। তখনও দক্ষিণের বৃহত্তম মুসলমান রাজ্য হায়দরাবাদ বুশীর কৃতিত্বে ফরাসীপ্রভাবাধীনে। তিনি অসামান্য অধ্যবসায় ও বুদ্ধি-কৌশল সহকারে ইংরেজদের সঙ্গে সমানে প্রতিযোগিতা চালাইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ ফ্রান্স সরকারের অনুমোদিত ছিল না। ফরাসী কোম্পানীর আংশিক ব্যর্থতার কাহিনী অতিরঞ্জিত হইয়া সুদূর ফ্রান্সে পৌঁছিল। অসন্তুষ্ট ফরাসী সরকার ডুপ্লেকে দেশে ফিরিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন (১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)। ইংরেজের সহিত ফরাসীর সাময়িক সন্ধি হইল। কিন্তু ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের বিখ্যাত সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসী পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। বাংলায় ও মাদ্রাজে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ চলিল। লালী নামে একজন ফরাসী সেনাপতি ভারতে প্রেরিত হইলেন। অনভিজ্ঞ লালী যুদ্ধের মাঝখানে বুশীকে হায়দরাবাদ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হায়দরাবাদে ফরাসীর পরিবর্তে ইংরেজ তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিল। দাক্ষিণাত্যে ফরাসীর বিপর্যয় সম্পূর্ণ

ডুপ্লের প্রত্যাবর্তন

লর্ড ক্লাইভ

তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ

হইল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বন্দিবাসের যুদ্ধে লালী সম্পূর্ণ হারিয়া গেলেন। ডুপ্লের নীতি অনুসরণ করিয়া ফরাসীর বদলে ইংরেজই ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইল। ফরাসীরা ব্যর্থ হইল এবং ইংরেজ বণিকেরা সাফল্য লাভ করিয়া ক্রমে দক্ষিণ ভারতের রাজদণ্ড হস্তে তুলিয়া লইল। ঐতিহাসিকগণের মতে সমুদ্রপথে ইংরেজ শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ইহার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধে সঙ্কটে পড়িয়া ফরাসী সেনাপতি লালী বহু চেষ্টা করিয়াও ফ্রান্স হইতে সৈন্য ও রসদ আনিতে পারেন নাই; কারণ, সমুদ্রপথ তখন ইংরেজ কর্তৃক অবরুদ্ধ। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের ইংরেজশক্তি নববিজিত বঙ্গদেশ হইতে প্রচুর অর্থ ও রসদ পাইতেছিল। লালীর আদেশে বুশীর হায়দরাবাদ ছাড়িয়া আসাও এই বিফলতার অন্যতম কারণ। মোটের উপর ফরাসীরা দক্ষিণ ভারতে শক্তিহীন হইল। পরে অবশ্য ইংরেজ ফরাসীকে পণ্ডিচেরী ছাড়িয়া দিল, কিন্তু শর্ত হইল যে উহা শুধু বাণিজ্য-ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হইবে।

ফরাসীর ব্যর্থতা

ইংরেজের জয়
ফরাসীর পরাজয়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির সম্প্রসারণঃ ক্লাইভ হইতে ডালহৌসি (১৭৫৭-১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

সূচনাঃ দক্ষিণ ভারতের রবার্ট ক্লাইভের অপূর্ব সাফল্য এবং মাদ্রাজকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজ কোম্পানীর রাজনীতিক আধিপত্য স্থাপনের কাহিনী বিবৃত হইল (দ্বাদশ অধ্যায়)। ক্লাইভের অবিস্মরণীয় কীর্তি—বঙ্গ বিজয়। বঙ্গদেশ হইতেই ব্রিটিশ শক্তি সম্প্রসারিত হইয়া সমগ্র উত্তর ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে 'ব্রিটিশ ভারত' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

বঙ্গদেশঃ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে ভারতজোড়া বিশৃঙ্খলার যুগ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দী—সে যুগেও বাংলা-উড়িষ্যা সুবাটি মোটের উপর সুশাসিত ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন সুবাদার। তারপর আসিলেন তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন, তিনি বিহারকে যুক্ত করিয়া 'সুবে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা' গঠন করেন। সুজাউদ্দিনের অযোগ্য পুত্র সরফরাজ খাঁকে হত্যা করিয়া নবাব হইলেন আলিবর্দি খাঁ। দিল্লীর মুঘল সম্রাটকে এতদিন যে কর দিতে হইত তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আলিবর্দি বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব হইয়া

আলিবর্দি খাঁ

বসিলেন। আলিবর্দি যোগ্য, বিচক্ষণ নবাব ছিলেন। বিভীষিকাপূর্ণ বর্গীর হাঙ্গামা অর্থাৎ মারাঠী সৈন্যদলের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে পশ্চিম বাংলার জনগণের প্রাণ ও ধন-সম্পত্তি বিপর্যস্ত হইতেছিল। আলিবর্দি তাহা রহিত করেন। আলিবর্দির রাজদরবার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সপ্রদায়ের প্রধানগণ অলংকৃত করিতেন।

সিরাজউদ্দৌলা

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দি মারা যান। পুত্রহীন আলিবর্দির মনোনীত উত্তরাধিকারী দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব হইলেন। তখন সিরাজের বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। সিংহাসনে অন্য দাবিদারদের তিনি সাফল্যের সহিত দমন করিলেন।

ইংরেজের সহিত বিরোধ

আলিবর্দি বাঁচিয়া থাকিতেই ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে নবাবের মনোমালিন্য ঘটে। ইংরেজ বণিকেরা ফরাসী-ভীতির জন্য কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মকে আরও শক্তিশালী করিবার মানসে নানারকম আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিতেছিল, এবং তাহার চৌহদ্দিও বাড়াইতেছিল। এবিষয়ে নবাবের অনুমতি নেওয়া তাহারা প্রয়োজন মনে করে নাই। সিরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে ইংরেজের কাশিমবাজার কুঠি দখল করিলেন, এবং পরে কলিকাতা অবরোধ করিলেন। কলিকাতার ইংরেজ অধ্যক্ষ ড্রেক্ আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহার পর ১৪৬ জন ইংরেজ-বন্দীকে ছোট্ট একটি আলো বাতাস শূন্য কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে নাকি ১২৩ জন দূষিত বাষ্পে দম বন্ধ হইয়া মারা গেল। অন্ধকূপ হত্যা নামে কুখ্যাত এই বিবরণ কতদূর সত্য তাহা লইয়া এখনও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তবে এই নৃশংস ব্যাপারে সিরাজের কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল না—এই বিষয়ে সকলেই একমত।

অন্ধকূপ হত্যা

রবার্ট ক্লাইভঃ কলিকাতায় ইংরেজের এই বিপর্যয়ের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিল। আর্কট বিজয়ী ক্লাইভ এবং নৌ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন সসৈন্যে কলিকাতা যাত্রা করিলেন এবং প্রায় বিনা বাধায় কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিলেন। সিরাজের উদ্যমহীনতা ও রাজনীতিক অনভিজ্ঞতাই তাঁহার ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

ক্লাইভের বাংলায় আগমন

রাজধানী মুর্শিদাবাদের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি সিংহাসন অভিলাষী

মীরজাফরকে সম্মুখে রাখিয়া সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাহারা সিরাজের পতন ঘটাতেই কলিকাতার ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তখন ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইংরেজ ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর দখল করিল। ফরাসীরা সিরাজের মিত্র ছিল। তাঁহার প্রবল প্রতিবাদে ইংরেজ কর্ণপাতও করিল না। ষড়যন্ত্রকারীদের আহ্বানে ক্লাইভ এবার সানন্দে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ইংরেজের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইল। পলাশীর প্রান্তরে আম্রকাননে যুদ্ধ হইল। সন্দেহের যথেষ্ট কারণ সত্ত্বেও সিরাজ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি করিয়াছিলেন। তথাপি মোহনলাল ও মীরমদন সিরাজের এই দুইজন বিশ্বস্ত রণনায়ক ফরাসীদের সাহায্যে যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ক্লাইভের সৈন্যদলকে প্রায় হটাইয়া দিয়াছিলেন। এমন সময় মীরজাফরের কুপরামর্শে সিরাজ হঠাৎ যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন। নবাবের সৈন্য ফিরিতে আরম্ভ করা মাত্র ক্লাইভের প্রচণ্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত হইল (১৭৫৭)। সিরাজ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন এবং শীঘ্রই ধরা পড়িয়া নিহত হইলেন। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ বঙ্গদেশে ই রেজ প্রাধান্য স্থাপন করার পথ সুগম করিল।

পলাশীর যুদ্ধ

ক্লাইভ প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গদেশ শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন না, মীরজাফরকে নামেমাত্র নবাব করিয়া রাখা হইল। ইংরেজ বঙ্গের প্রকৃত কর্তা হইল এবং অফুরন্ত অর্থভাণ্ডার নিজের স্বার্থেই ব্যয় করিত। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। অসহায় নবাবের সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইল কিন্তু ইংরেজ কর্মচারীদের দাবী মিটিল না। ইহার ফলে ইংরেজ তাঁহাকে সরাইয়া প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে নবাবী দিলেন (১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে)। মীরকাসিম ইংরেজের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য গোপনে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত একদল সৈন্য গঠন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রস্তুত হইবার আগেই ইংরেজের কয়েকটি আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। ইংরেজ ও মীরকাসিমের মধ্যে বিরোধ ক্রমে যুদ্ধে পরিণত হইল। অবশেষে বক্সারের প্রান্তরে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের সাহায্যে মীরকাসিম ইংরেজ সেনাপতি মনরোর সহিত যুদ্ধ করিলেন। মীরকাসিম পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। মীরজাফর আবার নবাব হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে নামে মাত্র নবাব হইলেন পুত্র নিজামউদ্দৌল্লা, কিন্তু ইংরেজই দেশের শাসনকর্তা

বঙ্গদেশে ইংরেজ কর্তৃত্ব স্থাপনের স্বরূপ

মীরকাসিম

বক্সারের যুদ্ধ

ইল। এই সমুদয় গোলোযোগের সময় ক্লাইভ বিলাতে ছিলেন, শীঘ্রই লর্ড
উপাধি পাইয়া ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় গভর্ণর রূপে ফিরিয়া আসিলেন।
বাংলায় শৃঙ্খলা আনিতে তিনি নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। বাহিরের
কাঠামো একই রহিল, কিন্তু ভিতরে সকল ক্ষমতা গেল ইংরেজের হাতে।
নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ও অধিকার অর্থাৎ দেওয়ানী ইংরেজের হস্তে রহিল
—তাহা ইংরেজের কাছে দায়ী ভারতীয় কর্মচারীদের মাধ্যমে আদায় করা হইত।
শাসনকার্যের খরচ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থ ইংরেজদের প্রাপ্য হইল। বঙ্গের প্রতি-
রক্ষার ভারও রহিল ক্লাইভের হস্তে। ক্লাইভের ব্যক্তিত্বগুণে এই অদ্ভুত ব্যবস্থা
আপাতদৃষ্টিতে 'ভালই' চলিল। কিন্তু তিনি চলিয়া যাওয়ার পর অযোগ্য অতি-
লোভী ইংরেজ এবং ততোধিক নিকৃষ্ট তাহাদের দুই ভারতীয় এজেণ্ট রেজা খাঁ ও
সীতাব রায়ের শোষণে ও নিগ্রহে বাংলার আর্থিক দুর্গতি চরমে পৌঁছিল। ইহার
ফলে হইল ভীষণ দুর্ভিক্ষ—"ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" (বাংলা ১১৭৬)।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক না খাইতে পাইয়া মরিয়া গেল।
অবশেষে ইংলণ্ডের প্রভুদের টনক নড়িল। বাংলার শাসন ব্যবস্থা বদলাইবার দায়িত্ব
দিয়া তাঁহারা ওয়ারেন হেষ্টিংস নামে একজন অভিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বঙ্গের
গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন (১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে)।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ): ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সবল হস্তে
শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। মুর্শিদাবাদ
হইতে রাজধানী কলিকাতায় আনা হইল।
সেদিন হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত
কলিকাতাই ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী।
শাসনের নানা বিভাগে বহুবিধ সংস্কার
করিয়া তিনি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার গৌরব অর্জন করিলেন।
নূতন রাজ্য জয় তিনি বিশেষ করেন নাই,
সুশাসনের ব্যবস্থাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল।
তাঁহার সময় দুটি বড়ো যুদ্ধ হয়—প্রথম
মারাঠা যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস

মারাঠা যুদ্ধ যেমন বোম্বাই-এর গভর্ণরের কুকীর্তি, মহীশূর যুদ্ধও তেমনই মাদ্রাজের
গভর্ণরের হঠকারিতার ফল। মহীশূরের নবাব ছিলেন শৌর্যবান প্রবীণ হায়দার
আলি। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে ইংরেজগণ
হায়দারের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী অধিকৃত

মাহে অধিকার করায় হায়দার মাদ্রাজ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে মাদ্রাজ সরকার যখন চরম বিপদে পড়িল, ওয়ারেন্ হেস্টিংসই তখন ইংরেজদের মান-সম্মান ও দক্ষিণে ব্রিটিশ অধিকারকে কোনমতে বজায় রাখিয়াছিলেন। মারাঠা যুদ্ধেও হেস্টিংসের বুদ্ধিবলে ইংরেজের মান বজায় থাকে।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ হইতে লর্ড হেস্টিংস্ (১৭৮৬-১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ)ঃ ব্রিটিশ রাজ্য বিস্তারের কাহিনীতে কর্ণওয়ালিসের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে হায়দার আলির বীরপুত্র টিপু সুলতানকে ইংরেজ নিজাম ও মারাঠা শক্তির সাহায্য লইয়া পর্যুদস্ত করিল। টিপু মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কর্ণওয়ালিস্ কুর্গ, মালাবার ও দিন্দিগল ইংরেজের অধীনে রাখিয়া বাকি অঞ্চল কয়েকটি মিত্রশক্তিদ্বয়কে (নিজাম ও মারাঠা) ভাগ করিয়া দিলেন (শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ)।

লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩)

পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলস্লি (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ) ব্রিটিশ রাজ্য-বিস্তারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁহার উচ্চাভিলাষ ছিল ভারতস্থিত ব্রিটিশ রাজ্যকে (তখন মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পূর্ব ভারত ছিল ইংরেজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে) তিনি ভারতজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত করিবেন। এই উদ্দেশ্যে "অধীনতামূলক মিত্রতা" বা আনুগত্য নীতি ঘোষণা করিয়া তিনি দেশীয় রাজন্যবর্গকে আভ্যন্তরীন শাসন ক্ষমতা ছাড়া আর সব ক্ষমতা ও রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব ইংরেজের হাতে সমর্পণ করিতে আহ্বান করেন। অনেকেই এই নীতি গ্রহণ করিলেন। হায়দরাবাদের নিজাম ফরাসীদের মিত্র ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য ভারতে ফরাসীশক্তির একটি কেন্দ্র ছিল। তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিয়া ফরাসি সৈন্যদের বিদায় দেওয়ায় ফরাসি শক্তি খর্ব হইল। কিন্তু মহীশূরের রাজা বীরবর টিপু এই অপমানকর ব্যবস্থা অস্বীকার করিয়া ওয়েলস্লির সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। চতুর্থ বা শেষ মহীশূর যুদ্ধে টিপু প্রাণ দিলেন, মহীশূর ওয়েলস্লির হস্তগত হইল। মহীশূরের কিয়দংশ যুক্ত হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত, কিয়দংশ ইংরেজের চির বশংবদ নিজাম পাইলেন, বাকি অধিকাংশ প্রাক্তন হিন্দু রাজার একজন বংশধরকে দিয়া তাঁহাকে তিনি আনুগত্যের সম্বন্ধে আবদ্ধ করিলেন। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের কথা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে (১১শ অধ্যায় 'ক')। মারাঠা হোলকারকে দমন করিবার পূর্বেই ভরতপুর দুর্গ দখলে ব্যর্থ হওয়ায় অসন্তুষ্ট ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশে ওয়েলেস্লি স্বদেশে চলিয়া গেলেন।

লর্ড ওয়েলস্লি

অধীনতামূলক মিত্রতার সন্ধি

লর্ড মিণ্টো

লর্ড মিণ্টো (১৮০৭-১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ মিণ্টো বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশে তিনি 'নিরপেক্ষ নীতি' অনুসরণ করিয়া কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। তখন ইউরোপে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ভারত আক্রমণের অভিলাষও বোধ হয় নেপোলিয়নের ছিল। এই আশঙ্কায় মিণ্টো ভারত মহাসাগরের দুটি দ্বীপ মরিশাস ও বুরবন অধিকার করেন। প্রতিবেশী রাজ্য পঞ্জাবের রণজিৎ সিং-এর সহিত অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ) শতদ্রু ও যমুনার মধ্যে অবস্থিত শিখ অঞ্চল ইংরেজ প্রভাবাধীনে আনেন (১৩৯ ঃপৃ)।

লর্ড হেস্টিংস্

লর্ড ওয়েলেস্‌লির আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করেন লর্ড হেষ্টিংস্ (১৮১৩-১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ)। তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে একদা ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের বৃহত্তম প্রতিবন্ধকস্বরূপ মারাঠা শক্তি ধ্বংস হইল (১৩২ পৃঃ)। হিমালয়ের ক্রোড়ে গুর্খাদের নেপাল রাজ্যের সহিত ব্রিটিশ ভারতের উপর সীমা লইয়া বিবাদ ছিল। লর্ড হেষ্টিংসের আমলে ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ হয়। তারপর সগৌলির সন্ধি (১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ) অনুসারে নেপালরাজ্য গাড়োয়াল ও কুমায়ুন ইংরেজকে দিলেন, সিকিমও ইংরেজ প্রভাবে আসিল। এইভাবে শতদ্রু নদীর পশ্চিমে পঞ্জাব এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্বের অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। বৃহত্তর অংশ প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসনে রহিল, এবং বাকি অংশে ভূতপূর্ব স্বাধীন নরপতিদিগকে আনুগত্যের দেশীয় শপথে আবদ্ধ রাখিয়া সীমিতভাবে আভ্যন্তরীন শাসনাধিকার দেওয়া হইল।

টিপু সুলতান

পরবর্তী গভর্ণর জেনারেলগণ (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)—লর্ড আমহার্ষ্টের (১৮২৩-২৮ খ্রীষ্টাব্দ) শাসনকালে প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ হয়। আসাম জুড়িয়া ব্রহ্মরাজ্যের

রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই অজানা পার্বত্য অঞ্চলে ইংরেজ সৈন্য বাহিনীর প্রথমে বিস্তর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। অবশেষে ব্রহ্ম-রাজ পরাজিত হন। ইয়ান্দাবুর সন্ধির শর্তানুসারে (১৮২৬) আসাম, কাছাড় ও জয়ন্তিয়া পরগণা এবং আরাকান ও টেনাসেরিম ইংরেজ অধিকারে আসিল। মণিপুর রাজ্যে ইংরেজের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। মধ্যভারতে ভরতপুরও এতদিনে ইংরেজ শাসনের অধীন হইল।

ব্রহ্মদেশের সীমা পর্যন্ত পূর্বে রাজ্য বিস্তার

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) প্রধানতঃ নানাবিধ সংস্কার কার্যের জন্যই খ্যাতিমান, কিন্তু তাঁহার আমলেও কয়েকটি বশংবদ দেশীয় রাজা ইংরেজের শাসনাধীনে আসে। মহীশূর (১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত— অধীন ছিল, তখন ভাইসরয় লর্ড রিপণ মহীশূরকে অনুগত দেশীয় রাজার হাতে ফিরাইয়া দেন), কুর্গ এবং পূর্বভারতে কাছাড় এবং জয়ন্তিয়া পরগণা (এই দুটি আমহার্ষ্টের সময়ে অনুগত দেশীয় রাজাদের হাতে দেওয়া হইয়াছিল) ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইল।

মহীশূর, কুর্গ, কাছাড় ও জয়ন্তিয়া ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত

তারপর **লর্ড অকল্যাণ্ড** (১৮৩৬-১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ) স্বাধীন পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পারে স্বাধীন রাষ্ট্র আফগানিস্থানে ইংরেজ প্রভাব বিস্তারের নীতিকে কার্যকর করিতে গিয়া প্রথম আফগান যুদ্ধে আফগানদের হস্তে গুরুতরভাবে পরাজিত হইলেন। পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলেনবরা (১৮৪২-১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) কোন রকমে ইংরেজের সামরিক মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিলেন (আফগানিস্থান অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনই রহিল)। এলেনবরার আর এক কীর্তি বিনা কারণে বিনা প্ররোচনায় কেবলমাত্র ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে মিত্ররাজ্য সিন্ধুদেশের আমীরদিগকে যুদ্ধে হারাইয়া ওই রাজ্যটিকে গ্রাস করা (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

এলেনবরার সিন্ধু-বিজয়

দুইটি ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং লর্ড ডালহৌসির পর পর শাসনকালে রাজ্য বিস্তারের দিক দিয়া সবচেয়ে বড় ঘটনা যথাক্রমে দুইটি ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের ফলে সমগ্র পঞ্জাব অধিকার। রণজিৎ সিংহ কর্তৃক সমগ্র পঞ্জাব অধিকারের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১৩৮ পৃঃ)। রণজিতের মৃত্যুর পর (১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ. পরে তাঁহার রাজ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা আরম্ভ হইল। রণজিতের প্রবল খালসা সৈন্য দেশের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল, এবং তাহারা রণজিতের পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসাইল (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁহার মাতা ঝিন্দন পূর্বে একজন নর্তকী ছিলেন। বিস্তৃত শিখরাজের শাসন প্রকৃতপক্ষে রাণী ঝিন্দন ও তাঁহার দুই মন্ত্রী লালসিংহ ও

পাবে অরাজকতা ও শিশু দলীপসিংহ রাজা

তেজসিংহের উপর ন্যস্ত হইল। এদিকে ক্রমে ক্রমে খালসা সৈন্য সমস্ত শৃঙ্খলা ও শাসনের বাহিরে চলিয়া গেল। কোন উপায়েই খালসাদের বশে আনিতে না পারিয়া শিখ দরবার তাহাদিগকে ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিতে আদেশ দিল।

এই সময়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও গোপনে শিখ রাজ্য অধিকার করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের সীমান্তে সৈন্যবৃদ্ধি ও যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিল। হার্ডিঞ্জের শাসনকালে (১৮৪৪-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) খালসা সৈন্য শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিল (১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর)। কিন্তু পর পর মুদ্‌কী, ফিরোজশা এবং আলিওয়াল—এই তিনটি যুদ্ধে শিখ সৈন্যগণকে ইংরেজ পরাজিত করিল, এবং শিখরা শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। তারপর সোব্রাও-এর যুদ্ধে শিখসৈন্যগণ অসীম বীরত্ব ও ধৈর্যের সহিত যুদ্ধ করিলেও কতিপয় সেনানায়কের বিশ্বাসঘাতকতায় তাহারা সম্পূর্ণ পরাজিত হইল (১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু তাহাদের সাহস ও রণকৌশল শত্রু-মিত্র সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল। ইংরেজদের পক্ষে দারুণ সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল। যুদ্ধের পরে লাহোরের সন্ধি দ্বারা শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির শর্তানুসারে শিখদিগকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কাশ্মীর প্রদেশ, হাজরা জেলা, জলন্ধর, দোয়াব ও শতদ্রুর পূর্বদিকস্থ সমস্ত ভূভাগ ইংরেজকে ছাড়িয়া দিতে হইল। বালক দলীপ সিংহ নামে মাত্র রাজা রহিলেন। পঞ্জাবের শাসনকার্য প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি স্যর হেনরী লরেন্সের হস্তে ন্যস্ত হইল। ইংরেজগণ কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যে লাহোর দরবারের এক সর্দার গোলাব সিংহের নিকট বিক্রয় করিল।

প্রথম শিখযুদ্ধ

লাহোরের সন্ধি ও তাহার ফলাফল

শিখদের সহিত সন্ধি বেশীদিন স্থায়ী হইল না। ইংরেজ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে রাণী ঝিন্দনকে লাহোর হইতে দেশান্তরে প্রেরণ করাতে শিখরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইল। অবশেষে মূলতানের শাসনকর্তা মুলরাজের নিকট পঁচাত্তর লক্ষ টাকা দাবি করায় তিনি পদত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হন। ক্রমে অন্যান্য শিখ নায়কগণ মুলরাজের সহিত যোগ দেন। ইহার ফলে বড়লাট লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৮৪৮)। চিলিয়ানওয়ালা প্রান্তরে শিখ ও ইংরেজ সৈন্যের ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কোন মীমাংসা হইল না। কিন্তু ইংরেজপক্ষে গুরুতর লোকক্ষয় হইল। ইহার পর চিনাবের তীরে গুজরাট নামক স্থানে শিখ সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)। লর্ড ডালহৌসি পঞ্জাব ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ

১৮৪৯ সালে পঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

করিলেন। এইরূপে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর দশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিখরাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল। নিরপরাধ দলীপ সিংহকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া তাঁহার মাতা ঝিন্দনের সহিত ইংলণ্ডে পাঠান হইল। ঝিন্দনের সেইখানেই মৃত্যু হয়। দলীপ সিংহ সেখানে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়া বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া শিখধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না।

দলীপ সিংহের অবস্থা

ডালহৌসি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের নিমিত্ত সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সামান্য অজুহাতে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া তিনি সমগ্র পেগু বা নিম্ন ব্রহ্মদেশকে স্বাধিকারে আনিলেন (১৮৫২—২য় ব্রহ্মযুদ্ধ)। কুশাসনের ছুতায় দেশীয় রাজ্য অযোধ্যা ব্রিটিশ ভারতে যুক্ত হইল। ব্রিটিশের প্রতিষ্ঠিত ও অধীন দেশীয় রাজ্যের অপুত্রক রাজা মরিয়া গেলে তাঁহার দত্তক ও পোষ্যপুত্রকে ডালহৌসি উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এই "স্বত্ব বিলোপ নীতি" অনুসারে পোষ্যপুত্রের দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সাতারা, ঝান্সি ও নাগপুর প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আনিলেন। মোটের উপর ডালহৌসি ভারত জয় সম্পূর্ণ করিলেন।

ডালহৌসীর দ্বারা অন্যান্য রাজ্য ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত

চতুর্দশ অধ্যায়

(ক) সংস্কার সাধনের ধারা: ওয়ারেন হেস্টিংস্ ও কর্ণওয়ালিস্, বেণ্টিঙ্ক, ডালহৌসি এবং রিপণ:

সূচনা: কোম্পানীর আমলে কয়েকজন বিচক্ষণ গভর্ণর জেনারেল শুধু রাজ্য জয় করেন নাই, ভারতীয় সমাজের অনেক সংস্কার সাধনও করিয়াছেন, সুশাসন ব্যবস্থাদ্বারা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন, তৎকালীন অনিশ্চয়তার মধ্যে স্থিতি আনিয়াছেন এবং ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতাও লাভ করিয়াছেন। এই যে ভারতের উন্নতিকল্পে সংস্কার সাধনের প্রয়াস, ইহার তাৎপর্য একটা বড়ো যুদ্ধে জয়লাভ করার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

ওয়ারেন্ হেস্টিংস্: বঙ্গের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ "দ্বৈতশাসনের" নিদারুণ কুফলসমূহ দূর করিয়া বলিষ্ঠ হস্তে শাসনের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার অর্থনীতিতে চরম দুর্গতি ঘটিয়াছিল—রাজস্ব আদায় অত্যন্ত অনিয়মিত, কোম্পানী ঋণগ্রস্ত। হেস্টিংস্ নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ভার পাঁচ বৎসরের জন্য নিলামে ডাকিয়া সর্বোচ্চ

হেস্টিংসের শাসন সংস্কার: রাজস্ব-ব্যবস্থা

পরিমাণ অর্থদাতাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। রাজধানী কলিকাতায় কমিটি অব রেভিন্যু (কয়েক বৎসর পরে নাম হইল বোর্ড অব রেভিন্যু) অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্রীয় বিভাগ স্থাপন করিলেন। মুঘল সম্রাট শাহ আলমকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, বাংলার নবাবের বাৎসরিক ভাতাও অর্ধেক করিয়া দিলেন। কোম্পানির বংশবদ কোন মিত্র রাজা ও নবাবের কাছ হইতে জুলুম করিয়া এমনকি অত্যাচার করিয়াও, তিনি প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের প্রতি জেলায় দেওয়ানী বিচারালয়, এবং রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত করিলেন। দেওয়ানী বিচারের জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত এবং ফৌজদারি বিচারের জন্য সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। ফৌজদারি আদালতে এদেশীয় বিচারকই নিযুক্ত হইতেন। জেলায় জেলায় এই দুই শ্রেণীর নিম্ন আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের রেগুলেটিং আইন অনুসারে কলিকাতায় বিচারের জন্য সুপ্রিম কোর্ট এবং শাসন কার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য চারজন সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদ স্থাপিত হয়।

বিচার ব্যবস্থা

ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ ভারতীয় শিক্ষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি পার্শি ভাষা জানিতেন। কলিকাতার মাদ্রাসার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা (১৭৮১)। হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় স্যর উইলিয়ম জোন্স প্রাচ্য সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি অনুশীলনের জন্য বিখ্যাত এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৮৪)। বারাণসীতে জোনাথান ডানকান কর্তৃক ১৭৯২ সালে যে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়, হেস্টিংসই তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে শেষোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ক্ষেত্রে কার্য আরম্ভ করে। উইলেকিন্স কর্তৃক প্রথম ছাপাখানা পত্তন, বাংলার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন (হলহেড কর্তৃক), হিন্দু মুসলমানের আইন শাস্ত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করা—এই সমুদয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করা হেস্টিংসের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

প্রাচ্য শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা

কর্ণওয়ালিসের আমলে : 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' লর্ড কর্ণওয়ালিসের সবচেয়ে বড় কাজ। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ—ভূমির রাজস্ব সরকারের প্রধান আয়। হেস্টিংসের সময় নিলামে ভূমিরাজস্ব আদায়কারীদের প্রথম পাঁচ বছরের জন্য এবং পরে বাৎসরিক নিলামে নিয়োগ করা হইত। এই লোভী সাময়িক মধ্যস্বত্বভোগীরা বেশী খাজনা আদায় করিবার জন্য কৃষকদের

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

উপর অত্যাচার করিত। জমির উপর এইসব অস্থায়ী জমিদারদের কোন দরদ ছিল না। কর্ণওয়ালিস্ নিজে একজন লর্ড বা ইংলণ্ডের বড় জমিদার ছিলেন। সব দিক ভাবিয়া কর্ণওয়ালিস্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করিলেন (১৭৯৩)। ইহার ফলে জমিদারদের সরকারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হইল। স্থির হইল, জমির মালিকানা জমিদারগণ ভোগ করিবেন এবং কৃষকদের অভিভাবকত্ব তাহাদের উপরই ন্যস্ত থাকিবে। এই ভাবে বঙ্গদেশ, বিহার এবং পরে বারাণসীতে বংশগত জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সরকারের রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে শৃঙ্খলা আনিয়াছিল সত্য, কিন্তু অসহায় কৃষকগণের দুর্গতি ঘুচিল না (স্বাধীন ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করা হইয়াছে)। সমগ্র দেশকে জেলায় জেলায় ভাগ করা হইল। জেলাগুলি ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্র স্বরূপ হইল। প্রত্যেক জেলায় কালেক্টর নামে একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত হইল। পুলিশ বিভাগ নূতন করিয়া সাজানো হইল। দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিচারক নিযুক্ত হইল। ভ্রাম্যমান আদালতও প্রতিষ্ঠিত হইল। জেলা শাসনে ও কেন্দ্রীয় শাসনে বহু নূতন ইংরেজ আমলা বা কর্মচারী নিযুক্ত হইল। সবার উপরে রহিলেন সপরিষদ গভর্নর জেনারেল। কর্ণওয়ালিস্ ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ করার বিরোধী ছিলেন, কারণ তিনি মনে করিতেন যে যোগ্যতায় তাহারা ইংরেজের তুলনায় হীন। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় তিনিই আমলাতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন।

শাসন সংস্কার

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক: বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের নানাবিধ সামাজিক ও শাসন-সংস্কার এবং শিক্ষা বিষয়ে নবযুগের প্রবর্তন ভারতের ইতিহাসে তাঁহার কীর্তি অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে।

হিন্দু সমাজে স্বামীর মৃতদেহের সহিত স্ত্রীর জীবন্ত পুড়িয়া মরার প্রথা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কোন কোন স্থলে তাহাকে জোর করিয়া স্বামীর জলন্ত চিতায় পোড়াইয়া মারা হইত। বেন্টিঙ্ক আইন করিয়া এই নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা রহিত করেন (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ)। শ্লীম্যান নামক একজন যোগ্য কর্মচারীর সাহায্যে বেন্টিঙ্ক সম্পূর্ণরূপে ঠগী দস্যুদের দমন করিয়া ভারতবাসীর ধনপ্রাণ নিরাপদ করিয়াছিলেন। বেন্টিঙ্ক খন্দ ও কোল প্রমুখ কতকগুলি আদিম অসভ্য উপজাতিকে সভ্যতার আলোকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ

অন্যান্য সংস্কার

বেন্টিঙ্কই প্রথমে ভারতীয়গণকে বিচার ও শাসন বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতে কোম্পানীর শাসনকাল আরও কুড়ি বৎসর বৃদ্ধি করিয়া সনদ আইন পাশ করে। তাহাতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ভারতীয়দের যোগ্যতা অনুসারে সকল সরকারী পদে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই সনদ বলে শাসন-পরিষদে আইন-সচিব নামে একজন নূতন সদস্য নিযুক্ত হইলেন। বেন্টিঙ্ক সমগ্র ভারতের গভর্ণর-জেনারেল (বড়লাট) হইলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে (রেগুলেটিং অ্যাকট অনুসারে) এই পদের নাম ছিল বাংলার বড়লাট। সপরিষদ ভারতের বড়লাটকে সমগ্র ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজী প্রচলিত হইল। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানকে প্রধান শিক্ষণীয় করা হইল। শিক্ষা ক্ষেত্রে বেন্টিঙ্কের এই সংস্কার যুগান্তকারী ঘটনা।

১৮৩৩-এর সনদ আইন

উচ্চ পদে ভারতীয়দের নিয়োগ

শিক্ষার বাহন ইংরেজী

লর্ড ডালহৌসির সংস্কার কার্যাবলী : ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ডালহৌসির রাজ্য জয়ের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই বড়লাটের আর একটি দিকও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই পশ্চিমের বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এদেশের প্রচলিত করিয়া ভারতকে আধুনিক করিবার প্রশস্ত পথ রচনা করেন। ডালহৌসি শাসন পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। বাংলা প্রদেশের শাসনের জন্য ডালহৌসির সময়েই একজন লেফ্‌ট্‌নাণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত করা হইল। এই সময়েই পূর্ত বিভাগের (P. W. D.) সৃষ্টি হইল, এবং বড় বড় খাল ও রাস্তার কাজ আরম্ভ হইল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও এক আনা মাসুলে ভারতের সর্বত্র পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা ডালহৌসির আমলেই প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত 'এডুকেশন ডেসপ্যাচ' বা 'শিক্ষানীতি সম্বন্ধীয় ঘোষণা পত্র' এদেশে পৌছিল এবং ডালহৌসি উহা পাইবামাত্র এই নীতি অনুসারে কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারে শিক্ষার জন্য নূতন একটি বিভাগের প্রবর্তন করিলেন এবং নানাস্থানে স্কুল ও কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার ব্যবস্থার ফলেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ডালহৌসি স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতাও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

অন্যান্য উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা

শিক্ষার প্রসার

লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪)ঃ লর্ড রিপণের ভারতে বড়লাট এবং ভাইস্‌রয় হইয়া আসিবার বাইশ বৎসর পূর্বে (১৮৫৮) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আইন করিয়া অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং কোম্পানীর আমলে সংস্কার কার্যাদির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় রিপণকে স্থান দিবার একমাত্র যৌক্তিকতা এই যে, এই উদার-চেতা ভাইস্‌রয় উক্ত ধারাতেই ভারতে বহু উন্নয়নমূলক এবং জনহিতকর কাজ করিয়াছিলেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন রিপণই প্রথম কার্যকর করেন। প্রত্যেক জেলায় জেলাবোর্ড, মহকুমায় লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড এবং কোন কোন শহরে মিউনিসিপ্যালিটি রিপণের আগেও ছিল। কিন্তু সকল সংস্থাতেই ছিল সরকারের মনোনীত প্রতিনিধিদের প্রাধান্য। রিপণ লোকাল বোর্ডে স্থানীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। সভাপতিও মনোনীত না হইয়া নির্বাচিত হইবেন এরূপ ব্যবস্থা হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের মত না থাকায় সর্বত্র প্রতিনিধিত্ব-মূলক স্বায়ত্তশাসন তিনি স্থাপন করিতে পারেন নাই। ভারতের জনগণের রাজনীতিক শিক্ষার জন্য রিপণের এই উদার প্রয়াস ধীরে ধীরে সার্থক হইয়াছিল। এতকাল দেশীয় বিচারকগণ ইউরোপীয় আসামীদের বিচার করিতে পারিতেন না। এই দারুণ দুর্নীতিপূর্ণ অসাম্যকে রিপণ দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। আইনসচিব ইল্‌বার্ট রিপণের একটি ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব অনুযায়ী একটি বিল (Bill অর্থাৎ আইনের খসড়া) তৈরি করেন। ইহার ফলে রিপণ প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হইলেন। কলিকাতার ইউরোপীয়দের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে রিপণের এই মহৎ প্রয়াস আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছিল মাত্র। তাঁহার আর একটি শুভ কাজ—প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বস্তুত এতদিন শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি অবহেলিত ছিল।

অন্যান্য সংস্কার

(খ) উনবিংশ শতাব্দীতে দেশের নবজাগরণ—শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির নূতন রূপ।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তাহার উদ্দেশ্যঃ মধ্যযুগের প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-গৌরব, শিক্ষা-দীক্ষা ও ক্রিয়াকলাপ ধীরে ধীরে ম্লান হইতে থাকে। পলাশির

যুদ্ধে বাংলাদেশে ইংরেজগণের আধিপত্য স্থাপনের পর হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইংরেজ শাসকগণ বাংলার শাসনকার্যে শৃঙ্খলা স্থাপন এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন। এদিকে উনবিংশ শতাব্দী হইতে বাংলাদেশ ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল, এবং তখন হইতেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ভারতীয়দের নবজাগরণের সূচনা হইল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থায় প্রাচীন প্রথা ও শাস্ত্রের নির্দেশ অন্ধভাবে অনুসরণ না করিয়া যুক্তির সাহায্যে তাহার ভালমন্দ বিচার পূর্বক সংস্কার সাধন, স্বাধীন চিন্তা, কল্পনা ও মনোবৃত্তি অবলম্বনে নূতন প্রণালীতে প্রাদেশিক গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি, জাতীয়তাবাদ, স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতার আকাঙ্খা প্রভৃতি যে সমুদয় রাষ্ট্রীয় আদর্শ এদেশে কখনও ছিল না, অথবা বহুকাল পূর্বেই লুপ্ত হইয়াছিল, ভারতবাসীর মনে তাহার সঞ্চার, পাশ্চাত্যের নূতন নূতন উদ্ভাবিত যন্ত্র ও অর্থনীতিক প্রণালী অবলম্বনে ভারতে শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা-পূর্বক ভারতবাসীর দারিদ্র্য মোচন ও সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা—এই সমুদয় এবং আরও অনেক আনুসঙ্গিক পরিবর্তন এই নবযুগের লক্ষণ। এই নবযুগকেই সাধারণতঃ ভারতের নবজাগরণ (Renaissance) বলা হয়। ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত মধ্যযুগ হইতে বর্তমান আধুনিক যুগে উপনীত হয়। যে সমুদয় ঘটনা বা শক্তির প্রভাবে ভারতের এই নবজাগরণ সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এবং তাহার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব সর্বপ্রধান। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় হইতে, এই নবজাগরণের সূত্রপাত হয় এবং ইহার অগ্রদূত ছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

মধ্যযুগের শেষে ভারতের দুরবস্থা

নবযুগের শিক্ষা-সভ্যতার মূল কেন্দ্র

নবযুগের নানা লক্ষণ ও ভারতের নবজাগরণ

ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বিস্তার

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারঃ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ইংরেজ সরকার এদেশে ইংরেজী শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করে নাই। তখন সাধারণতঃ মধ্যযুগের মত টোল ও মাদ্রাসায় সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষায় ব্যাকরণ, সাহিত্য, তর্ক ও দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার প্রচলন ছিল ; পাঠশালা ও মক্তবে মধ্যযুগের মতই অতি সাধারণ প্রাথমিক

শিক্ষার পূর্বাবস্থা

শিক্ষা দেওয়া হইত। বাংলা ভাষা বা অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির শিক্ষার দিকে তেমন কোন দৃষ্টি দেওয়া হইত না। কিন্তু ক্রমে কলিকাতায় বাঙালীদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার একটি প্রবল আকাঙ্খা জাগিয়া উঠে। স্থপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড্ ইস্টের ভবনে বহু বাঙালী একটি সাধারণ সভায় একত্রিত হইয়া হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন এবং ইহা শীঘ্রই কার্যে পরিণত হয় (২০শে জানুআরি, ১৮১৭)।

বাঙালীদের ইংরেজী শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা ও তাহার নানা ব্যবস্থা

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে দ্রুতগতিতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হইতে লাগিল। ডিরোজিও নামক ইহার একজন শিক্ষকের শিক্ষার ফলে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কিরূপে সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং সভা-সমিতি, পত্রিকা প্রকাশ ও নূতন নূতন স্কুল স্থাপন করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে এই সকল ভাব প্রচার করে তাহা পরে বিবৃত হইবে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ২০ বৎসরের মধ্যেই কলিকাতায় ইংরেজী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছয় হাজারের উপর উঠিয়াছিল। ১৮৩৫ খ্রীঃ বেণ্টিঙ্ক ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রদানের যে ব্যবস্থা করেন তাহার ফলে ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার হয়।

ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাব

ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও : (১৮০৮-৩১)—বাংলার পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও তাহার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব— এই দুইটি গুরুতর বিষয়ের সহিত ডিরোজিওর নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

কলিকাতার এক পর্তুগীজফিরিঙ্গিপরিবারে ১৮০৮ খ্রীঃ ১৮ই এপ্রিল ডিরোজিওর জন্ম হয়। ধর্মতলায় ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ১৮ বছর বয়সে (১৮২৬ খ্রীঃ) তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন* এবং মাত্র পাঁচ বৎসর ঐ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান এবং বিদ্যালয়ের বাহিরে সভা সমিতি ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাঁহার ছাত্রগণের মনে ইউরোপের নবযুগের (Renaissance) বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও মতবাদের প্রভাব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন সংস্কারের অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে যাহাতে তাঁহার ছাত্রেরা স্বাধীন চিন্তার দ্বারা ন্যায় অন্যায় ও নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারে ইহাই ছিল ডিরোজিওর শিক্ষক জীবনের একমাত্র লক্ষ্য

*সাধারণ প্রচলিত জন্মতারিখ (১৮০৯) এবং হিন্দু কলেজের শিক্ষকপদে নিয়োগের তারিখ (১৮২০—১৮২৮) ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

এবং এ বিষয়ে তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ছাত্রদের আলোচনা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাহারা কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত করে।

পরবর্তীকালে ডিরোজিওর বহু ছাত্র বাংলা দেশের রাজনীতিক ও সামাজিক সংস্কারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গুরু ডিরোজিও-ই যে তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ নেতা প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন: "ডিরোজিও তাঁহার ছাত্রদিগের মনে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শগুলি গভীর ভাবে অঙ্কিত করিতেন, তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইতেন যে মানুষের সর্ব প্রধান কর্তব্য—প্রতি কর্মে ও আচরণে অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তি দ্বারা প্রণোদিত হওয়া, সত্যের জন্য জীবন ধারণ ও মৃত্যু বরণ করা, সর্বপ্রকার সৎকার্যে আত্মনিয়োগ এবং পাপ ও দুষ্কর্ম পরিহার করা। নানা দেশের মনীষী ও মহাপুরুষদের জীবনচরিত হইতে ন্যায়পরায়ণতা, দেশপ্রেম, আত্মসুখ বিসর্জন দিয়া মনুষ্যজাতির উন্নতিসাধন প্রভৃতি মহান আদর্শের দৃষ্টান্ত তিনি এমন প্রাঞ্জল ভাষায় ও প্রবল আবেগের সহিত ছাত্রদের নিকট বিবৃত করিতেন যে তাহাদের মনে ইহা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিত এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে প্রেরণা যোগাইত।"

ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী ছাত্রেরা রাজনীতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক, প্রভৃতি ক্ষেত্রে তৎকালে ইউরোপে প্রচলিত সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। হিন্দু সমাজের অনেক কুপ্রথা—বাল্য বিবাহ, কুলীনদের বহু বিবাহ, সহমরণ, বিধবা-বিবাহের নিষেধ, স্ত্রী-শিক্ষার অভাব, প্রতিমা পূজা, নিম্ন-জাতির প্রতি উচ্চ জাতির ব্যবহার—এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের অনেক ত্রুটি ও দুর্নীতি—উচ্চরাজপদে দেশীয় লোকের নিয়োগ না করা, নানা প্রকারে দেশের অর্থশোষণ. রাজস্ব বৃদ্ধি, ইংরেজ আদালতের বিচার-বিভ্রাট—প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহারা সাপ্তাহিক বিতর্ক সভায় এবং কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের মাধ্যমে স্বাধীন ভাবে আলোচনা করিত। তাহাদের এই সব আলোচনার ফলে ছাত্রদের মধ্যে অনেকে হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি প্রকাশ্যে লঙ্ঘন করিত,—অখাদ্য খাইত, হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করিত না, ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যা-উপাসনা করিত না। ডিরোজিওর শিক্ষার ফলেই এই সব অঘটন ঘটিয়াছে—এই বিশ্বাস হিন্দুদের মনে এরূপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—যে তাহাদের প্রবল আন্দোলনের ফলে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ডিরোজিওর পদত্যাগ দাবি করিলেন।

ডিরোজিও ১৮৩১ খ্রীঃ ২৫শে এপ্রিল পদত্যাগ করেন এবং ঐ বৎসর ২৬শে ডিসেম্বর কলেরা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজনীতিক্ষেত্রে ছাত্রদের মনে তিনি যে ইংরেজ-বিরোধী মতবাদ ও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগাইয়া ছিলেন—তাহাতে প্রগতিশীল রামমোহন রায় পর্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। ডিরোজিও 'মাতৃভূমি' ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যে মর্মস্পর্শী ইংরেজী কবিতাটি লিখিয়াছিলেন—সেরূপ স্বদেশপ্রেমের কোন কবিতা ভারতের কোন ভাষায় তাঁহার পূর্বে কেহ লেখে নাই। তাঁহার অনুপ্রেরণায় তাঁহার ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজীতে দেশপ্রেম-মূলক কবিতা লিখিয়াছিলেন। বাংলার যুবকগণের মনে এই গভীর দেশ-প্রেমের অনুপ্রেরণা ডিরোজিওর শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য। ডিরোজিওর ছাত্রগণ যে তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলার - তথা ভারতের— নবজাগরণের পথ কিরূপ প্রশস্ত করিয়াছিল—নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র। 'একজন যুবক আঠারো হইতে তেইশ বৎসর বয়সের মধ্যে "একটা অনড় জাতির জীবনের মূল পর্যন্ত নাড়া দিয়ে" তার নবজাগরণের পথ সৃষ্টি করিয়াছিলেন— এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বিরল—' ডিরোজিও সম্বন্ধে তাঁর এক জীবনী-লেখকের এই উক্তি অস্বীকার করা কঠিন। সাধারণের মনেও যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ডিরোজিওর এই ছাত্রদলকে সে যুগে 'Young Bengal' বা 'নব্যবঙ্গ' এই সম্মান ও বৈশিষ্ট্য সূচক উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এই 'নব্যবঙ্গ' সম্প্রদায়ই বাংলার নব জাগরণের প্রধান ধারক ও বাহক ছিল।

রামমোহন রায় (জন্ম ১৭৭৪, মতান্তরে ১৭৭২ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৩৩ খ্রীঃ)—ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, ইংরেজের রাজ্য শাসন-পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক জন-আন্দোলনের প্রণালীর প্রবর্তন, বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি বিধান প্রভৃতি কার্যের দ্বারা রামমোহন বাংলাদেশে নবযুগ প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেন। তিনি আরবী, পার্শী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষতঃ বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তিনি ইংরেজী ভাষা এবং ক্রমে ফরাসি, ল্যাটিন, গ্রীক ও ইহুদী ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি বেদান্ত-গ্রন্থ ও বেদান্তসার রচনা এবং অনেকগুলি উপনিষদ ইংরেজী ও

নানা ভাষায় জ্ঞানলাভ

বাংলায় অনুবাদ করেন। ইহাতে তাঁহার কৃতিত্ব ও যশ ভারত ছাড়িয়া ইউরোপেও বিস্তৃত হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরও বহুকাল ইংরেজ সরকার ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনে একেবারে উদাসীন ছিল। সরকারী অর্থ মধ্যযুগে প্রচলিত শিক্ষায়ই ব্যয়িত হইত। রাজা রামমোহন রায় ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এইরূপ শিক্ষার অসারতা এবং ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন যে জাতীয় জীবনের উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

তাঁহার কৃতিত্ব

ইংরেজী শিক্ষা প্রসারে সরকারের উদাসীনতা, রামমোহনের প্রতিবাদ

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এদেশে শিক্ষিত লোকের মনে যে অন্ধভাবে প্রাচীন প্রথার উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীনভাবে বিচার করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে, রাজা রামমোহন রায় এবং ডিরোজিও ছিলেন তাহার প্রধান পথ-প্রদর্শক। ১৮২৩ খ্রীঃ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বের জন্য এবং ১৮২৭ খ্রীঃ অভিযুক্ত অপরাধী খ্রীষ্টান হইলে কোন হিন্দু বা মুসলমান জুরীপদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না—এই আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন যে প্রকার আন্দোলন করেন পরবর্তীকালে তাহাই রাজনীতিক আন্দোলনের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। রামমোহন রায় হিন্দুদের সামাজিক কুসংস্কার সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীজাতির শিক্ষার ও সামাজিক পদ মর্যাদার অভাব, এবং কঠোর জাতিভেদের বিরুদ্ধে উদার মত পোষণ করিলেও তিনি কার্যতঃ এ বিষয়ে কোন সংস্কারের চেষ্টা করেন নাই। বরং তিনি চিরাচরিত প্রাচীন প্রথাকে মানিয়া চলাই সঙ্গত মনে করিতেন। এইজন্য তিনি হিন্দু বিধবার পুনরায় বিবাহ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং আহারাদি বিষয়ে ব্রাহ্মণোচিত

স্বাধীন ভাবচিন্তার প্রথম পথ-প্রদর্শক

রাজা রামমোহন রায়

রীতি-নীতি নিষ্ঠার সহিত মানিয়া চলিতেন। তিনি বিলাত যাওয়ার সময় জাহাজে পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন এবং সেখানে অবস্থান কালেও গলায় উপবীত ধারণ করিতেন।

কেবলমাত্র নিষ্ঠুর সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টা সর্বথা প্রশংসনীয়। এই প্রথা যে লর্ড বেন্টিঙ্ক রহিত করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। রামমোহন ও তাঁহার পূর্বে আরও অনেকে এই প্রথার নিষ্ঠুরতার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বেন্টিঙ্ক ভারতের বড়লাট হইয়া এদেশে আসিবার পূর্বেই এই প্রথা উচ্ছেদ করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হন। যখন তিনি দেখিলেন কেবলমাত্র উপদেশ ও অনুরোধে লোকে এই নিষ্ঠুর প্রথা বর্জন করিবে না—তখন তিনি আইন প্রণয়ন করিয়া এই প্রথা রহিত করিতে মনস্থ করিলেন। রামমোহনের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিলে রামমোহন এইরূপ আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। অন্যান্য কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও ঐরূপ মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বেন্টিঙ্ক আইন প্রণয়ন করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রাচীন প্রথা চিরকালের জন্য বন্ধ করিলেন। সুতরাং এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিবার প্রধান কৃতিত্ব বেন্টিঙ্কেরই প্রাপ্য, রামমোহনের নহে, যদিও সাধারণের বিশ্বাস এই কৃতিত্ব রামমোহনের প্রাপ্য। এইরূপ অনেকের ধারণা যে রামমোহনই গদ্য বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা; কিন্তু তাঁহার পূর্বে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ গদ্য সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম ব্যাকরণ রচনাও অনেকের মতে রামমোহনের প্রাপ্য। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার পূর্বে রচিত বাংলা ব্যাকরণের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; ইহা খুব সম্ভবতঃ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচনা করেন। কিন্তু পথপ্রদর্শক না হইলেও গদ্য বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় রামমোহনের অবদান বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব ধর্মসংস্কারে। অতঃপর সে সম্বন্ধেই একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ব্রাহ্ম-সমাজ—রাজা রামমোহন রায় ভারতের প্রাচীন ধর্মনীতি উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে জাগরিত করিয়া তোলেন। বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন যে, বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস ও তাঁহাদের মূর্তিপূজা (পৌত্তলিকতা) প্রকৃত হিন্দুধর্মের বিরোধী এবং নিরাকার একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। তিনি বেদান্ত-দর্শন ও বেদান্তসার এবং অনেকগুলি উপনিষদ ইংরেজী

রামমোহন রায়ের ধর্মমত প্রচার

ও বাংলায় অনুবাদ করেন। হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোকই তাঁহার পৌত্তলিকতা-বিরোধী একেশ্বরবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত গ্রহণ করে নাই। যে অল্পসংখ্যক লোক তাঁহার মতে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি তাঁহাদের লইয়া এক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮২৮ খ্রীঃ) এবং ইহাই পরে ব্রাহ্ম-সমাজ নামে পরিচিত হয়।

ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা

রামমোহনের মৃত্যুর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃতপ্রায় এই সম্প্রদায়কে আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষার প্রবর্তন করিয়া একটি বিধিবদ্ধ ধর্ম সমাজে পরিণত করেন। কিছুদিন পরে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন নানাবিধ সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করায় দেবেন্দ্রনাথের সহিত মতভেদ হয় এবং ব্রাহ্ম-সমাজ দুইভাগে বিভক্ত হয়। পরে আবার একদল সামাজিক সংস্কারে আরও বেশী অগ্রসর হইলে কেশব চন্দ্রকে ছাড়িয়া তৃতীয় একটি সমাজ গঠিত করে। ইহার অন্যতম নেতা ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। ফলে আদি, নববিধান ও সাধারণ এই তিন নামে পৃথক তিনটি ব্রাহ্ম সমাজ গঠিত হয়। এই তিনটি সমাজের লোকসংখ্যা বাংলাদেশে এখন মাত্র ২৫০। কিন্তু যদিও ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কোন দিনই খুব বেশী ছিল না তথাপি জাতিভেদ বিলোপ, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বাল্য-বিবাহ বর্জন প্রভৃতি বহু সামাজিক সংস্কার গ্রহণ এবং বহু কুসংস্কার বর্জন সমগ্র হিন্দু সমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য কেশবচন্দ্র সেন বাংলার বাহিরে অনেক স্থানে ঐ ধর্ম প্রচার করেন। ফলে অনেক স্থানে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। তবে বাংলাদেশের ন্যায় অন্যত্রও এই ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র। বোম্বাই প্রদেশে ইহা প্রার্থনা সমাজ নামে পরিচিত। বাংলার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত ইহার সাদৃশ্য খুব বেশী, প্রভেদের মধ্যে এই যে ইহা হিন্দু সমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নাই এবং ইহার সভ্যগণ বাহ্যতঃ অনেক হিন্দু রীতি নীতি মানিয়া চলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রার্থনা সমাজ স্থাপিত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ও শ্রীমহাদেব গোবিন্দ রাণাডে প্রার্থনা সমাজে যোগদান করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) ও আর্যসমাজঃ ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায় বাংলার বাহিরে নানা স্থানে অনুরূপ ধর্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দয়ানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ ইহাদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। দয়ানন্দ ইংরেজী জানিতেন না কিন্তু বেদে সুপণ্ডিত ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৫ বছর তিনি ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের কলুষতা দূর

করিয়া প্রাচীন বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া বহুস্থানে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেন। কাশীর মহারাজার নেতৃত্বে একটি সভায় তিনি সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে তিনশত গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিয়া নিজের মত প্রতিপন্ন করেন। ইহার ফলে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কলিকাতায় আসিয়া তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যদের সঙ্গে একযোগে ধর্মপ্রচারের বিষয় আলোচনা করেন—কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় না। কারণ তিনি বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ, গো-মাতার প্রতি ভক্তি এবং যাগ যজ্ঞের সমর্থন করায় ব্রাহ্মরা তাঁহার প্রতি বিরূপ হন। রামমোহন রায়ের মত দয়ানন্দ বৈদিক ধর্মকেই প্রকৃত হিন্দুধর্ম বলিয়া মানিতেন এবং পরবর্তীকালের পৌরাণিক ধর্মানুযায়ী নানা দেব-দেবীর মূর্তি-পূজা অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র এক ভগবানে বিশ্বাস করিতেন। পরবর্তী ব্রাহ্মগণের ন্যায় তিনি সামাজিক সংস্কারের উপরেই জোর দিতেন। তিনি বাল্য বিবাহের বিরোধী ছিলেন এবং বর কন্যার বিবাহ-যোগ্য বয়স যথাক্রমে অন্যূন ২৫ ও ১৬ হইবে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সাধারণতঃ স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর কোন নারী বা পুরুষের পক্ষে পুনরায় বিবাহ করা অসঙ্গত। তিনি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ সমর্থন করিতেন এবং যাঁহারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান বা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান দ্বারা পুনরায় হিন্দুধর্মে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠান "শুদ্ধি" নামে পরিচিত এবং ইহাকে দয়ানন্দ ভারতে এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ হিন্দুজাতি সৃষ্টি করিবার প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন। বহু মুসলমান এইরূপে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করায় আর্য সমাজ ও মুসলমানদের মধ্যে বহু বিবাদ ও কলহ ঘটিত। আর্য সমাজ এখনও পঞ্জাবে খুবই শক্তিশালী সম্প্রদায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬ খ্রীঃ): এই মহাপুরুষ ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্যসমাজের সহিত প্রচলিত হিন্দুধর্মের যে বিরোধ ঘটে তাহার সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যভাব স্থাপন করিয়া জাতীয় ধর্মভাবকে অনুপ্রাণিত করেন। ইহার বাল্য নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোন শিক্ষাই লাভ করেন নাই। অল্প-বয়সে তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত কালী-মন্দিরের পূজারী ছিলেন। কিন্তু শৈশবকাল হইতেই সাত্ত্বিক ভাবের অনুপ্রেরণা তাঁহাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। নানা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সকল ধর্মই যে সত্য

ধর্মভাব

ও ঈশ্বর-লাভের সহায়, এই বিশ্বাস তাঁহার মনে দৃঢ় হয়। ইহার সত্যতা নির্ধারণের জন্য তিনি বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মের প্রণালী অনুসরণ করিয়া সাধন-ভজন করেন। ধর্মবিষয়ে তাঁহার কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তিনি একেশ্বরবাদেও যেমন বিশ্বাস করিতেন, দেবদেবীর মূর্তি পূজায়ও তেমনি তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। তিনি বলিতেন, এ দুইয়ের যে কোন মতের অনুসরণ করিলেই ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস ছিল; তাই তিনি বলিতেন, 'যত মত তত পথ'। তাঁহার মন আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ ছিল এবং তিনি সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। জীবমাত্রকেই তিনি শিবজ্ঞান করিতেন, এবং এইজন্য মনুষ্যের সেবা করা তিনি ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়াই মনে করিতেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বিভিন্ন ধর্মের একত্ববোধ

তাঁহার বিশিষ্ট ধর্মমত

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার ধর্মমত দেশে ও বিদেশে প্রচার করেন। গার্হস্থ্য জীবনে তাঁহার নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎকালে উভয়ে উভয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন। তাঁহার উদ্যোগের ফলে বর্তমান কালে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ ভারতবর্ষের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে ইউরোপ

তাঁহার জীবন ও বৈশিষ্ট্য

রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ প্রতিষ্ঠা

স্বামী বিবেকানন্দ

ও আমেরিকার অনেক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুসমাজ হইতে পৃথকভাবে এই মতানুযায়ী কোন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। প্রচলিত হিন্দুধর্ম অর্থাৎ দেব-দেবীর পূজার সার্থকতা এবং পাশ্চাত্য জগতে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দ হিন্দুজাতির মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল ধর্মের দিক দিয়া নহে, যাহাতে রাজনীতিক ও সামাজিক উন্নতির দ্বারাও ভারতবাসী বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ জাতির সমকক্ষ হইতে পারে, তাহার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

নবজীবনের সঞ্চার

ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির উন্নতি

ভারতের ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে আরও অনেক মনীষীর অবদান আছে। ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সৈয়দ আহমদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগর ঃ সুবিখ্যাত মহামনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২০-১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ) দেশকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অতি দরিদ্র হইলেও তিনি অক্লান্ত চেষ্টায় ও প্রতিভা-বলে সংস্কৃত কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত হন। ধীরে ধীরে তিনি ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে, পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বাংলার শিক্ষার মানকে উন্নত করিয়া তোলেন, এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্থানে মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার উদ্যোগে হিন্দু মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশনের সঙ্গে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহা 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামেই এখন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি দেশের ছোট ও বড় শিক্ষার্থীদের জন্য 'বর্ণ-পরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'সীতার বনবাস', 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি বহু বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়া আধুনিক 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক' নামে খ্যাতি লাভ করেন। কেবল পাণ্ডিত্য ও শিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টাই তাঁহার একমাত্র কীর্তি নহে; হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন ও বহু বিবাহের প্রত্যাখ্যান,

তাঁহার বৈশিষ্ট্য

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা

শিক্ষার জন্য নানা বাংলা পুস্তক রচনা ও অন্যান্য কৃতিত্ব

স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা, জনগণের প্রতি দয়া ও দানশীলতা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

সৈয়দ আহ্‌মদ (১৮১৭-১৮৯৮): যখন সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয় তখন সৈয়দ আহ্‌মদ ইংরেজ সরকারের অধীনে উত্তর প্রদেশে সদর আমিন পদে নিযুক্ত ছিলেন; এই বিদ্রোহ দমনে গভর্ণমেণ্টকে সহায়তা করায় তিনি ইংরেজ সরকারের প্রিয়পাত্র হন। ইহার সুযোগ লইয়া তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় হিন্দুদের তুলনায় অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতিসাধনে যত্নবান হন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত মুসলমান সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর নহে, এবং ইহার অভাবেই মুসলমান সম্প্রদায় সরকারী চাকুরী, রাজনীতিক অধিকার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই হিন্দুদের বহু পশ্চাতে রহিয়াছে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহ্‌মদ বিলাত যান এবং কেবল সাদর সম্ভাষণ নহে, স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করার সুযোগ ও সম্মান পান। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা লইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে এক চিঠিতে তিনি লেখেন যে শিক্ষা, সাধুতা ও আচারের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইংরেজের তুলনায় ভারতবাসী পশু বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য। তিনি পূর্বেই গাজীপুরে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (১৮৬৪) এবং ইংরেজী ভাষায় লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক বই উর্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিলাতের অক্স্‌ফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে আলিগড়ে মহোমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল

সৈয়দ আহ্‌মদ

কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বড়লাট লর্ড লিটন ১৮৭৭ খ্রীঃ ৮ই জানুআরি ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য তিনি বিলাত হইতে ইংরেজ অধ্যক্ষ আনয়ন করেন। এই আবাসিক কলেজটির মাধ্যমে তিনি মুসলমান ছাত্রদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি লাভের অপূর্ব সুযোগ ও সুবিধা দেন। ৬০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ হিন্দু সমাজে যেরূপ নবজাগরণ আনিয়াছিল, আলিগড় কলেজ ও পরে ইহার রূপান্তর আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রগণও মুসলমান সম্প্রদায়ে সেরূপ সাংস্কৃতিক যুগান্তর ঘটাইয়াছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত "মহোমেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের" প্রবর্তন করিয়া সৈয়দ আহ্‌মদ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। যে সর্ববিধ উন্নতি ফলে মুসলমান সম্প্রদায় বিংশ শতকে ভারতে একটি নবীন জাতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে—তাহার কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে সৈয়দ আহ্‌মদ দাবি করিতে পারেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া ঃ ১৮৫৭ সনের ভারতীয় বিদ্রোহ এবং তাহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

সূচনা ঃ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও প্রকৃত পক্ষে অবসান ঘটিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই বিরাট ভূখণ্ডে তখন চলিল শুধু যুদ্ধের পর যুদ্ধ, হত্যা আর লুণ্ঠনের তাণ্ডব নৃত্য। "পরে সেই তাণ্ডবের ধূম্রধূলি যখন অপসারিত হইল, তখন দেখা গেল সকলের উপর জয়লাভ করিয়া সদম্ভ পদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ইংরেজ শক্তি।" তার পরের কাহিনী ইংরেজ শক্তির দ্রুত সম্প্রসারণের কাহিনী। শতবর্ষের মধ্যে (১৭৫৭-১৮৫৭) ইংরেজ প্রভুত্ব ও ইংরেজ শাসন বৃহৎ বটবৃক্ষের মত তাহার সহস্র শিকড় সমগ্র ভারতে প্রসারিত করিল।

ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া ঃ রক্তাক্ত যুদ্ধ বিগ্রহ, সিংহাসন লইয়া নিষ্ঠুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শাসকের পরিবর্তন কিম্বা রাজ্য সীমানার সঙ্কোচ ও প্রসার—ভারতে এসকল কিছুই নূতন নহে। কিন্তু উচ্চ রাজনীতির এই দারুণ কোলাহল রাজা ও রাজপুরুষ, আমীর ও ওমরাহ, সেনাপতি ও সৈন্যবাহিনী—ইহাদের মধ্যেই

আবদ্ধ থাকিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতের জনগণ গতানুগতিক পরিবর্তনহীন জীবন যাপনেই অভ্যস্ত ছিল। ব্রিটিশ শাসনের সর্বব্যাপী শাসনপদ্ধতি তাহাদের কাছে একেবারেই নূতন। এই 'নূতন' আসিয়া তাহাদের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন ধারায় প্রচণ্ড তরঙ্গ বিক্ষোভ জাগাইল। এই বিক্ষোভই পরিণত হইল ভারতের নানা অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খণ্ড খণ্ড গণ বিদ্রোহে। বিক্ষিপ্ত এই বিদ্রোহ সমূহের উপলক্ষ ধর্ম সংক্রান্ত, অর্থনীতি সংক্রান্ত ও রক্ষণশীল সমাজ সংক্রান্ত কারণগুলির সহিত কিম্বা ভারতের আদিবাসীদের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারমূলক সংঘর্ষ-প্রবণতার সহিত জড়িত ছিল।

বাংলাদেশে ফরাইজি আন্দোলন এবং উত্তর ভারতে রায়বেরিলি নিবাসী সইদ আহ্‌মদের নেতৃত্বে ওয়াহাবি আন্দোলন সবচেয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী (উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে মধ্যকাল পর্যন্ত) হইয়াছিল। খ্রীষ্টান ইংরেজের প্রভুত্বের ও শাসনের অবসান করিয়া মুসলমান প্রভুত্ব আবার ফিরাইয়া আনাই ছিল এই দুইটি বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য। ফরাইজি আন্দোলনের পশ্চাতে ধনী জমিদারদের হাত হইতে নিগৃহীত দরিদ্র কৃষককুলকে বাঁচাইবার প্রচেষ্টাও ছিল। ওয়াহাবি আন্দোলন প্রথমত ও প্রধানত ভারতের মুসলমান জনগণের ধর্মীয় আন্দোলনই ছিল। কিন্তু শেষের দিকে ইহা মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক যুদ্ধ বিগ্রহে পরিণত হইয়া ইংরেজ সরকারকে অনেক পরিমাণে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। পরে ইংরেজ এই আন্দোলনের মূলোচ্ছেদ করে। বেরিলিতে (উত্তর প্রদেশে) বিদ্রোহ, দক্ষিণ ভারতে পলিগার জাতির বিদ্রোহ, আদিবাসী কোলদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং সাঁওতালদের বিদ্রোহ—এই সকল ঘটনাও উল্লেখ-যোগ্য। ব্রিটিশ সরকার একে একে সকল বিদ্রোহই দমন করিয়াছিল। এই সকল ব্যর্থ বিক্ষিপ্ত ছোট খাটো বিদ্রোহের পরে ঘটে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ।

জনগণের বিক্ষিপ্ত ভাবে নানা বিদ্রোহ : ফরাইজি এবং ওয়াহাবি আন্দোলন

অন্যান্য বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেও ইংরেজ সামরিক বিভাগের ভারতীয় সিপাহীদের নানা কারণে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ সময় সময় প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের রূপ ধারণ করিয়াছিল। মূলতঃ ইহার জন্য দায়ী ছিল ইংরেজের সামরিক আইন শৃঙ্খলার নূতনত্ব, শাদা ও কালা সৈন্যের মধ্যে তারতম্য এবং 'কালার' উপর অর্থ নৈতিক অবিচার, সিপাহীদের ধর্মনাশের আতঙ্ক প্রভৃতি। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে ভেলোর বিদ্রোহ, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারাকপুর শিবিরে বিদ্রোহ, ১৮৪৪, ১৮৪৯, ১৮৫০ এবং

১৮৫৭ সালের আগে সিপাহীদের বিক্ষোভ

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে চারটি পর পর বিদ্রোহ—এই সকল ঘটনা সিপাহীদের অসন্তোষ জনিত বিক্ষোভের পরিচায়ক।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণঃ ভারতীয়-বিদ্রোহের কারণগুলি পূর্বোক্ত 'ব্রিটিশ শাসনের' প্রতিক্রিয়ারই পরিণতি। জবরদস্ত শাসক ও ধুরন্ধর সাম্রাজ্য বিস্তারকারী ডালহৌসী ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিলেন। তাঁহার স্থানে ভাইকাউন্ট ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২) বড়লাট হইয়া আসিলেন। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই ভারতের নানা স্থানে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা হইল।

বৈদেশিক শাসনে অসন্তোষের সৃষ্টি

বৈদেশিক ইংরেজগণের জবরদস্ত শাসনের ফলে ভারতব্যাপী জনসাধারণের মধ্যে এই সময় একটা ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং নানা প্রকার আশঙ্কার ভাব বিরাজ করিতেছিল। ডালহৌসিকে নানা অজুহাতে দেশীয় রাজ্য গ্রাস করিতে দেখিয়া রাজন্যবর্গের আতঙ্ক হইল। তাঁহারা ভয় করিলেন যে একটির পর একটি দেশীয় রাজ্য ইংরেজ যে ভাবে অধিকার করিতেছে, তাহাতে সামান্য একটু শাসনাধিকারও তাঁহাদের আর থাকিবে না। প্রত্যেকে ভাবিলেন এইবার বুঝি তাঁহার নিজের পালা আসিবে।

দেশীয় রাজাদের আশঙ্কা

ভারতীয় জনসাধারণ রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, সামাজিক সংস্কার ও ইংরেজী শিক্ষা এবং অন্যান্য নূতন বিধানের প্রবর্তনে ভীষণ সন্দিগ্ধ হইয়া ভাবিতেছিল যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে খ্রীষ্টান করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল কার্য করিতেছে। ডালহৌসি অযোধ্যা ও অন্যান্য রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেই ঐ সমুদয় প্রদেশের বহু যুদ্ধ-ব্যবসায়ী বেকার হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল লোক দেশের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বিস্তারে সহায়তা করিতেছিল। এই ভাবে ভারতীয় বিদ্রোহের নানা প্রত্যক্ষ কারণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ডালহৌসি।

খ্রীষ্টান হইবার ভয়

নানা রাজ্যের বেকার সৈন্য ও দেশীয় সিপাহীদের অসন্তোষ

তারপর সিপাহীদের কথা। নানা অসুবিধার ও অবিচারের ফলে বহুদিন হইতেই তাহারা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে সৈন্যদলের মধ্যে এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন সিপাহীদের বিদ্রোহের সাক্ষাৎ কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই রাইফেলে টোটা ভরিবার পূর্বে তাহার একাংশ দাঁত দিয়া কাটিয়া লইতে হইত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে সৈন্য-দলের মধ্যে গুজব রটিয়া গেল যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাতি নষ্ট করিবার জন্য টোটার মধ্যে

বিদ্রোহের সাক্ষাৎ কারণ এনফিল্ড রাইফেল প্রবর্তন

শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত হইয়াছে। পরবর্তী অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছিল যে, ঐ টোটা তৈয়ারি করিতে সত্যই শূকর অথবা গরুর চর্বি ব্যবহৃত হইত।

ব্যারাকপুরের বিদ্রোহ আরম্ভ

চর্বি মিশ্রিত টোটার বিবরণ প্রচারিত হওয়ার পরেই প্রথমে বহরমপুর এবং পরে কলিকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুরের সৈন্যগণ ঐ টোটা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিল। মঙ্গল পাণ্ডে নামক ব্যারাকপুরের একজন সিপাহী প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইল, এবং একজন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ বাধা দেওয়ায় তাহাকে আক্রমণ করিয়া আহত করিল (২৯শে মার্চ, ১৮৫৭)।

বিদ্রোহের প্রসার: ব্যারাকপুরের বিদ্রোহ শীঘ্রই দমিত হইলেও ইহা চারিদিকে ছড়াইয়া গেল। ১০ মে মীরাটের কতক সিপাহী টোটা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করায় কারারুদ্ধ হইল। ইহাতে অন্য সিপাহীরা একযোগে বিদ্রোহী হইয়া কারারুদ্ধ সহকর্মীদের উদ্ধার করিয়া আনিল, সঙ্গে সঙ্গে বহু ইউরোপীয় কর্মচারীকে হত্যা করিয়া এবং তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিয়া দিল্লী অভিমুখে রওনা হইয়া গেল। সেখানেও সিপাহীরা ইউরোপীয়গণকে হত্যা করিল, এবং তাহাদের ঘর বাড়ী ধ্বংস করিয়া ফেলিল। তাহারা মুঘল সম্রাট-বংশীয় বাহাদুর শাহ্‌কে ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। শীঘ্রই অন্যান্য স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহ করিল এবং দিল্লীতে আসিয়া মিলিত হইল। তাহাদের সাফল্যের সংবাদ প্রচারিত হইলে বিদ্রোহ শীঘ্রই উত্তর প্রদেশ, বুন্দেল-খণ্ড ও মধ্যভারতের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলি ও ঝান্সী বিদ্রোহের প্রধান প্রধান কেন্দ্রস্থল হইল।

মীরাটে বিদ্রোহ

বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা

বিদ্রোহের বিস্তার

আম্বালা হইতে ইংরেজ সৈন্য অগ্রসর হইয়া দিল্লীর উত্তরস্থ পাহাড় অধিকার করিল। পঞ্জাব হইতে আরও সৈন্য আসিয়া যোগ দেওয়ায় দিল্লী অধিকার করা সম্ভব হইল। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীর কাশ্মীর ফটক বারুদে উড়াইয়া দেওয়া হইল এবং ২০শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ সৈন্য দিল্লী অধিকার করিল। ইংরেজ সেনানায়ক জন নিকলসন এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। লক্ষ্ণৌর সিপাহীরা ৩০ মে বিদ্রোহ করিলে চীফ কমিশনার স্যার হেনরী লরেন্স ঐ স্থানের সমস্ত ইউরোপীয় অধিবাসীকে লইয়া ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির আবাস-ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। একদল সিপাহী ইংরেজদের পক্ষে রহিল; কিন্তু বহু সিপাহী বিদ্রোহী এই আবাস ভবনে ইংরেজদিগকে অবরুদ্ধ করিল। নভেম্বর মাসে

ইংরেজ সৈন্যের দিল্লী অধিকার

লক্ষ্ণৌর ইংরেজগণ অবরুদ্ধ

স্যার কলিন্ ক্যাম্বেল আসিয়া অবরুদ্ধ ইংরেজগণকে মুক্ত করিলেন। অবশেষে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইলে লক্ষ্ণৌ পুনরধিকৃত হইল।

কানপুরের বিদ্রোহের নায়ক নানা সাহেব

কানপুরের বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানা সাহেব। পিতার পেন্সন হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি ইংরেজের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার বাসস্থান কানপুরের নিকটে বিঠুরে নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কানপুরের প্রায় এক হাজার ইংরেজ সৈন্য ও ইংরেজ অধিবাসী একটা কাঁচা দেওয়ালের আড়ালে আশ্রয় লইয়া অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিতেছিল। নানা সাহেব আশ্বাস দিলেন যে তিনি তাহাদিগকে নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে দিবেন। এই আশ্বাসের উপর নিভর করিয়া তাহারা নদীর ধারে যাইবামাত্র নীল সাহেবের অত্যাচারে উত্তেজিত সিপাহীরা গুলিবর্ষণ করিয়া তাহাদের অধিকাংশকেই হত্যা করিল; যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহারা সকলে বন্দী হইল। বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য কানপুরের নিকট পৌঁছিলে বিদ্রোহীরা দুই শতেরও অধিক ঐ সকল বন্দী রমণী ও শিশুকে হত্যা করিয়া নিকটবর্তী একটি কূপে তাহাদের দেহ নিক্ষেপ করে (১৫ই জুলাই)। ১৭ই জুলাই তারিখে হ্যাভলক কানপুর উদ্ধার করিলেন।

বেরিলি অধিকার

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত বেরিলির সিপাহীরা মে মাসে বিদ্রোহী হইয়া ওয়ারেন্ হেস্টিংসের আমলে রোহিলা যুদ্ধে হত রোহিলা-নায়ক হাফিজ রহমৎ খাঁর পৌত্রকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। এক বৎসর পরে স্যার কলিন ক্যাম্বেল এই নগর পুনরায় উদ্ধার করেন।

তাঁতিয়া টোপি

লক্ষ্মীবাঈ-এর শৌর্যবীর্য

জুন মাসে ঝান্সী অঞ্চলের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া ইউরোপীয়গণকে হত্যা করিল এবং দিল্লীর দিকে রওনা হইল। লর্ড ডালহৌসী ঝান্সী রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করায় ঝান্সীর ত্রয়োবিংশতিবর্ষ বয়স্কা বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজ সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথমে বিদ্রোহে যোগ দেন নাই। তবু ইংরেজ সরকার তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি প্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে রাণী লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে গ্রহণ করিলেন। নানা সাহেবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ তাঁতিয়া টোপি তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে যত নায়ক দাঁড়াইয়াছিলেন সাহসে ও বীর্যবত্তায় লক্ষ্মী-বাঈ-এর সহিত তাহাদের একজনেরও তুলনা হইতে পারে না। ইংরেজ সৈন্য

ঝান্সী আক্রমণ করিলে তিনি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। কিন্তু ঝান্সী ইংরেজের হস্তগত হইল এবং লক্ষীবাঈ ঝান্সী ত্যাগ করিলেন। তিনি দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিলেন—'মেরী ঝান্সী নেহী দেউঙ্গী'। অতঃপর তিনি তাঁতিয়া টোপির সহযোগে ইংরেজ মিত্র গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়াকে বিতাড়িত করেন। বিদ্রোহী সৈন্যদের সাহায্যে নানা সাহেব পুনরায় পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠা গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলেন। এই সময় বিলম্ব না করিয়া স্যর হিউ রোজ গোয়ালিয়র পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হন। পুরুষের বেশে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে বীর্যবতী লক্ষীবাঈ স্বয়ং সৈন্য চালনা করিতে করিতে সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন (১৭ই জুন ১৮৫৮)। তাহার পরই গোয়ালিয়র পুনরায় ইংরেজের অধিকৃত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের পরিসমাপ্ত ঘটে। নানা সাহেব কানপুর হইতে নেপালের জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন, তাঁহার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। তাঁহার সেনাপতি তাঁতিয়া টোপি ঝান্সীর রাণীর মৃত্যুর পরেও বহুদিন অপূর্ব বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে তাঁহারই এক সহচর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ইংরেজের হস্তে ধরাইয়া দিলে তাঁহার ফাঁসি হইল। যে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্‌কে বিদ্রোহীরা দিল্লীতে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় কাটাইলেন। তাঁহার দুই পুত্র এবং পৌত্র লেফট্‌নাণ্ট হড্‌সন কর্তৃক ধৃত ও নিহত হইলেন।

তাঁহার মৃত্যু

বিদ্রোহের পরিণতি ও অবসান

বিদ্রোহের স্বরূপ : প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যের রাজগণ কেহই বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই। বিদ্রোহ অবসানের পর এজন্য তাঁহারা উপযুক্ত প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। শিখগণ বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। পঞ্জাবের শাসনকর্তা সার জন লরেন্স পঞ্জাব হইতে যে শিখ ও ইংরেজ সৈন্যদল পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদের সাহায্যে দিল্লী অধিকৃত হওয়ায় বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। এই যুদ্ধ প্রধানত সৈন্যগণের বিদ্রোহ। পরে বর্তমান উত্তর প্রদেশ এবং ইহার সংলগ্ন পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণস্থ কোন কোন অঞ্চলের জনসাধারণও ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। অযোধ্যায় ইহা প্রায় জনযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন ইহা ভারতের প্রথম জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। কিন্তু ভারতের

বিদ্রোহ দমনে শিখদের সাহায্য

বিদ্রোহের প্রকৃতি

এক অংশে সীমাবদ্ধ এই সমুদয় খণ্ড খণ্ড বিপ্লবকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া গণ্য করা অনেকে সঙ্গত মনে করেন না। কারণ ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশ, বিশেষত শিক্ষিত সম্প্রদায়, এই বিদ্রোহের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখান নাই। বিভিন্ন বিদ্রোহী নায়ক ও সৈন্যদলের মধ্যে একযোগে কার্য করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। একদিকে দিল্লীর শেষ মুঘল সম্রাটকে সম্মুখে রাখিয়া মুসলমান সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, অপর দিকে নানা সাহেবের নেতৃত্বে মারাঠা পেশোয়ার সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস—ইহাই ছিল এই বিদ্রোহের রাজনীতিক বৈশিষ্ট্য। এই দুই-এর মধ্যে সংযোগ ছিল না বলিলেই চলে। জাতীয়তাভাবে প্রণোদিত হইয়া দেশের স্বাধীনতা লাভ করাই যে তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার উন্মেষ তখনও হয় নাই। বিদ্রোহী নায়কগণ নিজের লুপ্ত গৌরব ও সম্পদ উদ্ধারে সচেষ্ট ছিলেন, সমগ্র ভারতের ইংরেজশাসন হইতে মুক্তি তাঁহাদের কর্মসূচীতে ছিল না।

জাতীয়তাভাবের অভাব

এই বিদ্রোহে সিপাহীরা ও নানা সাহেবের মত এদেশীয় নায়কগণ নৃশংস হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন, আবার বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইংরেজ সৈন্য এবং সেনানায়কেরাও ততোধিক পৈশাচিক নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বিদ্রোহ সংক্রান্ত সকল বিষয়ের ব্যবস্থায়ই বড়লাট লর্ড ক্যানিং অসাধারণ ধৈর্য ও বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। হীন প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া বিদ্রোহীগণের প্রতি তিনি কঠোর শাস্তিবিধান করেন নাই। কিন্তু ঐ যুগের অদূরদর্শী ইংরেজেরা রক্তপাতের বিনিময়ে রক্তপাতের জন্য চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছিল, এবং তাহারা ক্যানিংকে উপহাস করিয়া 'দয়ার অবতার ক্যানিং' (Clemency-Canning) এই আখ্যা দিয়াছিল।

উভয় পক্ষের নৃশংসতা

লর্ড ক্যানিং-এর দূরদর্শিতা

প্রত্যক্ষ ফল : এই বিদ্রোহের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন পরিচালনার ক্ষমতা চিরদিনের মত লোপ পাইল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অগস্ট তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নূতন এক আইন অনুসারে ব্রিটিশ রাজ্যের হস্তে ভারত-শাসনের সম্পূর্ণ ভার অর্পিত হইল। বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্টের স্থানে ভারতবর্ষের জন্য সেক্রেটারী অব্ স্টেট নামে একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন, এবং কোর্ট অব্ ডিরেক্টার্সের স্থান কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া বা ভারত-পরিষদ গ্রহণ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসান ও ব্রিটিশরাজের শাসনভার গ্রহণ

করিল। এখন হইতে ভারতের বড়লাটের আখ্যা হইল ভাইস্‌রয় (Viceroy) বা রাজপ্রতিনিধি।
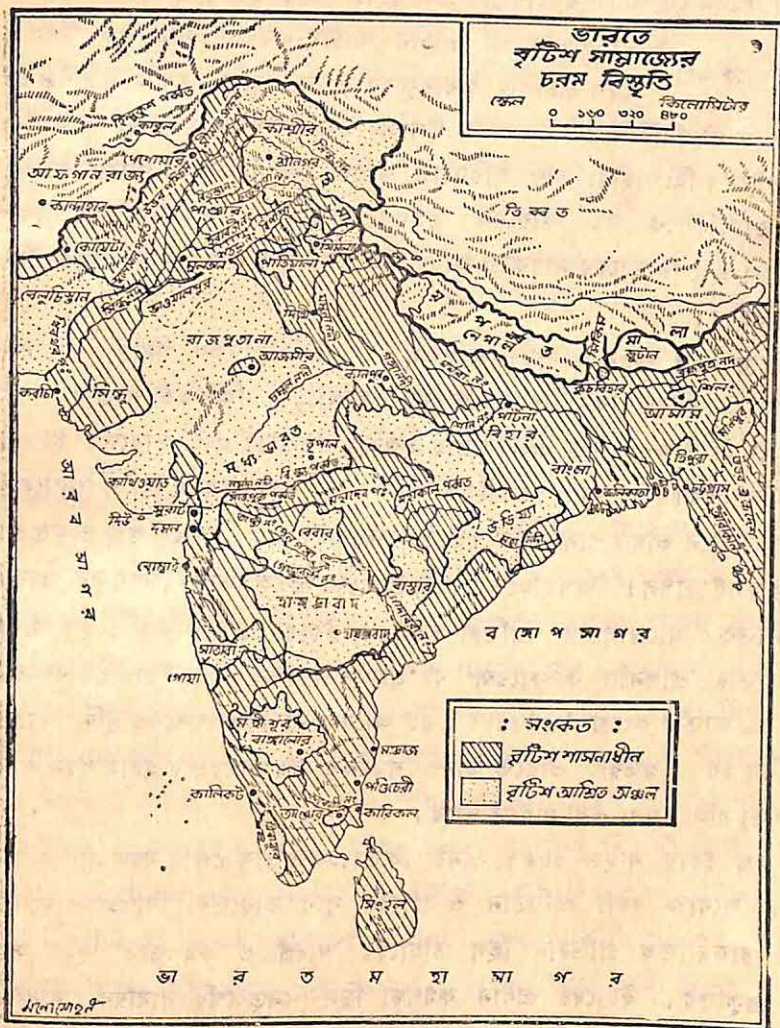
১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে ভারত-শাসন-বিধানের এই সকল গুরুতর পরিবর্তন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাপত্রে ভারতীয় জনসাধারণ ও দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট বিজ্ঞাপিত হইল। ইহাতে বলা হইল, বড়লাট লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইস্‌রয় নিযুক্ত হইলেন। কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারিদিগকে নিজ নিজ পদে বহাল রাখা হইল।

রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা ঃ ইহার গুরুত্ব

বিভিন্ন রাজ্যের সহিত প্রচলিত সমস্ত সন্ধি বলবৎ রহিল। ইংরেজদের যে কোন দেশীয় রাজ্য দখলে আনার আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহাও বিশেষভাবে বলা হইল। মহারাণী আশ্বাস দিলেন যে, অতঃপর ভারতীয় প্রজাগণের ধর্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না; ভারতের প্রাচীন আচার-ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম এবং দেশ-প্রচলিত প্রথাসমূহের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শিত হইবে এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অপক্ষপাতে উপযুক্ত ভারতীয়গণকে সরকারী কর্মে নিযুক্ত করা হইবে; বিদ্রোহীরা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কর্মে পুনরায় রত হইলে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন; কেবল যাহারা ইংরেজ নরনারীর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল এবং বিদ্রোহের নায়কতা করিয়াছিল, তাহাদিগকে যথাযোগ্য শাস্তি দিবার ব্যবস্থা হইবে।

বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা

বিদ্রোহের সুদূর-প্রসারী তাৎপর্য: ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ কিনা এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে ইংরেজের শাসনে এই বিদ্রোহ একটি যুগান্তকারী এবং ভারতের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। একদিকে উনিশ শতকের শেষার্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ অধীনে ভারত শাসন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইল এবং ইহাতে শুভ ও অশুভ দুই প্রকার ফলই ফলিল। অপরদিকে জাতীয়তাবাদের প্রশস্ত ভিত্তির উপর সর্ব ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা হইল। ইহার প্রত্যক্ষ-ফল ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' বা 'জাতীয় সম্মেলন' এবং ইহার দুই বৎসর পর ভারতের 'জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা। এই আন্দোলনই বিংশ শতকের মুক্তি সংগ্রামে পর্যবসিত হয়। সুতরাং ভারতে উনিশ শতকের নব জাগরণের ইহাই পরম ও চরম সার্থকতা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

কিন্তু ইহার সহিত ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে। পূর্বোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠান ও তাহার পূর্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমুদয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল তাহাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ইহাদের প্রধান কর্মপন্থা ছিল—নেতৃবর্গের সাময়িক (সাধারণত মাসিক বা বার্ষিক) সম্মেলনে বক্তৃতা ও প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রে ভারতীয়দের অধিকতর ক্ষমতা ও সুবিধা লাভ করার দাবি। ইহার সহিত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীদের এবং কোন কোন স্থানে জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাহা ছাড়া ১৮৫৭ সনে বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান। কিন্তু পূর্বোক্ত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উনিশ

শতকের শেষ পর্যন্ত দাবি ছিল ব্রিটিশ রাজের ছত্রছায়ায় এবং ব্রিটিশ অনুগ্রহে স্বায়ত্তশাসন। যথাসম্ভব ইংরেজের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া নানাবিষয়ে পশ্চাৎপদ ও বৈষম্যপূর্ণ এই বিরাট দেশটির সামগ্রিক উন্নতিবিধানের দ্বারা ভবিষ্যতে স্বাধীনতার যোগ্য হইবার পটভূমি নির্মাণ-কল্পে তাঁহারা এই নীতি অনুসরণ করিতেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং তাহার ব্যর্থতা হয়তো তাঁহাদের জীবনে এই বিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা দান করিয়াছিল। পরোক্ষভাবে এই কার্যক্রমের ধারক ও বাহক নেতাদের কার্যাবলী চতুর্দশ অধ্যায়ের (খ) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসের বাহিরে যে বিপ্লব আন্দোলন বিংশ শতকের প্রথম ভাগে মূর্ত হইয়া উঠে তাহার প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল "১৮৫৭" খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ। ভারতের স্বাধীনতা লাভের এই সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিংশ শতাব্দীতে ইহা কংগ্রেস আন্দোলনের পাশাপাশ চলিয়াছে এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রায় আর্ধশতাব্দীকাল পরে বিপ্লববাদরা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের ঐতিহকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে কলিকাতার "অনুশীলন" সমিতির অভ্যন্তরে অরবিন্দ ঘোষের প্রত্যহ উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্বামী নিরালম্ব) প্রথম গুপ্ত বিপ্লব সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণা ছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের নায়ক-শ্রেষ্ঠ তাঁতিয়া টোপির আদর্শ ও কর্মধারা। তাঁহার জীবনী পাঠে একথা জানা যায়। মারাঠা বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ মনীষী বিনায়ক দামোদর সাভারকর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লণ্ডনে বসিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহা অনেককেই উদ্দীপনা যোগাইয়াছিল। তিনিই প্রথম ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধরূপে বর্ণনা করেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত ১৮৫৭-এর ভাবধারা বিপ্লব আন্দোলনে বিশেষ কার্যকর ছিল।

বিংশ শতাব্দীর সশস্ত্র, বিপ্লব আন্দোলন ১৮৫৭ পথের দিশারী

সুতরাং ভারতের নবযুগের রাজনীতিক ইতিহাসে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর এবং সুদূর-প্রসারী।

বংশাবলী

(ক) হিন্দু ও বৌদ্ধ আমল

১। মৌর্য বংশ : চন্দ্রগুপ্ত (প্রিয়দর্শন)

বিন্দুসার (অমিত্রঘাত)

অশোকবর্ধন (প্রিয়দর্শী)

(বৃহদ্রথ সহ আরও সাতজন রাজা)

২। গুপ্ত বংশ : শ্রীগুপ্ত বা গুপ্ত

ঘটোৎকচ

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত=কুমারদেবী (লিচ্ছবি)

সমুদ্রগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য

৩। পালবংশ (বঙ্গদেশ):
দয়িতবিষ্ণু
শ্রীবপ্যট
গোপাল (১ম)
ধর্মপাল
বাকপাল
দেবপাল
জয়পাল
বিগ্রহপাল (১ম)
(১ম শূরপাল)
নারায়ণপাল
রাজ্যপাল
গোপাল (২য়)
বিগ্রহপাল (২য়)
মহীপাল (১ম)
নরপাল
বিগ্রহপাল (৩য়)
মহীপাল (২য়)
শূরপাল (২য়)
রামপাল
রাজ্যপাল
কুমারপাল
মদনপাল
গোপাল (৩য়)
৪। সেন বংশ (বঙ্গদেশ):
বীরসেন
সামন্তসেন
হেমন্তসেন
বিজয়সেন
বল্লালসেন
লক্ষ্মণসেন
বিশ্বরূপসেন
কেশবসেন
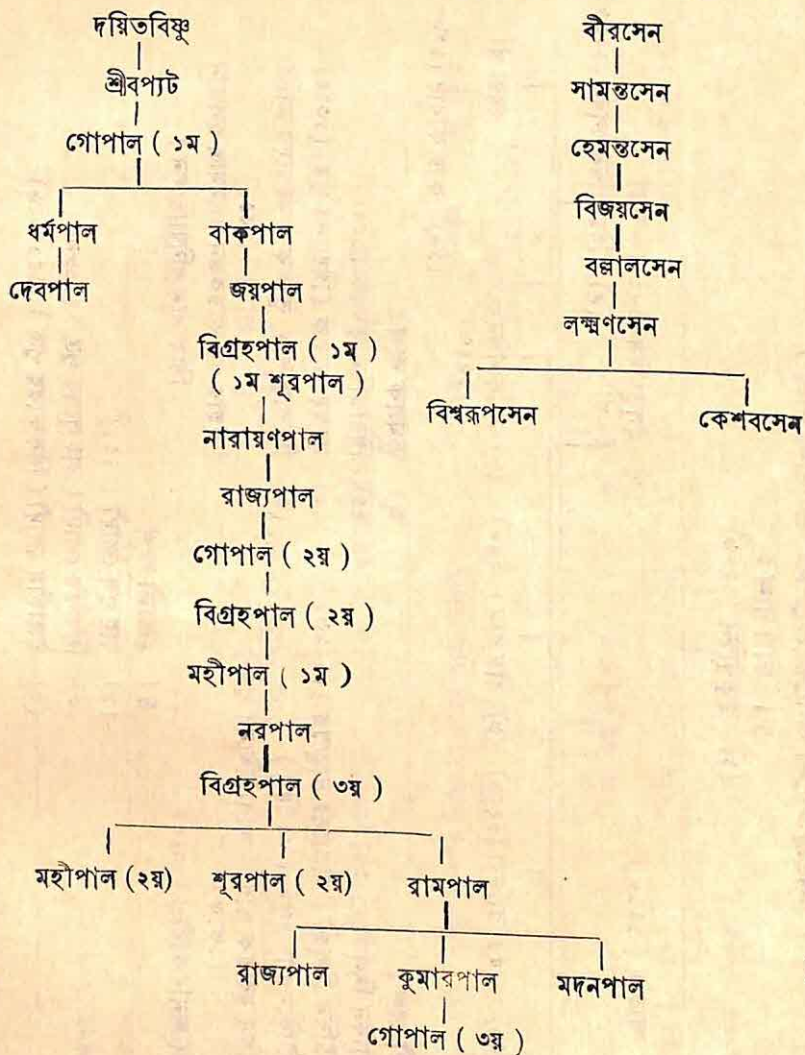
(খ) মুসলমান আমল

(সিংহাসনে আরোহণের তারিখ সহ)

২। খিল্‌জী বংশ :

(১) জালালুদ্দিন খিল্‌জী (১২৯০)
(২) আলাউদ্দিন খিল্‌জী (জালালের ভ্রাতুষ্পুত্র) (১২৯৬)
(৩) আলাউদ্দিনের শিশুপুত্র (৩৫ দিন)
(৪) কুতবুদ্দিন মুবারক শাহ্ (আলাউদ্দিনের পুত্র) (১৩১৬)
(৫) খসরু (অনধিকারী) (১৩২০)

৩। তুঘলক বংশ :

(১) গিয়াসুদ্দিন তুঘলক (১৩২০)
(২) মুহম্মদ তুঘলক (গিয়াসের পুত্র) (১৩২৫)
(৩) ফিরোজ শাহ্ তুঘলক (মহম্মদের জ্ঞাতি ভ্রাতা) (১৩৫১)
(ইহার পর কয়েকজন নামেমাত্র স্থলতান সিংহাসনে বসিয়াছিলেন)

৪। লোদী বংশ

(১) বাহ্‌লুল লোদী (১৪৫১)
(২) সিকন্দর লোদী (বাহ্‌লুলের পুত্র) (১৪৮৯)
(৩) ইব্রাহীম লোদী (সিকন্দরের পুত্র) (১৫১৭-২৬)

৫। মুঘল বংশ
(১) বাবর (১৫২৬)
(২) হুমায়ুন (১৫৩০)
কামরান্
হিন্দোল
আস্কারি
(৩) আকবর (১৫৫৬)
মির্জা হাকিম
(৪) জাহাঙ্গীর (সেলিম) (১৬০৫)
মুরাদ
দানিয়েল
খস্রু
পার্ভিজ
(৫) শাহ্জাহান (১৬২৮)
শারীয়র
দারা
সুজা
(৬) ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮)
মুরাদ
মুহম্মদ
(৭) বাহাদুর শাহ (১ম বা প্রথম শাহ আলম (১৭০৭)
আজাম
আকবর
কামবক্স
(১১) নেকুসিয়র (১৭১৯)
(৮) জান্দাহার শাহ (১৭১২)
আজিম উশ্শান
রফিউশ্শান
জাহানশাহ
(১৫) দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪)
(৯) ফরুরুখ্সিয়র (১৭১৩)
(১৩) মুহম্মদ শাহ (১৭১৯)
(১৬) দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯)
(১৪) আহম্মদ শাহ (১৭৪৮)
(১৭) দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬)
(১৩ক) মুহম্মদ ইব্রাহিম (১৭২০)
(১২) রফিউদ্দৌলা বা দ্বিতীয় শাহ্জাহান (১৭১৯)
(১০) রফিউদ দারাজৎ (১৭১৯)
(১৮) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৮)

৬। মারাঠা বংশ ঃ

শাহ্‌জী
|
শিবাজী (জন্ম ১৬৩০, মতান্তরে ১৬২৭ ; রাজপদে অভিষেক ১৬৭৪ ; মৃত্যু ১৬৮০)

- শম্ভাজী (১৬৮০)
  - শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজী (১৭০৮)
- রাজারাম=তারাবাঈ (১৬৮৯)
  - তৃতীয় শিবাজী (১৭০০)
    - রামরাজা (১৭৪৯)
      - দ্বিতীয় শাহু (১৭৭৬)
        - প্রতাপ সিংহ (১৮১০)
        - শাহ্‌জী (১৭৩৯)
  - দ্বিতীয় শম্ভাজী (১৭১০)

৭। পেশোয়া বংশ

(১) বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩)

- (২) বাজীরাও (১৭২০)
  - (৩) বালাজী বাজীরাও (১৭৪০)
    - বিশ্বাসরাও
    - (৪) মাধবরাও (১৭৬১)
    - (৫) নারায়ণরাও (১৭৭২)
      - (৭) মাধবরাও নারায়ণ (১৭৭৪)
  - (৬) রঘুনাথ রাও (রাঘব) (১৭৭৩)
    - (৮) দ্বিতীয় বাজীরাও (১৭৯৬)
      - নানাসাহেব
- চিমনজী
  - সদাশিবরাও ভাও
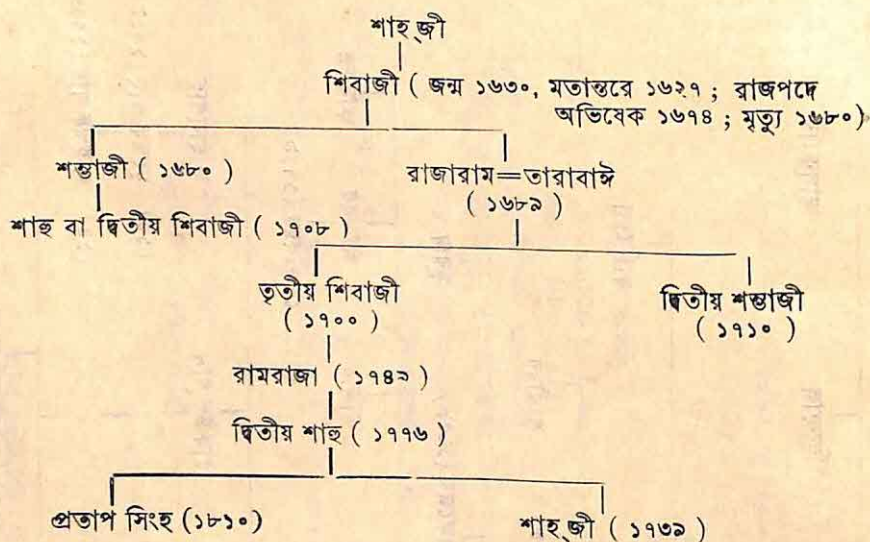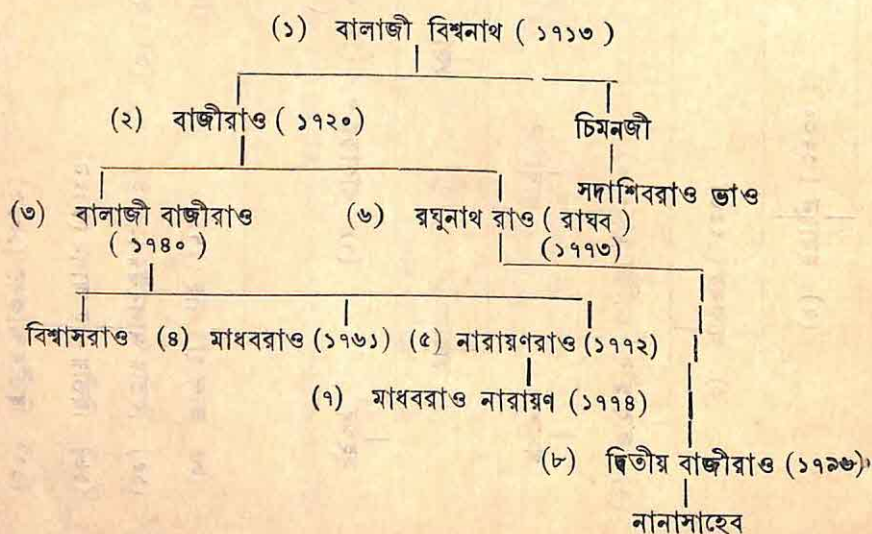
প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

১। ভৌগোলিক পরিবেশ দেশের অধিবাসী এবং জাতীয় ইতিহাস গঠনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা বর্ণনা কর।

২। ভারতবর্ষে কিরূপভাবে সংস্কৃতির সমন্বয় সম্ভবপর হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। 'বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্য'—এই উক্তির সার্থকতা দেখাও।

৪। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। ভারতবর্ষের অধিবাসী ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। প্রাচীন যুগের ভারত ইতিহাসের উপাদানগুলির বিবরণ দাও।

২। মধ্যযুগের ও আধুনিক যুগের উপাদানগুলির বিবরণ দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

১। সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি?

২। আর্য বলিতে কাহাদের বুঝায়? তাঁহারা কিরূপভাবে ভারতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিলেন তাহা বর্ণনা কর।

৩। বেদ ও উপনিষদের মধ্যে আর্যদের সংস্কৃতি ও ধর্মের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা লিখ।

চতুর্থ অধ্যায়

১। গৌতম বুদ্ধের জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। তাঁহার ধর্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লিখ।

২। জৈনধর্মের উৎপত্তি বর্ণনা কর এবং বৌদ্ধ ধর্মের সহিত তাহার তুলনা কর।

৩। মহাবীরের জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪। টীকা লিখ :—তীর্থঙ্কর এবং জৈন ধর্মশাস্ত্র।

পঞ্চম অধ্যায়

১। পারসিক আক্রমণ ও উহার ফলাফল বর্ণনা কর।

২। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বর্ণনা দাও। ঐ আক্রমণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল কি হইয়াছিল?

৩। বহ্লীক গ্রীক আক্রমণকারীদের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ইহাদের প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল?

৪। কুষাণ বলিতে কাহাদের বুঝায়? কুষাণ সম্রাটদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখ। কুষাণ যুগে ভারতীয় সভ্যতার অবস্থা বর্ণনা কর।

৬। টীকা লিখ :—শকগণ ও রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। মৌর্যযুগে মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
২। অশোকের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।
৩। গুপ্তযুগে মগধ সাম্রাজ্যের কিভাবে পুনরভ্যুদয় ঘটিল তাহা বর্ণনা কর।
৪। গুপ্ত যুগকে প্রাচীন ভারতের 'স্বর্ণ যুগ' বলা হয় কেন?
৫। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ফা-হিয়েনের বর্ণনা হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহার বর্ণনা দাও।
৬। বিজেতা ও শাসক হিসাবে হর্ষবর্ধনের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৭। মেঘাস্থনিসের বিবরণে সমসাময়িক ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর যে আলোক-সম্পাত করিয়াছে তাহার বিবরণ দাও।
৮। পাল যুগে গৌড় সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর।
৯। ধর্মপালের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।
১০। টীকা লিখ :—গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্য ও শশাঙ্ক।

সপ্তম অধ্যায়

১। মৌর্যযুগে ভারতের ধর্ম ও শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। গুপ্তযুগে ভারতের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম ও সমাজ-জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৩। হিউয়েন্-সাঙ্-এর বর্ণনা হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা নিজের ভাষায় লিখ।
৪। গুপ্ত পরবর্তী যুগে বাংলাদেশের শিল্পকলা, সমাজ ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দাও।
৫। গুপ্ত পরবর্তী যুগে দক্ষিণ ভারতের ধর্ম ও সামাজিক জীবনযাত্রার বিবরণ দাও।
৬। গুপ্ত পরবর্তী যুগে দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহার বিবরণ দাও।

অষ্টম অধ্যায়

১। ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ধারাবাহিক ইতিহাস দাও।

নবম অধ্যায়

১। ভারতে সর্বপ্রথম কে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
২। ইলতুৎমিসের রাজত্বকাল সংক্ষেপে বর্ণনা কর এবং শাসক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব বিচার কর।

৩। কাহাকে তোমরা দাসবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান মনে কর ? কারণগুলি লিখ।
৪। বিজেতা ও শাসক হিসাবে আলাউদ্দীন খিল্‌জীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৫। মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালের বর্ণনা কর।
৬। বাবরের ভারত জয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের অবস্থার বর্ণনা দাও।
৭। দিল্লীর সুলতানীর পতনের জন্য মুহম্মদ তুঘলক কতখানি দায়ী ?
৮। বাবরের জীবনী ও কৃতিত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৯। সাম্রাজ্য শাসনে আকবর কি নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ?
১০। মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি কে সুদৃঢ় করেন ? এই জন্য তিনি কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ?
১১। 'শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি ও গৌরব চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল'—উক্তিটির সত্যতা সম্পর্কে তোমার মতামত কি ?
১২। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতির গুণাগুণ বর্ণনা কর।
১৩। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

১। সুলতানী আমলে ধর্মপ্রচারকগণের আবির্ভাবের কারণ কি ? কয়েকজন প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারকের নাম উল্লেখ কর এবং তাঁহাদের উপদেশাবলী লিখ।
২। সুলতানী আমলের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের একটি বিবরণ দাও।
৩। মুঘল যুগের সমাজ ও অর্থ নৈতিক অবস্থার একটা বিবরন দাও।
৪। মুঘল যুগের সাহিত্য ও স্থাপত্যের একটা বর্ণনা দাও।

একাদশ অধ্যায়

(ক) ১। মারাঠা বলিতে কাহাদের বুঝায় ? তাহারা কোথায় বাস করিত ? শিবাজীর বাল্যজীবনের একটা বিবরণ দাও।
২। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থানের বর্ণনা দাও।
৩। শিবাজীর মৃত্যু হইতে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত মারাঠা জাতির ইতিহাস বর্ণনা কর।

(খ) ১। শিখ বলিতে কাহাদের বুঝায় ? শিখ শক্তির অভ্যুদয়ের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
২। রণজিৎ সিংহের জীবনী ও কৃতিত্বের বিষয় আলোচনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। ভারতে বিদেশীয় বণিকসংঘের আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর।
২। ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ফরাসীদের পরাজয়ের কারণ কি ?
৩। পলাশী হইতে বক্সার পর্যন্ত ইংরেজ কর্তৃক বাংলা দেশে আধিপত্য বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। ইংরেজ সরকার ও টিপু সুলতানের মধ্যে সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ লিখ।
২। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের রাজত্বকালে মারাঠা ও মহীশূরের সহিত ইংরেজ সরকারের যুদ্ধের বিবরণ দাও।
৩। ইংরেজ ও শিখদের মধ্যে যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
৪। প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
৫। ভারতে ব্রিটিশ অধিকার বিস্তারের নিমিত্ত লর্ড হেষ্টিংস্ যে সকল যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা কর।
৬। ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপনে লর্ড ওয়েলেস্লির অনুসৃত নীতিগুলি বর্ণনা কর।
৭। ক্লাইভকে কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা মনে করা যায়?
৮। লর্ড রিপণের সংস্কার নীতি বর্ণনা কর। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের আন্দোলনের কারণ কি?

চতুর্দশ অধ্যায়

১। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসন সংস্কার বর্ণনা কর।
২। লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালীন সংস্কারগুলি বর্ণনা কর।
৩। লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালীন সংস্কারগুলির ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।
৪। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালীন সংস্কারগুলির ধারাবাহিক বর্ণনা দাও।
৫। ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্কারের আন্দোলনে রামমোহন ও তাঁহার সৃষ্ট ব্রাহ্মসমাজের অবদান কি?
৬। নব্যবাংলা গঠনে ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের অবদান লিখ।
৭। সমাজসংস্কার আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব চন্দ্রের কার্যাবলীর বর্ণনা দাও।
৮। আলিগড় আন্দোলন ও স্যার সৈয়দ আহমদ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৯। শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানগুলির বর্ণনা দাও।
১০। হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলনে পরমহংসদেবের অবদান কি?
১১। টীকা লিখ :—প্রার্থনা সমাজ, আর্যসমাজ ও স্বামী দয়ানন্দ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

১। সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলি বর্ণনা কর।
২। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি, প্রসার ও ফলাফল বর্ণনা কর।
৩। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতের শাসনতন্ত্রের কিরূপ পরিবর্তন হইল?
৪। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার গুরুত্ব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

ভারত ও তাহার জনগণ
নব-প্রবর্তিত (ইতিহাস)

নব-প্রবর্তিত পাঠক্রমে ইতিহাস পঠন-পাঠনের যে উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাপর্ষদ নির্ধারিত করিয়াছেন এবং যে নমুনা প্রশ্নের পরিকল্পনা পর্ষদবার্তায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রশ্নপত্র রচনার তিনটি দিক নির্ধারিত করা হইয়াছে। (এক) **প্রশ্নপত্রে পাঠক্রম সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা দেওয়া।** (দুই) **প্রশ্নাবলী উদ্দেশ্য-ভিত্তিক রচনা করা।** (তিন) **প্রশ্নপত্রে মূল্যমান কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করা।** নবম ও দশম শ্রেণীর সমগ্র পাঠক্রমকে পাচটি পর্বে ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি পর্ব থেকে প্রশ্ন করা হইবে। 'ক' বিভাগে থাকিবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত। 'ক' বিভাগে তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে প্রথম হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদ ; দ্বিতীয় পর্বে নবম হইতে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত। তৃতীয় পর্বে দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত। চতুর্থ পর্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (প্রথম হইতে সপ্তম) এবং ইহা 'খ' বিভাগে সন্নিবেশিত হইবে। 'গ' বিভাগে থাকিবে পঞ্চম পর্ব (ভারতীয় সংবিধান) প্রথম হইতে তৃতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত। ইতিহাসের ধার্য ১০০ নম্বরের মধ্যে লিখিত প্রশ্নের জন্য ৯০ নম্বর থাকিবে।

প্রশ্নপত্রের ধারা ও মান নির্দেশন

(ক) বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective type Questions)
প্রশ্নসংখ্যা ৯, প্রতি প্রশ্নের মান—১ — মোট মান ৯
বিকল্প
প্রদত্ত মানচিত্রে ঐতিহাসিক স্থান নির্দেশক প্রশ্ন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type Question)
প্রশ্নসংখ্যা ৫, প্রত্যেক প্রশ্নের মান ৩ — মোট মান ১৫

(গ) সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন (Short essay type Question)
প্রশ্নসংখ্যা ৬, প্রতি প্রশ্নের মান ৯ — মোট মান ৫৪

(ঘ) রচনাত্মক প্রশ্ন (Essay type Question)
প্রশ্নসংখ্যা ১ — মোট মান ১২

মোট মান—৯০

2nd Paper

(ক) প্রশ্নপত্রে বিষয়মুখী প্রশ্নসমূহ এমনভাবে দেওয়া হইবে যেন ক, খ, গ বিভাগ হইতে যথাক্রমে সাতটি, একটি ও একটি প্রশ্নের উত্তর করিতে হয়।

(খ) প্রশ্নপত্রে সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নসমূহ এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে ক, খ ও গ বিভাগ হইতে যথাক্রমে দুইটি, দুইটি ও একটি করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

(গ) প্রশ্নপত্রে সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নসমূহ এমনভাবে দিতে হইবে যেন ক, খ ও গ বিভাগ হইতে যথাক্রমে তিনটি, দুইটি ও একটি করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

(ঘ) প্রশ্নপত্রের রচনাত্মক প্রশ্নটি 'খ' বিভাগ হইতে দিতে হইবে।

নমুনা প্রশ্নাবলী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective type Questions) এক কথায় উত্তর দাও। প্রত্যেক প্রশ্নের মান ১

১। আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?
২। প্রাচীন ভারতের নগর-ভিত্তিক সভ্যতা কোনটি ?
৩। অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কে ?
৪। বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের নাম কি ?
৫। খানুয়ার প্রান্তরে বাবরের সহিত কাহার যুদ্ধ হইয়াছিল ?
৬। কত খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয় ?
৭। কত খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী-লাভ করে ?
৮। নীল দর্পণের লেখক কে ?
৯। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে কে ভারতের বড়লাট ছিলেন ?
১০। কাহাকে 'দেশবন্ধু' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ?
১১। কাহাকে 'সীমান্ত গান্ধী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ?

বিকল্প প্রশ্ন (ঐতিহাসিক স্থান নির্দেশক প্রশ্ন)

প্রাচীন ভারতের রেখা মানচিত্রের মধ্যে ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান নির্ণয় কর। নিম্নের ঐতিহাসিক স্থানগুলির নামের পার্শ্বের বন্ধনীর মধ্যে সেই ক্রমিক সংখ্যা লিখিবে।

(ক) গৌড় ( )
(খ) তক্ষশীলা ( )
(গ) পানিপথ ( )
(ঘ) তাম্রলিপ্ত ( )
(ঙ) পাটলিপুত্র ( )
(চ) মোহেনজোদড়ো ( )
(ছ) সোমনাথ ( )
(জ) উজ্জয়িনী ( )
(ঝ) কালিকট ( )
(ঞ) পুনা ( )
(ট) শ্রীরঙ্গপত্তম ( )
(ঠ) সাঁচী ( )
(ড) চিতোর ( )

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন (প্রত্যেক প্রশ্নের মান ৩) 'ক' বিভাগ

১। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিমালয়ের অবদান কি ?
২। পানিপথের প্রথম যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল কি ?
৩। ১৭৬৫ হইতে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসন ব্যবস্থাকে দ্বৈত শাসন বলা হয় কেন ?

'খ' বিভাগ

৪। ইংরেজরা 'ইলবার্ট বিলের' বিরোধিতা করিয়াছিল কেন ?
৫। জঙ্গী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইল কেন ?
৬। অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল ?

'গ' বিভাগ

৭। ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলা হয় কেন ?
৮। রাষ্ট্রপতি কোন্ কোন্ সময়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন
'ক' বিভাগ

১। ভারতে কি কি বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়? এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কোথায়?

২। প্রাচীন ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ কি কি? ভারতের ইতিহাসে হিমালয়ের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। সিন্ধু-সভ্যতা কোন্ সময়ের সভ্যতা? এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কি কি? এই সভ্যতার বিলোপের কি কি কারণ অনুমান করা হয়?

৪। বৈদিক সাহিত্য বলিতে কি বুঝায়? বেদের মধ্যে কয় শ্রেণীর রচনা আছে এবং কি কি? বেদান্ত কাহাকে বলে? চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম বলিতে কি বুঝ?

৫। আলেকজাণ্ডার কে ছিলেন? তিনি কখন ভারত আক্রমণ করেন? তিনি ভারতের অভ্যন্তরে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন? ভারতবর্ষ আক্রমণের সময় অম্ভি ও পুরুরাজ যে বিভিন্ন ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৬। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে বৈদেশিক প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর। রাজপুত কাহারা? গান্ধার-শিল্প কাহাকে বলে?

৭। অশোকের 'ধর্মবিজয়' নীতি গ্রহণ করিবার কারণ কি? 'তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট'—এই প্রসঙ্গে যুক্তিসহ তোমার মতামত লিখ।

৮। দুইটি ঐতিহাসিক উপাদানের নাম কর যাহার সাহায্যে সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব সম্বন্ধে জানিতে পারা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারত বিজয়ে তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা আলোচনা কর।

৯। গুপ্ত যুগে ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল?

১০। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের প্রবর্তিত মুদ্রা-সংস্কার-ব্যবস্থা আলোচনা কর। তাঁহাকে খামখেয়ালী সম্রাট বলা যুক্তিসম্মত কিনা বিচার কর।

১১। আকবর কিভাবে সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন? হলদিঘাটের যুদ্ধের ফলাফল কি? সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আকবর কোন্ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন?

১২। শিবাজীর বাল্য পরিচয় দাও। মোগলদের সহিত শিবাজীর বিরোধের কারণ কি ও তাহার ফলাফল কি?

১৩। সিরাজের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধের কারণ কি? সিরাজকে বাঙ্গলার 'শেষ স্বাধীন নবাব' বলা কতদূর সঙ্গত আলোচনা কর।

১৪। ভারতে ইংরেজ-শক্তি সম্প্রসারণে ১৭৫৭, ১৭৬৪ ও ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের গুরুত্ব আলোচনা কর।

১৫। অধীনতামূলক মিত্রতা বলিতে কি বুঝ? এই নীতি কিভাবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে সাহায্য করিয়াছিল?

১৬। ডিরোজিও কে ছিলেন? নব্যবঙ্গ (young Bengal) কাহাদের বলিত? সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রে ইহাদের অবদান কি?

১৭। সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাপ্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র ও সৈয়দ আমেদের অবদান বর্ণনা কর।

১৮। জাতীয় কংগ্রেস কখন স্থাপিত হয়? উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় কংগ্রেসের তিনজন নেতার নাম লিখ এবং উহাদের মধ্যে একজনের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

'খ' বিভাগ

১৯। 'বঙ্গভঙ্গ' কত খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? ইহার ফলে যে আন্দোলন হয় তাহার লক্ষ্য কি ছিল? জনগণের মধ্যে ইহা কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে?

২০। রাউলট আইন কি এবং কেন প্রবর্তন করা হয়? জনগণের উপর ইহা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল?

২১। খিলাফৎ বলিতে কি বুঝ? খিলাফৎ আন্দোলনের কারণ কি? 'অসহযোগ আন্দোলন' ও 'খিলাফৎ আন্দোলন' কেন যৌথভাবে পরিচালিত হইয়াছিল? এই আন্দোলনের পরিণতি কি?

২২। 'আগস্ট বিপ্লব' কাহাকে বলে? 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২৩। 'ভারত বিভাগ' কি ভাবে ঘটিল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

'গ' বিভাগ

২৪। 'গণ পরিষদ' কাহাকে বলে? গণ পরিষদের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন? ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুআরির গুরুত্ব আলোচনা কর।

২৫। সংবিধানের 'প্রস্তাবনা' বলিতে কি বুঝায়? ভারতীয় সংবিধানের 'প্রস্তাবনার' বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

২৬। মৌলিক অধিকার কাহাকে বলে? কয়েকটি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ কর। 'নির্দেশমূলক নীতির' সহিত ইহার পার্থক্য কি?

২৭। ভারতের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান কে? তাঁহার ৫টি প্রধান ক্ষমতার উল্লেখ কর। কোন্ কোন্ অবস্থায় তিনি বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন?

২৮। সুপ্রিম কোর্ট কাহাকে বলে? ইহার কাজ কি কি? ইহা কোথায় অবস্থিত?

রচনাত্মক প্রশ্ন

২৯। জাতীয় কংগ্রেসে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উৎপত্তির কারণ কি? এই প্রসঙ্গে তিলক বা বিপিনচন্দ্র পালের ভূমিকা আলোচনা কর।

৩০। ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনে বাংলা/মহারাষ্ট্র/পঞ্জাবের ভূমিকা আলোচনা কর। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ ঘোষ/দামোদর সাভারকর/বনবিহারী বসুর অবদান আলোচনা কর।

৩১। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান আলোচনা কর। তাঁহাকে নেতাজী বলা হয় কেন?

৩২। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর অবদান আলোচনা কর। তাঁহাকে 'জাতির জনক' বলা হয় কেন?